প্রচার।

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় বৎসর।

১২৯২-৯৩।

কলিকাতা।

২ নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট পিপেল্‌স প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরিবের ঘরের দুটী মেয়ে।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান্ জমীদার প্রজাদিগের হিতার্থে এবং আপনার কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লি আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ, দুই চারি ঘর কুমার, এক ঘর কামার ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম "তালপুখুর", এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুখুর গ্রাম বলে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুখুরে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটীর বয়স ৯ বৎসর, ছোটটীর বয়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যার সময় সে পুখুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তাল বৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে; নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়। পুখুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকট দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দিনের পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামসূচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তাঙ্কিত মুখ হইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর একবার আকাশের দিকে দেখিয়া, সেই শীতল বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, একবার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।"

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা। "না মা এত সন্ধ্যার সময় কি ডুব দেয়, অসুখ করিবে যে।"

বিন্দু। "না মা অসুখ করিবে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে। তুমি জলে নামিলে আবার সুধা ডুব দিতে চাহিবে, ওর আবার অসুখ করিবে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে।"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোনটীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগ্নী দুটীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্র বালিকা দুটীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চায়, একটু মিষ্ট কথা বলিয়া একটু সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েতের মেয়ে, হরিদাস মল্লিক নামক একটী সামান্য অবস্থার লোকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ২০। ২৫ বিঘা জমী

ছিল, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া জমিদারের খাজনা দিয়া বড় কিছু থাকিত না; যাহা থাকিত তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র অনেক কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন তারিণীচরণ মল্লিক নামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বর্দ্ধমানে চাকরি করিত, কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভাইয়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা আপনার ভাইয়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫। ১০ টাকা কর্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর পর তাঁহার একটী কন্যা হয়, এতদিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরিবের ঘরের মেয়ে, আদর ও পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাড়ীতে আসিতেন তখন মেয়েদের জন্য কেমন ঢাকাই কাঁপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোনার চুড়ী, কেমন কানের কানবালা আনিতেন, বিন্দুর বাপ মা অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দুগাছি অতি সরু সোনার বাঁলা ও দুই পায়ে দুইগাছি রূপার মল গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না, একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জেঠাইমার মেয়েদের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভাল মানুষ কখনও কাহাকে রাগ করিয়া কথা কহিত না, সুতরাং তাহারাও বিন্দুকে ভাল বাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুতুল কিনিলে একটী সোলার পুতুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়ীতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত; বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন আর নিজের চক্ষের এক বিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পর তাহার একটী ভগ্নী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু দুটী কাল২ ভ্রমরের ন্যা। সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটীতে সদাই

সুধার হাসি। গরিবের এই অমূল্য ধনকে গরিব বাপ মা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং দুইটি মেয়ে হওয়াতে বাপ মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু দুধ চাই; এমন সুন্দর মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই এক খানা গয়না হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়শীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপ মার মনে কত সাধ হয় কিন্তু উপায় কৈ? গরিব দুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যা দুটীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুখুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরের আহার করিয়া কন্যা দুইটীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসার কার্য্য করিতেন। তথাপি এ সংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা একজন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদাশিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পর হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লি কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন,—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন, এ আঁধারের একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ

শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেই পথ দিয়া যাইবার সময় একটী অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে জমী ছিল তাহা তারিণী বাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া যাহা দেন বিন্দুর মাতা তাহাই পান। তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না; মেয়ে দুটীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাক ঘরে আসিয়া চক্ষুর এক বিন্দু জল মুছিতেন। ভাবিতেন "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয় আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি,—তাহা হইলেই আমার সুখ।"

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন "আয় মা বিন্দু ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে, আহা বাছার ননির শরীর এই টুকু এসে ক্লান্ত হয়েছে। আহা বাছা যে ছেলে মানুষ, হাঁটতে পারবে কেন? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

বিন্দু। "হ্যা মা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়, বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘ ও হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয় জল হবে।"

বিন্দু। "না মা আমিই কোলে নি,—সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে

রাত্রিতে সুধাকে কোলে করে এনেছিলুম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নেযেতে পারবো না? ঐ রান্নাঘরের আলো দেখা যায়।”

মাতা। “তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার যেন প’ড়ে যাসনি। ঐ সেদিন তোর জেঠাইমার মেয়ে উমাতারা রাত্রি বেলা মেলা থেকে আসছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিয়েছে।”

বিন্দু। “মা উমাতারারা কোন্ মেলায় গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুথুল এনেছিল, একটা কাঠের ঘোড়া এনেছিল, একটা মাটীর সিংহ এনেছিল আর একটা কেমন কল এনেছিল সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?”

মাতা। “তা জানিস্ নি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল, সেখানে বছরং ভারি মেলা হয় কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।”

বিন্দু। “মা তুমি কখন সেখানে গিয়াছিলে?”

মাতা। “গিয়েছিলুম বাছা যখন আমি ছোট ছিলুম একবার আমার বাপ মা গিয়াছিলেন, আমরা বাড়ী সুদ্ধ গিয়াছিলুম, সেখানে তিন চারি দিন ছিলুম, একটা গাছ তলায় বাসা করে ছিলুম।

বিন্দু। “কেন ঘর ছিল না? গাছ তলায় বাসা করে ছিলে কেন মা?”

মাতা। “সেখানে কত হাজার হাজার লোকে যায় ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানি পসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রি হয়।”

বিন্দু। “মা আমি একবার যাব, আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়।”

মাতা। “আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা খরচ হয়।”

বিন্দু। “না মা আমি আর বৎসর যাব। উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না?”

মাতা। “ছি মা তুমি সেয়না মেয়ে অমন করে কি বায়না করে? তোর জেঠাইমারা বড় মানুষ, তাঁহার ছেলেরা যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়।

তোরা না গরিবের ঘরের মেয়ে তোদের কি বাছা বায়না করিলে সাজে? আহা ভগবান যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত, তাহা হইলে কি আর অন্ন বস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয়? তাহা হইলে কি আমার সোনার পুথুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে? হা ভগবান্! তোমারই ইচ্ছা!"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কালো মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে কেবল এক এক বার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে, অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌ উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়া গোরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র মধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহি বা কন্যা বা ভগ্নী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যা

তেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুখুর গ্রাম বৃক্ষচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম কাঁঠাল তাল নারিকেল ও অনান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মোনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পুরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০। ৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষীগণ কুলায় নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই অম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫। ৬ টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায় ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে. উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুখাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটী তকতাপোশ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুল গাছ, কয়েকটী কলাগাছ, ও একটী আঁবগাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটী ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটী দুই বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুন্ গুন্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত কিন্তু একটু শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি তাহার কিছু ইঁহার নাই, সে প্রফুল্লতা সে উদ্বেগ সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগ্নী বা কন্যা বা আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন চাহিয়া দেখ; দেখিয়া বল ছার উপন্যাসের কাল্পনিক অলীক সুখ কয়জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন এসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটিতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটীও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুটীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুই একটী রেখা অপনীত হইল।

রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন তখন তাঁহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না, হাস্য-বদনা সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা বসিয়া একটী বিড়াল শিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়াল শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সরিয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে; সে প্রফুল্ল অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটী যেন উল্লাসে হাসিতেছে, সে বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সে সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু-সঞ্চালিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানিও হাস্য বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তা-শূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে।

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকাও বিড়াল শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

সুধা। "দিদি আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমাইতেছিলে তাই জাগাই নাই। আর দেখ দিদি, এই বেরাল ছানাটা আমি যেখানে যাব সেইখানে যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করিয়া বাসন মাজিতে গেলুম ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুলি সব ঘরে বন্ধ করিয়া রেখে এসেছ ত?"

সুধা। "হাঁ সব মেজে রেখে এসেছি। আর তারপর বেরালকে গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলুম আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুথুলটা নিতে চায়, তা আমি দিচ্ছি এই যে।"

বিন্দু। "তা ব'ন এতক্ষণ এসেছ একবার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয় নি, একটু ঘুমও না।"

সুধা। "না দিদি আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলুম। কেবল একবার খোকা যখন কেঁদেছিল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে ছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হইলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষুধ আনবেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জরও আস্‌বে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন্ আস্‌বেন দিদি?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, কেন?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা করব, তা দিদি তোমাকে, বলব না, তিনি এলে দেখতে পাবে। যেমন আমার গায়ে সেদিন ফাগ দিয়েছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিবে বল না"।

সুধা। "না দিদি তুমি ব'লে দেবে।"

বিন্দু। "না বলিব না।"

সুধা। "সত্য বলিবে না?"

বিন্দু। "সত্য বলিব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ।

বিন্দু। "ও কি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখতে পাচ্চো না"

বিন্দু। "দেখছি ত, এ কি পাট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি

বিন্দু। "কেন উঁহাতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাতে পারিলে না। যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমবেন, আমি এইটা তাঁহার দাড়িতে বেঁধে দেব, তাহার পর উঠিলে তাঁহাকে জটাধারী সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা করিব। খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগ্নীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হইয়াছে জেনেও জানে না! নিদারুণ বিধি! কেমন করে এই কচি ছেলের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখিলে,—কেমন করে এ প্রফুল্ল, সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার ৯ বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। আমাদের গল্প এই সময় হইতে আরম্ভ। এই নয় বৎসরের ঘটনা গুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটী অনাথা কন্যাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মরিবার পূর্ব্বে দুইটী মেয়েকে বিবাহ দিয়া যান। যে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুখুরে গিয়াছিলেন তখন বিন্দুর বয়সও ৯ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতায় বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লিগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কায কর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালনপালন করিতেছেন, তাহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ যায় না। আত্মীয়েরাও এবিষয়ে

বড় মনোযোগ করিলেন না, কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দুটী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মেয়ের জেঠাইমা রকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকাল বেলা কেশবিন্যাস করিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন (বিন্দুর মা চুলের দড়ী ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বের জন্য ভাবতে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এইরস না তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ করিয়া দিব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করিতেছে, যে দিলেই এখনি মাথায় করিয়া লইয়া যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ করিব যে কুটুমের মত কুটুম হইবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বন তেমন টাকা কড়ি নাই, আমার দেওয়র তেমন সেয়ানা ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই যা বল। তা ভেবনা বোন, আমি যখন এবিষয়ে হাত দিয়াছি তখন আর কোন ভাবনা নাই।" আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু জেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা! ছেলেদের জন্য কত পোশাক, কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মশাই বাড়ী আসিয়াছেন গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসামোদ, কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকুরি চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না কেবল বড়

লোকের খোসামোদটা অভ্যাস মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধুমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে কেই বা শোনে। ১৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মশাই আবার বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধের কিছুই স্থির হইল না।

পড়্শীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধা দিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন "তা দিব বৈকি, তোমার দেব না ত কার দেব। তবে কি জান বাছা আজ কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতে থুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায় নাই তেমন গোছান লোক হতো, ঐ তোমার ভাসুরের মত টাকা করিতে পারিত তবে আর কি ভাবনা থাকিত? সেই সময় আমি কত বলেছিলুম, তাঁ তিনি গা করতো না, তোমরাও গা করিতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হইলেই ভাল লাগে। তা দেব বৈকি বাছা তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিব এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন "তার ভাবনা কি? বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে শুনতে একটু ভাল হত তবে এ কাযটা শীঘ্র শীঘ্র হইত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে, ছিরি আছে, তবে রংটা বড় কালো আর চোক্ দুটা বড় ডেবডেবে, আর মাথায় বড় চুল নাই। না তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড় গুল যেন জির জির করচে, হাত পা গুল কেমন লম্বা লম্বা আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে। তা হোক, তুমি ভেবো না, কাল মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি আটকে থাকে তা থাকবে না, যখন আমরা আছি তখন কিছু আটকাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধা দিগের যথেষ্ট আশ্বাস বাক্য ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েক দিন

তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাটি করিলেন, কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিশ্রী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন। গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাস বাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন,এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটী মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন "তা এ কথা আমাদের এতদিন বল নি? এ সব কার্য কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বলিলেন, অমনি কাযটা হইয়া গেল। কেমন মেয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নাই,টাকার অভাব নাই,যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করিয়া দিলাম। ছেলেটী দোজবরে বটে আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশি হয় নাই, আর কালীতারা ৮ বৎসরের হইলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাত করিতেছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখাপড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা গাড়ী ঘোড়া লোক জন বাবুয়ানা দেখিলে লোকে বলে, হাঁ জমিদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এতদিন কোথা হাঁটাহাঁটী করছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে তবু ভাল।" সজল নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন, এবং এমন লোকের নিকট পূর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বলিলে তখন আর ভাবনা নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতেছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া খাওয়া

ঘুম ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্গুণবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ ঝি কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্বার্থ যত্ন করেন; কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্বে দোষের জন্য বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন, এবং নিঃস্বার্থ রূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্য ব্যয়ে ক্রুটী করেন না। তবে কাযের সময় সহায়তা করা,—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্ত প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচ্ঞায় কেহ একটী কপর্দ্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন তবে দেখিতেন এ সদ্‌গুণগুলি জগতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে এ প্রচুর আশ্বাস বাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুখুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তালপুখুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বসু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার

বিষয় বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুষ্ক ম্লান মুখখানি ও দুই একবার গোপনে দেখিলেন, এবং তৎপর বিন্দুর মাতাকে ও জেঠাই মাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জেঠাই মা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড় মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু খড় কুটুম করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই,—আমাদিগের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই ?

বিন্দুর সরলস্বভাব জেঠাই মা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই,—কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না,—কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন, এবং পাড়া পড়সী মেয়েরা যখন বিবাহ বাটীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ বিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আহা, আমার উমাতারাও যে বিন্দুও সে, আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায় নাই, আমি না করিলে কে করে বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়সীগণও "তুমি বলিয়া করিলে, নৈলে কি অন্যে এতটা করে" এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও

বে দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০। ১২ বৎসরের সময় নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাছা সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি তবে আমার জীবনের সাধ মিটিবে না।" হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণী বাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদিগের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরে সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটিতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্লা বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুথুল খেলা করিতে লাগিল।

সীতারাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে কারারুদ্ধ বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া বিদায় দিয়া সীতারাম দেখিতে আসিয়াছিলেন, যে আর কেহ কারাগার মধ্যে আছে কি না। আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে শ্রী সেখানে পড়িয়া আছে। সীতারাম বলিলেন, "শ্রী— তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। শিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের তেমন বোধ সোধ নাই।

অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে? আমার উপর এখন রাজার দৌরাত্ম্য—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এই খানে থাকিবে? এ যে কারাগার, এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে, বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামাপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেই খানে যাইবে। সে খানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেই খানে যাও। যেখানে যেখানে তোমার অভিলাষ সেই খানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব.

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে, যে দুরন্ত সিপাহীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া, স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখ-পানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল,

"এত দিন পরে, এ কথা কেন?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে।

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করি-

য়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? যাইব বই কি? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া, আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য, যে এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার স্নেহের অধিকারিণী, আমি তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী—আমি তোমার দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। নন্দা তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, রমা তোমার তৃতীয়া স্ত্রী, আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, দুশ্চরিত্রা ও নই, জাতিভ্রষ্টা ও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখন বল নাই যে কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথা গুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না?

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে, না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাইদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে সিপাইরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন,

"এখন, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না। কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকার হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ

---

* চন্দ্রাগারে থাগ্নিভাগে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্ঞস্য শিল্পে প্রবীনা।
বাচাংপত্যুঃ সদ্গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥
ইতি জাতকাভরণে।

তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যজ্যা হইয়াছ।” এই বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন,

“দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, ‘আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে স্থানে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয়, বা প্রীতি না জন্মে সেই ব্যবস্থা করুন।’ পিতৃঠাকুর, এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন, যে আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। পাছে তাঁহার পরলোকের পর, আমি তোমার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া এ আজ্ঞা পালন না করি, এই আশঙ্কায় তিনি আমাকে কঠিন শপথে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।”

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন,

“আমার কথা বাকি আছে। যতদিন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।”

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও? তুমি তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছ—সে শপথ কি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে কি তাহা পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেননা যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম

করিতেছি—ইহা বুঝিয়াছি। শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে—বিপদে পড়িলে নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ ইহা তোমার অশেষ গুণ। কিন্তু আর কখন ইহাতে আমার প্রয়োজন হইবে না। আর কখন আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না, বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না! গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী, সেই স্বর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ তা বৈকি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই। একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যে তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া একজন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে, আমি তাই দিব।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য, বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়. সীতারাম সেই দিকে দৌড়াইয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন. আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথায় নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই যাকে ডাকি, তাত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয় বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুজিতে জানি না। তা কি করিব,—আরও খুঁজি। যাহাকে ইহ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহ জীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাত কালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপ মাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন তাহার উপযুক্ত মহিষী কই? নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা? না যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণ জয় করিয়াছিল, সেই সে সিংহাসনের যোগ্য? যদি শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারে?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই, গঙ্গারামকে

শ্যামাপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামাপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামাপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামাপুরে পৌছিয়া দেখিলেন, যে গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি! আপনি ত তাহাকে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন।"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তবে তুমি এই ক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এই খানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হয় আমি দিতেছি।"

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্ন পূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল—কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনাআপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মাগণ খুব বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হাঁ অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান * যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের

---

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী "গোঁয়ার", অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। ধার্ম্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধর্ম্ম দুইপাদ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম তিনপাদ, অর্জ্জুনেরই ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রা। মহাভারতকার স্বয়ং, অথবা যিনি মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এরূপ মনে করেন না—তিনি বয়োনুসারে ধর্ম্মের অনুপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। স্থূল কথা যুধিষ্ঠির যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সাবধানতা তাহার একটি কারণ। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই অবধানপরতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন,

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ, যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন; † আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি! তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ—আমরা জানি তিনি লম্পট, ননিমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ, তাঁহাকে যে জাতি এই পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ

---

† যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই সকল কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। তবে সমকালিক ইতিহাসে এই রূপ ছায়া পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট।

দিয়া, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নহ, কেননা সম্রাট ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকারী হয় না, তুমি সম্রাট নহ। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাঁহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না, ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।"

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখন নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না * কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উঁহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরা-

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন, "আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিয়া যাইতেন না।

সঙ্কেশ্ন ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্যলাভ করিবেন।”

অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়, জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্ম্মিক; কেননা তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক। 79095

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন জরাসন্ধ জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি, কেন

না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিনজন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—যে তিন জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস, ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসজ্জার এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া,প্রাকার চৈত্যচূর্ণ করিয়া জরাসন্ধ সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটী কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি; হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, যে হাঁ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাঁরা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রু নিপাত করিবেন বলিয়াই এ নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে ইহাঁরা

ধর্ম্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য; তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথ কালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না. এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই, প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, একজনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা হরণের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিবেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার

করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল? ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি যে মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায়, প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটা পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশ বিশেষ বা কতকগুলি শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে তাহার বিচিত্র কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে, যে সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে

লেখা আছে যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া মিটমাট্ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথা গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা গুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর, নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনা প্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধ পর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখন ও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক এখন জগতের প্রধান মনুষ্য। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু তাঁহারাই ইউরোপে

মান্য—Francisd; Assisi বা Imitation of Christ' গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের ভারতের দ্বিতীয় কবির ও মনে, সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথ বধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুদ কৌশলের তিনিই রচয়িতা। তাহা আমি ঐ সকল পর্ব্বের সমালোচনা কালে বিশেষ প্রকারে দেখাইব। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশল বিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে, হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

পুষ্প নাটক।

যূথিকা ও বৃষ্টিবিন্দুর প্রবেশ।

যূথিকা। এসো, এসো প্রাণনাথ এসো; আমার হৃদয়ের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কতকাল ধরিয়া তোমার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তাকি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবন শুষ্ককর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল! তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কতকাল হইল! এখন দেখ সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া ক্রমে পশ্চিমে

হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক্! দূর হোক—তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটীতে পড়িও না! আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাই-তেছে! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ! তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর! —আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুঁই টা। এতকাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকা-নের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল—তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে, একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে; একেবারে আটখানা! আঃ তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুট্‌তে জানিনে? তা, সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুট্‌তে হয়, দুপরেও ফুট্‌তে হয়, গরমেও ফুট্‌তে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুট্‌তে হয়, না ফুট্‌লে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

টগর। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জানন৷ কি যে তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে! আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চস্তরে

অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক বায়ুর নিম্নস্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন,—আঃ মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে শ্যামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে ঘোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্, এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাগ্যর দিই। কেহ বলে তত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো খানিক ডাক হাঁক করি। কে ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিনী— কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশ প্রান্তে কখন আকাশ মধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখন চিকি চাকি—

যুঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র!

বৃষ্টিবিন্দু। আছিঃ! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দে ছেলে ছোকরা হাল্কা যারা, তাঁরা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ বেটা কি ভারি রে! আয় না তোদের মত দুলাখ্ দশ লাখ্ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমা

এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ব্বও থাকিত না। পাপিয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিনী!

যূঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিগে যায়, সেই দিগে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যূঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যূঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের কথায় কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবলশোভা, এমন সৌরভ, দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্! ঐ দেখ বাতাস আসচে!

যূঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে যে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যূঁই। থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যূঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব! তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি। নাম্!

বৃষ্টিবৃন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস্—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে! আমি তবে যাই?

যুঁই। থাক্ না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাকনা—থাকনা—থাকনা।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যুঁই। তুমি সব।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

[যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে প্যরি না।

যুঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যুঁই।—(বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন।

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস—

যুঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যুঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্য-প্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে,

কোথায় শুদিলে, প্রাণাধিক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলাম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পরিমল দে—

যুঁই। ছাড়! নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যান্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুঁম্!

যুঁই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্!

[ইতি যূথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হুঃ! হায়! হায়!

যবনিকা পতন।

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল!

দ্বিতীয় ঐ। তাইত! একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19th July, 1885 Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সংসার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্ম্মল শীতল কিরণে সুন্দর তালপুখুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালবৃক্ষসার আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিস্ময়কর ছবির ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও সুন্দর বাঁশ ঝাড়ের সুচিক্কণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্রকিরণ রহিয়াছে, পুষ্করণীর ঈষৎ কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক সুন্দর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরে ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সুন্দর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন যূঁই ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিদ্রাহীন বৃদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গনে বসিয়া এখনও ধূম পান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়স্কা গৃহস্থবধূ এখনও বাটীর পার্শ্বের পুখুরে বাসন মাজিতেছেন, সংসারের কায এখনও শেষ হয় নাই। নৈশ-বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর দূর হইতে কোন প্রফুল্লমনা কৃষকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসার কার্য্য শেষ করিয়া এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শান্তনয়নের উপর পড়িয়াছে। সুধা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিদ্রাতেও সে সুন্দর ফুটন্ত বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ দুটী হাস্যবিস্ফারিত, বোধ হয় বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রজনীতে কোন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পর বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতে-ছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া খুলিয়া দিলেন, হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স চতুর্ব্বিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্যাম বর্ণ কিন্তু সুন্দর, নয়ন দুটী অতিশয় তেজব্যঞ্জক। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দুটী ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। বিন্দু সযত্নে তাঁহাকে একখানি চৌকি আনিয়া দিলেন, এবং পা ধুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাত মুখ ধুইলেন।

বিন্দু। "তোমার আসিতে এত রাত্রি হইল? এখনও খাওয়া দাওয়া হয নাই?"

হেম। "আমি সন্ধ্যার সময়ই আসিতাম, তবে কাটওয়ার একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল; তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন, উপরোধ করিয়া কিছু জলখাবার খাওয়াইলেন, সেই জন্য এত দেরি হইল। তা তোমরা খাইয়াছ ত?"

বিন্দু। "সুধা খাইয়া ঘুমাইয়াছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খাইয়াছ আর কিছু খাও নাই, তবে ভাত এনে দি।"

হেম। "আমার বিশেষ ক্ষুধা পায় নাই, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নাই।"

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য, ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর গাছে নেবু হইয়াছিল বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটী ডাব পাড়িয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং বাড়ীতে গাভী ছিল তাহার দুগ্ধ ঘন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। "খোকার জন্য একটা অষুধ আনিয়াছি, সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, যদি কাঁদে, তবে খাওয়াইও। আর যে চেষ্টায় গিয়াছিলাম তাহার বড় কিছু হইল না।"

বিন্দু। "কি হইল?"

হেম। "কাটওয়াতে আমার পরিচিত একটী উকিল আছেন আমি তাঁহার কাছে তোমার বাপের জমীর কথা বলিলাম, এবং সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম।"

বিন্দু। "তার পর?"

হেম। "তিনি বলিলেন মকদ্দমা ভিন্ন উপায় নাই।"

বিন্দু। "ছি! জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে কি মকদ্দমা করে? তিনি যাহা হউক ছেলে বেলা আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, আমার বে দিয়েছেন, জেঠাই মা এখনও আমাদের জিনিষ টিনিষ পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মকদ্দমা করা ভাল?"

হেম। "আমাদের বিবাহের জন্য আমরা তোমার জেঠা মহাশয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি তখন ছেলে মানুষ ছিলে সে সব কথা বড় জান না, জানিবার আবশ্যকও নাই। তথাপি তিনি তোমার জেঠা, এই জন্যই তাঁহার সহিত বিবাদ করা ইচ্ছা নাই, কেবল অগত্যা করিতে হয়।"

বিন্দু। "ছি! সে কাযটা কি ভাল হয়? আর দেখ আমরা গরিব লোক আমাদের কি মকদ্দমা পোষায়? আমরা গরিবের মত যদি থাকিতে পারি, দুবেলা দুপেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলে দুটীকে মানুষ করিতে পারি, তাহা হইলেই ঢের হইল। তোমার যে জমি জমা আছে তাহাতেই আমাদের গরিবের সোণা ফলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।"

হেম। "আমি যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, এরূপ কষ্টে চিরকাল জীবন যাপন করিবে তাহা মনে করি নাই। তুমি সহিষ্ণু, সাধ্বী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ্য করিয়া তুমি মুখ ফুটে একটী কথা কও না সে তোমারই গুণ, কিন্তু আমি তাহা চক্ষে দেখিতে পারি না।"

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ সেটা কি ভুলে গেলে?" প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন এমন ঘর বাড়ী, এখানে রাজার উপাদেয় দ্রব্য

পাওয়া যায়, ইহাতে আমাদের অভাব কিসের? একটী রাজার উপাদেয় জিনিস দেখিবে ?”

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন “কৈ দেখি।”

হেম উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আঁব পাড়িয়া তাহার অম্বল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর বাটীটী রাখিয়া বলিলেন “একবার খেয়ে দেখ দেখি।”

হেম হাসিযা অম্বল ভাতে মাখিলেন। খাইয়া সহাস্যে বলিলেন, “হাঁ। এ রাজার উপাদেয় দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নহে, রাজরাণীর হাতের গুণ।”

ক্ষণেক পর হেম আবার বলিলেন, “আমি সত্য বলিতেছি জেঠা মহাশয়ের সহিত মকদ্দমা করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কাড়িয়া লইবেন, আমাদিগকে দরিদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিবেন তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দরিদ্র কিন্তু আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।”

বিন্দু। “তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটি এই ঘন দুধ দিয়া খেয়ে নাও দেখি, তা হইলে গায়ে জোর হবে, তাহার পর কোমর বেঁধে লড়াই করিও।”

হেমচন্দ্র যুদ্ধের সেই উদ্যোগ করিলেন, আবার গাভীদুগ্ধের অথবা রাজ্ঞীর রন্ধন নৈপুন্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন,

“আচ্ছা, জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা মিটাইয়া ফেলিলে ভাল হয় না? গ্রামেও পাঁচ জন ভদ্রলোক আছেন।”

হেম। “সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। তোমার জেঠা মহাশয় বলেন যে জমিতে তাঁহারই সত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমীদারকে খাজনা দিতেছেন, তিনি অর্থব্যয় করিয়া জমির উন্নতি করিয়াছেন, এবং জমীদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখাইয়াছেন, এখন তিনি এ জমি হাতছাড়া করিবেন না। তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তাহা জমির প্রকৃত মূল্য নহে, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এই জন্য তিনি এরূপ অনায় করিতেছেন।”

বিন্দু। "আমি মেয়ে মানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ আমি ততদূর পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি যাহা দিতে চাহেন তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করিয়াছিলেন. যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁহাকে একটা জিনিস দিলাম তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মকদ্দমা করিলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্জ্জ করিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? যদি মকদ্দমায় জমি পাই তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিতে সে জমি বিক্রয় হইয়া যাইবে, আর জেঠা মশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাকিবেন। আর যদি মকদ্দমায় হারি, তবে এ কূল ও কূল দুকূল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয় আমরা কিছু অল্পই পাইলাম, গোলমালটা এই খানেই শেষ হয়। আমি মেয়ে মানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মকদ্দমা বড় ভয় করি; সেই জন্যই এরূপ বলিলাম; কিন্তু তুমি রাগ না করিয়া বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয় সেইটে কর।"

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটি জল খাইলেন, অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"তোমার ন্যায় মেয়ে মানুষ যাহার বন্ধু সে এ জগতে ভাগ্যবান্। আমি তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে উকিলের নিকট গিয়াছিলাম সে আমার মূর্খতা। তোমার পরামর্শটি উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করিলাম, জেঠা মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, কল্যই আমি এ বিষয় নিষ্পত্তি করিব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হইবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সহিত আগে পরামর্শ করিব।"

বিন্দু সহাস্যে বলিলেন, "তবে বৃহস্পতির আর একটী পরামর্শ গ্রহণ কর।"

হেম। "কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার করিব না।"

বিন্দু। "ঐ বাটীতে যে দুদটুকু পড়িয়া আছে সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।"

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটীও গ্রহণ করিলেন পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, হাতে একটী পান দিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন "যাও, অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।" জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাষবাসের কথা।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। উষা তরুণী গৃহিণীর ন্যায় সংসার কার্য্যের জন্য জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কন্যাকে সুন্দর রূপে সাজাইয়া দেয়, সেই রূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া উষা আকাশে দর্শন দিলেন। হাস্যমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন! তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ রূপ সপ্ত অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া সেই জলন্তকেশী সবিতা আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপ দান করিলেন। উষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিস্মিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন;—সেরূপ সরল, সুন্দর এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিত্ব তাহার পর আর রচিত হয় নাই!

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন। গ্রামের বৃক্ষ পত্র ও কুটীর গুলি সূর্য্যের লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল, গ্রাম্য পুষ্প গুলি বৃক্ষে ঝোপে বা জঙ্গলে ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের পাখী গুলি নানাদিক হইতে রব করিতেছে।

গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঘর দ্বার ও প্রাঙ্গন ঝাঁট দিয়া পুখুর হইতে কলস করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি আরম্ভ করিতেছে। বালকগণ পাঠশালায় বা খেলায় যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও গরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। হেমচন্দ্রও আজি নিজের জমিখানি দেখিতে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছায়াপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিলেন; কৃষকের নাম সনাতন কৈবর্ত্ত।

সনাতন কৈবর্ত্তের একখানি উচ্চ ভিটিওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি ঢেঁকির ঘর ও একখানি গোয়াল ঘর, তথায় ৩।৪।৫টি গরু ছিল। উঠানেই উনুন, পার্শ্বে একখানি চালা আছে, বৃষ্টি বাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলা কাঁটা গাছ ও জঙ্গল, এক স্থানে একটা বড় খানা আছে তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকার লাগে। গোয়াল ঘরের পার্শে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে, এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুখুর আছে। আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে এক্ষণকার নূতন মিউনিসিপাল আইন ও নিম্ন শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতেই যে কেবল বাসন ধুইতেন এমন নহে, তাঁহার স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত, এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুখুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে গাত্রোত্থান রূপ মহৎ কার্য্যের উদ্যোগ পর্ব্বে রত ছিল, দুই একবার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া হাই তুলিতেছিল, আর কখন কখন পার্শ্বে শয়ানা সহধর্ম্মিণীর সহিত, "পোড়ামুখী এখনও উঠলিনি, এখনও মাগীর ঘুম ভাঙ্গল না বুঝি" ইত্যাদি মিষ্টালাপ করিতেছিল এবং আলস্য বড় দোষ এই নীতি বাক্যটী প্রকটিত করিতেছিল। এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার ন্যায়, অতএব বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার ডাক,—তৃতীয় বার ডাক, সুতরাং সনাতন কি করে, একটা

উপায় করিতে হইল। বিপদ আপদে সনাতনের একমাত্র উপায় তাহার গরীয়সী সহধর্ম্মিণী, অতএব তাহাকেই একটু অনুনয় করিয়া বলিল, "এই দরজাটা খুলে উঁকি মেরে দেখ্‌ত কে এসেছে। যদি হারাণ সিকদার মহাজন হয় তবে বলিস বাড়ী নেই।" সনাতনের প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর "পোড়ারমুখী" প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর কথাটী শুনিয়া আস্তে ২ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। একটী হাই তুলিয়া সনাতনের দিকে পেছুন করিয়া অসংকুচিত চিত্তে আর একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল বড় বিপদ, অথচ আপনি সহসা বাহির হইতে পারে না, কি করে? দুই এক বার প্রণয়িনীকে ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল, সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি চৈতন্য হইল না! সকল যত্ন ব্যর্থ গেল, সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীরপুরুষ একেবারে রোষে দণ্ডায়মান হইয়া রিক্ত হস্তে যুঝিবার উদ্যম করিল। বলিল "এত বেলা হলো এখনও মাগীর উঠা হইল না, এত ডাকাডাকি করিলাম তবুও হারাম-জাদীর সাড়া নাই, এবার সাড়া করাচ্ছি, দুটো গুঁতো দিলেই ঠিক হবে।"

সনাতনপত্নী দেখিলেন আর মৌন অস্ত্র খাটে না, এখন অন্য অস্ত্র না ধারণ করিলে বড় বিপদ। অতএব তিনিও একবার বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "কি হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছ কেন, মাতাল হয়েছ না কি?—দেখ না, মিনসের মরণ আর কি!" বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায়ু বাঞ্ছা করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল, তথাপি সহসা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিল না।

সনাতন। "বলি আবার শুলি যে!"

স্ত্রী। "শোব না?"

সনাতন। "ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে হবে না?"

স্ত্রী। "হবে না?"

সনাতন। "জল আনবিনি?"

স্ত্রী। "আনবো না।"

সনাতন। "রান্না চড়াবি নি?"

স্ত্রী। "চড়াব না।"

সনাতন। তবে আবার শুলি যে?"

স্ত্রী। "শোব না?"

সনাতন। "তবে ঘরকন্না করবে কে?"

স্ত্রী। "তা আমি কি জানি? আমি পোড়ারমুখী, আমি হারামজাদী, আমার বাপ হারামজাদা, আমার ঠাকুরদাদা হারামজাদা, আমি আর ঘরকন্না করে কি হবে? আর একটী ভাল দেখে ডেকে আনগে।"

সনাতন। "না, বলি রাগ কল্লি না কি?"

স্ত্রী। "রাগ আবার কিসের?" বলিয়া গৃহিণী আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন, আর একটি হাই তুলিয়া দীর্ঘ নিদ্রার সূচনা করিতে লাগিলেন।

সনাতন তখন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখীর হাতে পায়ে ধরিয়া ঘাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোপের কিঞ্চিৎ উপশম হইল এবং তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন,

"এখন কি করিতে হবে বল! এমন লোকেরও ঘর করিতে মানুষে আসে। গালাগালি না দিলে রাত্রি প্রভাত হয় না।"

সনাতন। "না গালি দিলাম কৈ, একটীবার আদর করে পোড়ারমুখী বলেছি বইত নয়, তা আর ব'লবো না।"

স্ত্রী। "না কিছু বল নাই, আমার আদর সোহাগে কায নাই, কি করিতে হবে বল।"

সনাতন। "বলি ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করচে, একবার গিয়ে দেখ্ না; যদি হারাণ সিকদার হয় তবে বলিস আমি বাড়ী নেই।"

তখন বিধুমুখী গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার বিশাল শরীর খানি তুলিলেন। মুখখানি একখানি মধ্যমাকৃতির কাল পাথরের থালার ন্যায়, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ। শরীরখানি বেশ নাদশ নোদশ, স্থূলাকার, গোলাকার পৃথিবীর ন্যায়। পা দুখানি মাটিতে পড়িলে পৃথিবী তাহার সুন্দর

চিহ্ন অনেক ক্ষণ ধারণ করিতে ভাল বাসিতেন। বাহু দুই খানি দেখিয়া সনাতনের মনে মনে ভয় সঞ্চার হ'ত, কোন্ দিন এই রমণীরত্নের প্রিয় আলিঙ্গনে বা আমার শ্বাসরোধ হইয়া অপঘাৎ মৃত্যু হয়। দীর্ঘে বর বড় না কনে বড় দর্শকের কিছু সন্দেহ হইত, পার্শ্বে কনেটী তিনটী সনাতন।

গরীয়সী বামা দরজা একটু খুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "কে গা"।

হেম "আমি এসেছি গো। সোনাতন বাড়ী আছে"।

মনিবকে দেখিয়া সোনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া একটী কাঠের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিলেন ও সনাতনকেও ডাকিয়া দিলেন।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল, দণ্ডবৎ হইয়া বলিল,

"আজ্ঞে আমরা ঘুমিয়ে ছিলুম, তা আপনাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়েছে।"

হেম। "তা হোক, এখন চল মাঠে যেতে হবে, ক্ষেতখানা দেখিতে হবে। কৈ তোমার লোক কৈ"।

সোনাতন। "আজ্ঞে জন ঠিক করেছি, এই চল্লুম বলে। আপনি অনেকটা পথ চলিয়া এসেছেন একটু দুদ খাবেন কি"।

হেম। "না আবশ্যক নাই"।

সনাতন "না একটু খান, আমাদের বাড়ীর গরুর দুদ একটু খান। এই ।লিয়া সনাতন দুদ দুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর বাটী আনিল।

দোয়া হইলে সনাতনের স্ত্রী একটু ঘোমটা দিয়া একটী ছেলে কোলে ধরিয়া এক বাটী গরম দুধ বাবুর কাছে আনিয়া ধরিল। হেম সানন্দচিত্তে সই কৃষকের ভক্তিদত্ত দুগ্ধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককে ডাকাডাকি করিয়া হাজির করিয়া দুই খানি হাল চারিটী বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। সকলে ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে ন্যান্য কথা হইতে ২ সনাতন বলিল "তা বাবু এত কষ্ট করিয়া যাবেন নে, আমি আপনার জমি দুটা চাষ দিয়াছি আর একটা চাষ দিলেই

হয়, আজ সব হইয়া যাবে, তারপর কাল ধান বুনে দিব। আপনি আর কষ্ট করেন কেন?”

হেম “না আমি অনেক দিন অবধি আমার জমিটা দেখি নাই তোরা কি কচ্ছিস না কচ্ছিস একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে করিলাম একবার আসি।”

সনাতন। “তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখ্‌বেন না? জমিটা ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয় তাই বোধ হয় আপনাদের তত লাভ হয় না।”

হেম। “সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন মজুরদের দিয়ে বেশি থাকে না। গেল বার বুঝি ২০০।২৫০ মন ধান হইয়াছিল কিন্তু তোদের দিয়ে, বিচ খরচ দিয়ে জমীদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার ব্রড্ বেশি ঘরে উঠে নাই।”

সনাতন। “তা বাবু যে একবার বলেছিলেন, জমিটা ভাগে দিবেন, তা কি এখন ইচ্ছা আছে? যদি দেন তবে আমাকেই দিবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমি করিতেছি। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখ্‌তে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষবাস করিব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অৰ্দ্ধেক ধান মাপিয়া গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিব।”

হেম। “কেন বল দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছা কেন”?

সনাতন। “আজ্ঞে আপনি ত জানেন আমার এক খানি নিজের ছোট জমি আপনার জমির পাশে আছে, কিন্তু ৮।১০ কুড়ো—তাহাতে পেট ভরে না, আপনাদের কাছে মজুরি করিয়া যা পাই তাহাতে আমার চলে। তবে যদি আপনার জমিটা ভাগে পাই তবু লোকের কাছে বলিতে পারিব এতটা জমি ভাগে করি। আর আপনাদের যত খরচ হয়; আমরা ছোট লোক আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দুই পয়সা পাব, ছেলেগুলি খেয়ে বাঁচবে”।

হেম।” তা আচ্ছা দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমিটা বুনে দে, তার পর যাহা হয় করিব এখন”।

এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র ও সনাতন ও সনাতনের লোক জন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটী বৃষ্টির পর সকল জমিই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানা রূপ প্রণয়সূচক কথায় উত্তেজিত করিতে ২ চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গ দেশের উর্ব্বরা ভূমির অন্ত নাই, তাহাই বঙ্গালীদিগের প্রাণ সর্ব্বস্ব। জমির পার্শ্বস্থ আইলের উপর দিয়া অনেক জমি পার হইয়া অনেক কৃষককে কৃষি কার্য্যে দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমির দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্যও তাঁহার জমি দেখা হইল না, পথে তিনি সহসা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় তারিণী বাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণী বাবু পূর্ব্বদিন কার্য্য বশতঃ অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যূষে বাটী ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথায় যাইতেছ এস ঘরে এস। তবে ভাল আছ? আমি প্রত্যহই মনে করি তোমাকে একবার ডেকে খাওয়াই, তবে কি জান বর্দ্ধমান থেকে ছুটী নিয়ে এসে অবধি নানা বিষয় কার্য্যে বিব্রত, আর শরীর ও ভাল নাই, আর ছেলেগুলকে টিক টিক করে বলি তোমাকে এক বার নিমন্ত্রণ করে আসবে তা যদি তারা ঘরথেকে একবার বেরয়। তা তুমি একদিন এস না, খাওয়া দাওয়া করিও"

হেমচন্দ্র শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে তা যাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলুম আজ কালের মধ্যে একদিন দেখা করি, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসিব।"

তারিণী। "তা তুমি ঘরের ছেলে আবার অবকাশ অনবকাশ কি, যখন আসিবে তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা শ্বশুর বাড়ী হইতে এসেছে সেও কতবার বলেছে, বাবা একবার হেম বাবুকে নেমতন্ন কর না, আর গিন্নী ও তোমার কথা কত বলেন। তা আসবে বৈ কি, এস না আজ সন্ধ্যার সময় এসো, কিছু জলযোগ করিও"।

এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতে ২ উভয়ে একত্রে গ্রামে আসিলেন

কৃষ্ণচরিত্র।

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতক বেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্ত বর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈত্যক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।"

---

* লিখিত আছে যে মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপট দ্যূতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, ইহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ মানায়।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে, (মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে।"

কথা গুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এই রূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্য গুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না; ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রু ভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে এবং সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।"

কোন গোল নাই—সব কথা গুলি স্পষ্ট। এই খানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ভিন্নপ্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র

এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ, যে দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন "আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ"

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা তাহাই বলিলেন ; তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী শত্রুমিত্র সমান। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ এবং, কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যে তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেননা আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। ক্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন,—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও,

কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপ নিবারণ ব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাহাদের জীবন-চরিতের মূল সূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভার হরণ বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার, দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা, দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্য সকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খৃষ্ট, শাক্যসিংহ, ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খৃষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য প্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে, জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধ সাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এক

কালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যীশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্র ভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের যাহা সাধ্য তাহা আমি করিতে পারি, কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তিরদ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস বধের কাণ্ডটা কি, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, কেননা মহাভারতে কংস বধ দুই ছত্রে সমাপ্ত। তবে ইহা বুঝা যায়, যে যে বধোদ্যত শত্রুর ভয়ে জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পলাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যুদ্ধত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে গেলে, সেইখানেই কৃষ্ণলীলা সমাপ্ত হইত। পাইলেটকে খ্রীষ্টিয়ান করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন কর কৃষ্ণের পক্ষে ততদূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্‌চর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি"।

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার অন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষ কীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয় একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন

অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ঝাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজরুকী ভেলকির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি, যে জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দ্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডু তনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।" অতএব, জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যীশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য্য। যীশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্ম প্রচার; কৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবন নির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন, যে আমি যীশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া, তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, যিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার 'ব্যবসায়," অর্থাৎ অন্য কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যীশু বা শাক্যসিংহ আদর্শপুরুষ নহেন কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়

অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যীশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শপুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইঁহাদিগকে আমরা আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপ হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তক কণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটা বল্কল ধারী শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, ও ছাই ভস্ম নাই। নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল।—তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নবজীবনে তাহা বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্ত্তী কিন্তু যথার্থই হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্য-

ত্ত্বের আদর্শ- খ্রীষ্টাদিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, নবজীবনে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি সামঞ্জস্যযুক্ত তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যীশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেননা রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভুরিভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসন কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর যদি য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচার পীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যীশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা Hindu Ideal শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্য বিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে ও অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য সকল শ্রেণীরই

আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ যীশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করাও সম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ড প্রণেতা, তপস্বী, * এবং ধর্ম্মপ্রচারক, সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বী-দিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের, এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম তাহার আদর্শপুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখ রত, সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শপুরুষ সর্ব্ব কর্ম্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব্ব কর্ম্মে অকর্ম্মা। এরূপ ফল-বৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ব্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধ বধের ব্যাখ্যায় এসকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু একথা গুলি একদিন না

* তিনি যে তপস্বী তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে।

একদিন আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

সীতারাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির, নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমি খননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকাবোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একজন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিনজনে জঙ্গলমধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্র রাশিমধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্তনীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখী সকল বসিয়া নানাস্বরে কূজন করিতেছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডাল পালা ঠেলিতে হয়, কখন কাটায় নন্দারমার আঁচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডালছেড়ে তা'দের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়, কখন তাহাদের মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে,

ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খগ দৌড়িয়া যায়। যথাকালে তাহারা মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

দেখিলেন, মন্দির-ভূগর্ভস্থ, বহির্ হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দির দ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতে ছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না, কেন না তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে দেব দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিনজনে মন্দির দ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বাবা তুমি?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল!

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈকি? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সী। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সী। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে

বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মাননা কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিলে দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন,

"এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ও ধর্ম্ম রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান-রাজ্য ছারে খার যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান-রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও

হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকি। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব, যে তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল,

"আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমন কালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, "তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।" নন্দাকে বলিল, "তুমি মহিষীর উপযুক্ত; মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে সেই রূপ করিও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে।" রমাকে ফকির বলিল, "মা তোমাকে কিছু ভীরু-স্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও; কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না। ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে; রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই।"

তার পর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মধুমতী নদীর তীরে, শ্যামাপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈর্তৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেই খানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলে ফৌজদারের কোপ দৃষ্টি পড়িবার আশঙ্কায়, ভূষণা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামাপুরে, সীতারামের আশ্রয়ে বসবার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচর বর্গ, এবং খাদক যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামাপুরে বসিয়া বাস করিল। এরূপে, ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামাপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগর নির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজন সমাগম সেইখানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয় ; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়দ্দার, মহাজন. এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামাপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নুতন নগর হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নুতন নগর সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজা বাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে, জনরব উঠিল ,যে সীতারাম হিন্দু রাজধানী স্থাপন করিতেছেন ; ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমান পীড়িত, রাজভয়ে ভীত, বা ধর্ম্মাবাক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল। অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদ তুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানবলী রঞ্জিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নুতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের, সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা, নগর নির্ম্মাণ ও রাজ্য রক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা, এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহন করিলেন না, কেননা দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কাজ করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল. তাহাতে তিনি অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন না, ইহা ফৌজদার জানিত। কারাগার ভগ্ন করার নেতা যে তিনি, ইহা মুসলমান জানিতে পারে নাই। তিনি যে বন্দীর মধ্যে

ছিলেন, তাহাও ফৌজদার অবগত হয়েন নাই। কাজেই তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা কোন কারণ ছিল না। বিশেষ তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহন করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট স্বীকার করিয়া জমীদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন। এবং নূতন নগরীর নাম "মহম্মদ পুর" রাখাতে, এবং হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করাতে মুসলমানের অপ্রীতি ভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না। আপাততঃ মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সকলই নষ্ট হইবে; অতএব যতদিন তিনি উপযুক্ত বলশালী না হয়েন, ততদিন কোন গোলযোগ না বাধে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি, এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই, মহম্মদপুর লুঠপাঠ করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, যে তোমার জমীদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমাষ বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন, যে অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন, যে ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ে মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ, মহম্মদপুরে চারিপার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন পথে, গোপনে, অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে

নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়, মৃণ্ময় বা মেনাহাতী, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃণ্ময়, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়, কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

ছা। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যে সকল কর্ম্ম কামনা শূন্য হইয়া করা যায় তাহা আমাদিগের বন্ধের কারণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যে কাজ করিবে, তাহাতে যেন আসক্তি না থাকে, কর্ম্মফলে যেন স্পৃহা না থাকে। একটি ছেলে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি সেই লেখা পড়ায় আসক্তি না থাকে সে লেখা পড়ায় এলাকাড়া দিবে এরূপ এলাকাড়া দেওয়াকে কি ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়।

শি। তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম কথাটির অর্থ ঠিক বুঝ নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মে এলাকাড়া দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয় না। উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে অথচ কর্ম্ম ফলে স্পৃহা থাকিবে না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমি একটি উদাহরণ দিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন ছেলেরা ছুটাছুটি খেলা করিতেছে দেখিতেছিলাম। খেলায় হার হউক বা জিৎ হউক সে বিষয়ে কেহই উৎকণ্ঠিত নহে, তাহারা খেলা করিবার জন্য খেলা করিতেছে। এইরূপ ছেলে খেলায় ছেলেদের কতই উৎসাহ তাহা তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ। এই ছেলেদের খেলার বিষয় মনমধ্যে ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকিলে, যে কর্ম্মে উৎসাহ থাকিবে না ইহা কোন কাজের কথা নয়।

অনেকে এরূপ অলস আছেন যে তাঁহাদের কোন কর্ম্মেই গা নাই। অদৃষ্ট বলে যা হইতেছে হউক এইরূপ ভাবিয়া সকল কর্ম্মেই, যত্ন ও উৎসাহ বিহীন হইয়া চুপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাই এক কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহার ফল লাভে আকাংখা না থাকিলেও, অলস ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায় যে ফল তাহাতে আসক্ত। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে অনেক যত্ন অনেক চেষ্টা করা রূপ কষ্ট আছে সেই কষ্ট যাহাতে না পাইতে হয় অলস ব্যক্তির সেই আকাংখা। এইরূপ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম না করাকে, বন্ধের কারণ কর্ম্মের ন্যায় দেখিবে—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মকে অকর্ম্ম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে কিন্তু আমি ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ অভিমানশূন্য হইতে হইবে। আমি করিতেছি না, এইরূপ জ্ঞান জন্মাইলেই ঐ কর্ম্ম আমার পক্ষে অকর্ম্ম হইবে। এবং অলস হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন না করা যে অকর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্ম জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ অকর্ম্মও বন্ধের কারণ। অর্থাৎ চরম উন্নতি মুক্তির পথের কণ্টক বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ বুঝেন তিনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও পরমপদে যুক্ত।

এই সংসারক্ষেত্রে আমরা খেলা করিতে আসিয়াছি। যাহার যে রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করিয়া যাই এস। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখা যায়, সে ফলের উপর কোন লক্ষ্য রাখিয়া কাজ নাই। সকল কর্ম্ম সাধনের এক চরমফল আছে—সেই ফল আত্মজ্ঞান, বা মোক্ষপদ, বা ঈশ্বরে লীন হওয়া; সদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে অভ্যাস করি এস। কোন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন It is not the goal but the course that makes us happy. ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফল সম্বন্ধে এই জ্ঞানটি রাখা উচিত, যে কর্ম্ম করাটিই সুখ, কর্ম্ম ফল পাওয়াটি সুখ নহে।

যে ছেলে লেখা পড়া শিখিতে এলাকাড়া দিবে সে তাহার ঐ এলাকাড়া দেওয়া কর্ম্মের ফল পাইবে। লেখা পড়া শিখিয়া উপাধি পাব পুরস্কার পাব বা পরে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব, এই সকল সম্মুখস্থিত ফলের প্রত্যাশী হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে যাওয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নহে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই জন্য লেখা পড়া শিখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। সকল প্রকার কামনা শূন্য হইবে, কর্ম্ম ফলে কখন আসক্তি রাখিবে না—গীতাশাস্ত্রে এই উপদেশ বার বার কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই কর্ম্ম ফল কথায়, মোক্ষ ফল ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম ফল—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কামনা অর্থে ভোগৈশ্বর্য্য সুখে কামনা; মোক্ষফল পাইবার আগ্রহকে কামনা বলে না। নিষ্কাম হও এই কথার অর্থ সমস্ত অনিত্য সুখের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ পাইবার জন্য লালায়িত হও।

এমন অনেক অলস ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেটি ভ্রম। আমাদিগের ইচ্ছাবৃত্তি কোন না কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিবেই থাকিবে। সাধারণতঃ এই ইচ্ছাবৃত্তি নানারূপ ভোগ্য বিষয়েই লিপ্ত থাকে। নিষ্কাম ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে তোমার ইচ্ছাবৃত্তি যাহা এখন নানা বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাকে সেই সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া কেবল একমাত্র নিত্য পদার্থে—ঈশ্বর প্রীতিতে সংযুক্ত কর। যেমন সূর্য্যরশ্মি আতশি কাচের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া একটি বিন্দুতে জমা হইয়া প্রখরতর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের সমস্ত ইচ্ছা, এক ঈশ্বরপদ লাভে যোজনা করিয়া, সৎইচ্ছার প্রখরতা বৃদ্ধি করাই, নিষ্কাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ছা। এখন বুঝিলাম যে চুপ চাপ করে, যা হচ্চে হউক এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকিলেই নিষ্কাম হওয়া হয় না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কোনটি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কোনটিই বা কর্ত্তব্য নহে তাহা কেমন করিয়া বুঝিব।

শি। ঐটি বুঝা একটু শক্ত কথা। ইহা আর এক দিন বুঝাইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দুটি কথা।

প্রচারের কোন একজন পাঠক ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে গুটিকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। চিন্তাশীল লোক ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিবেন ততই নানারূপ দুরূহ প্রশ্ন সকল তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য মিমাংসা করিতে চেষ্টা করিব ইহাই আমাদেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপাততঃ পাঠক মহাশয় যে দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিব।

১ম। এই জগৎ যদি জগদীশ্বরের দেহ হয় তবে ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য এত চেষ্টা কেন। মোক্ষ মোক্ষ বলিয়াই বা চিৎকার কেন? আমরা সকলেই ত তাঁহার শরীরে আছি।

উত্তর। ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির অর্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া পড়ে।

যেমন একটি পত্র একটি বৃক্ষের সহিত অভিন্নভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে আমিও সেইরূপ সদাই ঈশ্বরে সংযুক্ত রহিয়াছি অথচ আমি মোক্ষ পদ পাই নাই—ঈশ্বরে লীন হইতে পারি নাই; এই দুইটি কথায় আপাততঃ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়। এই দুইটি কথার যদি একটি সত্য হয় তবে অন্যটি মিথ্যা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পূর্ণজ্ঞাণীগণ যাঁহারা আধ্যাত্মিক রহস্য ভেদ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটি কথাই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যেমন এক মাসের ছেলে, জানে না—যে সে মনুষ্য, কিন্তু তথাপি সে যে মনুষ্য এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই সেইরূপ আমি ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সত্যটি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যিনি আপনাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের

সহিত অভিন্ন বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাকেই মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন পুরুষ বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলে। আমরা এক্ষণে মুখে বলিতে পারি যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত কিন্তু যতক্ষণ এই সত্য অন্তরে ধারণা করিতে না পারিব ততদিন ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব না। ঈশ্বর ও আমি যে অভিন্ন এই জ্ঞানের অভাবস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার অত্যন্ত নাশ হওয়াকেই শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরে লীন হওয়া বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের সহিত আমার আমি জ্ঞান একান্ত সংযুক্ত করিতে পারিলেই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

আমার স্থূল দেহ এই বিশ্বের স্থূল দেহের সহিত স্থূল প্রাকৃতিক শক্তি সূত্রে একান্ত সংযুক্ত, আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের সহিত, আমার মন বিশ্বের মনের সহিত, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর শক্তিসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। 'যে চৈতন্যের বশে বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে সেই চৈতন্যের বশেই আমি চেতন; যে যে পদার্থ লইয়া আমি গঠিত, সে সকলই ঈশ্বরের, আমার কিছুই নহে, কেবল একটি জিনিস আমার আছে, সেইটি কেবল ঈশ্বরে সংযুক্ত নহে—সেইটি আমার অহংকার। আমি জানি যে আমি আর এই বিশ্ব এই দুইটি পৃথক জিনিস। এই জ্ঞানটিই অহংকার। যখন এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে না যখন আমার অহংজ্ঞান ঈশ্বরে সন্নিবেশ করিতে পারিব তখনই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

'ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির এইরূপ অর্থ বুঝিতে পারিলে, আমি ঈশ্বরে সংযুক্ত অথচ লীন নহি এ কথাটিতে আর গোলমাল ঠেকিবে না।

প্র। আমরা যদি সেই পরমপুরুষের অংশ তবে আর আমরা আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করি কেন? আমরা যাহা করিতেছি, তাহাত পরমাত্মাই করিতেছেন।

উ। অহংকার। যে সকল কর্ম্ম আমি করিয়া থাকি, বাস্তবিক সেই সমুদয় কর্ম্ম আমার কৃত নহে। প্রকৃতির গুণের বশে সমস্ত কার্য্য হইতেছে কিন্তু সেই সকল কর্ম্মে আমার আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকাতেই আমি কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমি ভাত খাই ইহাও প্রকৃতির কার্য্য আমি ছেলেকে ভালবাসি ইহাও প্রকৃতির কার্য্য কিন্তু আমি এই সকল বিষয়ে

আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করি—এই অভিমান টুকু আমার। এই অভিমান টুকুর জন্যই আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ভগবদ্গীতা।

যাঁহার এই অহংকার নষ্ট হইয়াছে তাঁহাকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় না। সমগ্র বিশ্বের সহিত আমি অভিন্ন এই জ্ঞান না জন্মিলে অহংকার ধ্বংস হয় না।

আমার অহংকার আমার নিজের। আমার অহংজ্ঞান সংকীর্ণ করা বা বিস্তীর্ণ করা আমার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে আমি আমার অহংজ্ঞান সমগ্র বিশ্বে বিস্তীর্ণ করিতে পারি। যিনি এইরূপে সমগ্র বিশ্বে আপনাকে এবং আপনাতে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পান তিনিই মুক্তপুরুষ, তিনিই ঈশ্বরে লীন পুরুষ, এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী স্থূল কথা।

আমরা বেদের দেবতাতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগত সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া; ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্য বুদ্ধির কতদূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য জ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন, ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্ক বুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং এখনও দেখিতে পাই যে সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বর জ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বর জ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বর জ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্ব্বোধ মুর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি, প্রভৃতির সম্যক অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ

---

* হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাহারা জানেন যে "বিজ্ঞান" অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। "নীতি" শব্দেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Polities, কিন্তু এখন আমরা "Morals" অর্থে ব্যবহার করি।

প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, যে তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে য়িহুদীদিগের সে ঈশ্বর জ্ঞান বস্তুত ঈশ্বর জ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্য প্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বর জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বর জ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেণ্টপল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এপর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ব যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। তবে বলিবার কথা এই যে প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্ত্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান্ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান, যে আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্ব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মের বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডূষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে; সকলই সেই

নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। তবে ইহাঁদেরও নিয়মকর্ত্তা, শাস্তা, এবং কারণ স্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্ব জগতের সর্ব্বাংশই সেই নিয়মকর্ত্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই একজনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্ত্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্ঠা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে, যে এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্বস্ব ধর্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মনুষ্যও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও বিশ্বাস থাকে, কেন না ইন্দ্রাদিকে লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক লোক রক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম—অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম এই যে একজন ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বকর্ত্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস ঐশিক কার্য্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোক কর্ত্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোক ও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুকর্ত্তা, আলোকদাতা, প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাযেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্ব্বাঙ্গীন জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদিশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মক্ষমূলের ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামাকরণ করিবেন, তদ্বিষয়িণী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান্! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না Theism না Polytheism, না Atheism—কোন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন—Kakenotheism বা Henotheism. এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে, অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মক্ষমূলের বেদ বিশেষ

প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে এই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার —অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিকধর্ম্মের তিন অবস্থা—

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড় চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে

স্রে সকলের মর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার করচরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভাব করা যায় না। "এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব" এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।

সংসার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যার বে তার মনে আছে।

সুধার বিবাহের কথা লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই, চল একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে সেই সরল বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বৃথা হইল। যে কথা লইয়া পাড়ায় এত আন্দোলন, মেয়ে মহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না। যে বাড়ীতে ঝি আছে সে বাড়ীতে সংবাদ পত্রেরও অনাবশ্যক!

তবে ঝি বিন্দুর বার বার নিষেধ বাক্যের এই টুকু মান রাখিল যে সুধাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; সুধার চরিত্র সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সে টুকু বলিল না। তবে শরৎবাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জেদ করিতেছেন, পাড়ায় পাড়ায় এই কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল।

বালিকা একেবারে শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় অভিভূত হইল, যাতনায় অস্থির হইল। উঃ এ কি সর্ব্বনাশের কথা, কি অধর্ম্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে? কালীদিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবী বাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে, হতভাগিনী আবার তালপুখুরে কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইবে? ছি! ছি! শরৎবাবু এমন কাজ কেন করিলেন, বিধবার নাম কেন লজ্জায় ডুবাইলেন, এ কলঙ্ক কি আর কখনও যাবে? ঐ পথে মেয়ে মানুষেরা কি বলিতে বলিতে যাইতেছে, তাহারা বুঝি

সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে, ঐ হেমবাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন! লজ্জায়, বিষাদে, মনের যন্ত্রনায় বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও কহিতে পারে না, বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না খাইয়া শুইতে গেল। উঃ শরৎবাবু কেন এমন কাজ করিলেন, দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন?

কিন্তু অন্ধকারে স্থাপিত লতা যেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটী সূর্য্য-রশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই যাতনায় ও লজ্জায় জীবনের একটী আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল। বিষাদে অন্ধকারের মধ্যে সুধা যেন একটী কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইল, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নয়নে পতিত হইল।

শরৎ বাবু কেন এমন কাজ করিলেন? বোধ হয় শরৎ বাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎ বাবুর কথা ভাবে, শরৎ বাবুও সেইরূপ সুধার কথা একবার মনে করেন। বোধ হয় দিন রাত্রি শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয় সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। বোধ হয় শরৎ বাবু অনেক যন্ত্রনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদির কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন? কি বলে, শরৎ বাবু বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎ বাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন? সুধার ইচ্ছা করে একবার শরৎ বাবুর পা দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে। তা কি হবে? বিধাতা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন? শরৎ বাবু যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কি হইতে পারে? উঃ লজ্জার কথা, পাপের কথা,—সুধা এ কথা মনে স্থান দিও না।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটী কোমল হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া সুধা আবার ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা শরৎ বাবু যা বলিয়াছেন সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুধা যদি সত্য সত্যই শরৎ বাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে

প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই তালপুখুরে শরৎ বাবুর বাড়ীটী পরিষ্কার করিবে, উঠানে ঝাট দিবে, বাসন মাজিবে, কায়মনে শরৎ বাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর স্বহস্তে শরৎ বাবুর ভাত রাঁধিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে, বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর স্বহস্তে মিশ্রির পানার বাটি শরৎ বাবুর মুখের কাছে ধরিবে। সহসা একটী পদশব্দ হইল, সুধা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, পাপিয়সীর পাপ চিন্তা পাছে কেহ জানিতে পাবে!

আর যদি শরৎ বাবুর বিদেশে কোথাও চাকুরি হয়? সুধা দাসীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার যত্ন করিবে। একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা বাস করিবে, সুধা সেই কুটীরে দুটী লাউ গাছ দিবে, দুটী কুমড়া গাছ দিবে, দুই চারিটী ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপন করিবে। কলিকাতায় ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পয়সা করিয়া পাওয়া যায়, সুধা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটী সাজাইবে। উমা সিংহে চড়িয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারণ করিয়া আলু থালু বেশে মেয়েকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে কেহ খাদ্য হাতে, কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে পতিপ্রাণা দময়ন্তী নিদ্রিত রহিয়াছে, নলরাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া কৃষ্ণের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এইরূপ ঠাকুরের ছবি গুলি দিয়া সুধা ঘরটী সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাট দিয়া ঘরটী পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎ আসিতেছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎ বাবু বাড়ী আসিলে সুধা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে; সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাশ্রু-নয়নে একবার বলিবে "তোমার দয়া, তোমার যত্ন কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবন সর্ব্বস্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু স্নেহ করিও।"

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃকালে সুধা গৃহকার্য্য করিতে করিতে এই চিন্তা করিত, দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিন্দু ও হেমবাবু একত্র বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা করিতেন, সুধা ও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন সুধা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুধা দিবা রাত্রি চিন্তাশীল,—সুধা আর প্রফুল্ল বালিকা নহে, যৌবন প্রারম্ভে যৌবনের স্বপ্ন তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে। সুধা সমস্ত দিন অন্যমনস্কা;—কখন, কদাচ, শরতের নামটী হইলেই সুধার মুখ খানি লজ্জায় রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্য কার্য্যচ্ছলে উঠিয়া যাইত।

এক দিন অপরাহ্লে বিন্দু ঘরে আসিয়া দেখিলেন সুধা জানালার কাছে বসিয়া এক খানি বৈ পড়িতেছে, দিদি আসিতেই সুধা সে বই খানি মুড়িল।

বিন্দু। "ও কি বৈ পড়ছিলে বন?"

একটু লজ্জিত হইয়া সুধা বলিল "ও বঙ্কিম বাবুর একখানা বই।"

বিন্দু। "কি বই?"

সুধা। "বিষবৃক্ষ।"

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও বই আমাকে দাও, উহা পড়িও না।"

সুধা দিদির হাতে বৈ খানি দিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পড়বো না দিদি, ও কি খারাব বই?"

বিন্দু। "না বন, বই খানি ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষে কি ও বই পড়ে?"

সুধা। "তবে দিদি তুমি আমাকে গল্পটী বলিও।"

বিন্দু। "গল্প আর কি, নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।"

শুষ্ক হৃদয়ে সুধা স্থানান্তরে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটি বড় সুন্দর প্রথা। এই কালী পূজার অন্ধকার নিশীথে ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত, যে খানে হিন্দু বাস করে সেই খানেই গ্রাম ও নগর ও সংসারীর গৃহ দীপাবলিতে উদ্দীপিত হয়। সে দিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি আলোকে পরিপূর্ণ হয়. আকাশের নির্ম্মল নক্ষত্র সমূহ নিস্তব্ধে জগতের নক্ষত্র দেখিয়া হাস্য করে। ধনীর গৃহ উজ্জ্বল আলোক-শ্রেণিতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটী পয়সার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাঁচটী প্রদীপ সাজাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীর দ্বারে জ্বালাইয়া দেয়।

কলিকাতায় আজ বড় ধূম। গৃহে গৃহে তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নিকণা উদ্গীরণ করিতেছে, যেন আমাদের টাউন হালের সদ্বক্তাদিগকে অনুকরণ করিতেছে, সেই রূপ গলার আওয়াজের সহিত তাহাদের কার্য্য শেষ হয়। যুবা যশোলিপ্সু দিগের ন্যায় হাউই বাজি আকাশের দিকে মহা তেজে উঠিতেছে, আবার তেজ টুকু বাহির হইয়া গেলেই হেটমুখ হইয়া মাটিতে পড়িতেছে, যাহার মাথায় পড়ে তাহারই সর্ব্বনাশ। বঙ্গ দেশের অসংখ্য নব্য কবির ন্যায় আজি রাত্রিতে অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে,—একই আওয়াজে তাহাদের উদ্যম শেষ, কেননা প্রথম প্রকাশিত পদ্য-কুসুম বা গীতিকাব্যটী বিক্রয় হইল না। বিষয়ীর ন্যায় চরকি বাজী বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতে ও সকলকে জ্বালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম কেহ কাছে যাইতে পারেনা। আর ছুঁচা বাজির ক্ষুদ্র ঘৃণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই শেষ হইল; কুটীলতা ভিন্ন সরল গতি তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরগ্লানি তাহাদের জীবিকার উপায়।

রাত্রি দশটার পর শরৎচন্দ্র হেমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে

তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিস্তব্ধে শরতের হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন, শরৎ লজ্জায় ও উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমের সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হেম প্রদীপের সল্‌তে উস্‌কাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"শরৎ, আমার স্ত্রীকে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি।"

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,

"যদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনার বাল্য-সুহৃদের এই একটী দোষ ক্ষমা করুন।"

হেম। "শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ। জগৎ সুদ্ধ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও তোমার প্রতি আমার মত তিলার্দ্ধ ও বিচলিত হয় নাই।"

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর জল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। "আমার স্ত্রী বাল্যকাল অবধি তোমাকে বড় ভাল বাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনিও তোমার কথায় দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদিগের ভক্তি আমাদিগের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।"

শরৎ। "আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।"

ক্ষণেক উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?" শ্বাস রুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। "সে কথা বলিতেছি তুমি সকল দিক দেখিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটী করিয়াছ?"

শরৎ। "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি ইহাতে কোনও পক্ষে কোনও ক্ষতি দেখিতে পাই না। যতদূর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটী করিয়াছি।"

হেম। "শরৎ, তুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বয়স অল্প, এই জন্যই আমি দুই একটী কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতিশয় লোক-নিন্দা।"

শরৎ। "অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাযটী যদি অন্যায় না হয় তবে নিন্দা ভয়ে আমি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন করিব?"

হেম। "তোমাদের একঘরে করিবে।"

শরৎ। "সমাজের যদি তাহাতেই রুচি হয়, তাহাই করুন। আমি সমাজের অনুগ্রহের প্রার্থী নহি।"

হেম। "তোমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে।"

শরৎ। "কলঙ্ক কি? আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি এই কথা। এটী যদি পাপ কার্য্য না হয় তবে সে কলঙ্ক আমার গায়ে লাগিবে না; যাঁহারা নিন্দা করিবেন তাঁহাদের মতামতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কায নিন্দনীয় মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।"

হেম। "বিধবা বিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতি বিরুদ্ধ।"

শরৎ। "ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রগমনও রীতি বিরুদ্ধ ছিল, অদ্য জাহাজে করিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথ যাইতেছে। চন্দ্রনাথ বাবু সে দিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়ম গুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ। ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন।"

হেম। "শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদার চরিত্র, একটী কথা আমি স্পষ্ট করিয়া বলিব, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার প্রকৃত মতটী আমাকে বলিও। দেখ হৃদয়ের উদ্বেগ চিরকাল সমান থাকে না, অদ্য যে প্রণয় আমাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটী হ্রাস পায় অথবা সেটী একেবারে ভুলিয়া যাই। সুধার প্রতি তোমার এরূপ প্রণয় চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না? উত্তর করিও না, আমি যাহা বলিতেছি আগে মন দিয়া শুন। তখনও

তোমরা একঘরে হয়ে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহার করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক! তখন হয় ত মনে উদয় হইবে কেন বাল্যকালে না বুঝিয়া একটী কায করিয়া এত বিপদ জড়াইলাম, আমার স্নেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্র কন্যাকে জগতে অসুখী করিলাম। শরৎ, যে কাযে এই ফল সম্ভব, সে কাযে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয়? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্যের অনুশোচনা দূর করা উচিত নহে? সুধার ন্যায় অনিন্দনীয়া রূপবতী, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সরলহৃদয়া অনেক বালিকা কায়স্থ গৃহে আছে, তোমার ন্যায় জামাতা পাইলে তাহাদের পিতা মাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন, সেরূপ বিবাহ করিলে, এখন না হউক কালে তুমিও সুখী হইবে। শরৎ, তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশবর্ত্তী না হইয়া যাহাতে জীবনে সুখী হইবে তাহাই কর।"

শরৎ। "হেম বাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি কেবল হৃদয়ের উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই, জীবনে সুখী হইব সেই আশায় প্রস্তাব করিয়াছি। আপনি যে কথাগুলি বলিলেন তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ক্রটী করি নাই। আক্ষেপের বিষয় যে বলিতেছেন, যদি বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় কার্য্য হয় তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয় তবে তজ্জন্য কখনই আমার হৃদয়ে আক্ষেপ উদয় হইবে না। বলুন এই বিস্তীর্ণ সমাজে কেন্ বিজ্ঞ লোক সৎকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়াছেন, বিদেশ গমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? সমাজের সংস্কার পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের জীবনের সুখের হেতু হয়, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে শান্তি দান করে। হেমবাবু তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অদ্য তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্য তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে সমাজ সংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে

জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিষেধগুলি একে একে স্খলিত হয়।

হেমবাবু, পরে আক্ষেপ হইবে এরূপ কায করিতেছি না, চিরকাল সুখে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল অভাগিনী সুধাকে সুখী করিব এই জন্য এই কাজ করিতেছি।

সুধার মন, সুধার হৃদয়, সুধার স্নেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জ্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সুধা আমার সহধর্ম্মিণী হইলে এ জীবন অমৃতময় হইবে। হেমবাবু, আমার হৃদয়ের উদ্বেগের কথা বলিয়া আপনাকে ত্যক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অদ্য সাঙ্গ হইল, হৃদয়ে একটী শেল লইয়া শ্রমজীবীরা পরিশ্রম করে না।"

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন "একটী বালিকার জন্য উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না,—একটী নৈরাশ্যে তোমার ন্যায় উন্নত হৃদয় যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম ক্ষান্ত হইবে না।"

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন—"একটী অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য হৃদয়ে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম্ম কিছুই থাকে না, অদ্য আমার জীবন অবলম্বন শূন্য হইল। কিন্তু এ কথা আপনাকে বুঝাইতে পারি এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?"

হেমচন্দ্র শরতের দুইটী হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন "শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এই কার্য্যটী করিতেছ কি না তাহাই দেখিতেছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিবেন এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতভাগিনী সুধার জীবন জগদীশ্বর সুখপূর্ণ করিবেন তাহাতে কি আমাদের অমত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে সুখী করুন।"

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ধারা বহিয়া তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি নীরবে হেমের হাত দুটী আপনার মাথায় স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শয়নঘরে বিন্দু একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলেন, শরৎ সাহসে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া নয়ন জলে তাহা সিক্ত করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন,

"বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে জীবন দান করিলে, এ দয়া, এ স্নেহের কি পরিশোধ করিতে পারি?"

বিন্দু। "ও কি শরৎবাবু, ছাড়, ছাড়, ছি! ছি! যার পা ধরিতে হবে সে ধরবেই এখন, আমাকে কেন, ছি! ছেড়ে দাও।"

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"বিন্দুদিদি, তুমি হেম বাবুকে এ কথা বুঝাইয়াছ, তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, তাহার জন্য চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

বিন্দু। "আর সম্মতি না দিয়া কি করি? যখন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন তখন আর আমরা বারণ করে কি করি?"

শরৎ। "বরকর্ত্তা আর কন্যাকর্ত্তা কে?"

বিন্দু। "দেখতে পাচ্চি বরই বরকর্ত্তা, কন্যাই কন্যাকর্ত্তা! বর এসে কনে দেখে গেলেন, বেশ পছন্দ হইল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখিলেন, বেশ পছন্দ হইল, সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল!"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, একবার উপহাস ত্যাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। সুধা ছেলে মানুষ, তার আবার সম্মতি কি সে এ গুপ্ত কার্য্যের কি বুঝিবে বল?"

বিন্দু। "না গো, সে এখন বেশ বুঝতে সুঝতে শিখেছে। তা বুঝি জান না? সে যে এখন সেয়না মেয়ে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়ে।"

শরৎ। "তোমার পায়ে ধরি বিন্দুদিদি, ঠাট্টা ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটী বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর।"

বিন্দু। "না বাবু, পায়ে টায়ে ধরিও না, এখনই সুধা দেখতে পাবে, আবার রাগ করবে? তুমি চলে গেলে কি আমরা দুটী বনে কোঁদল করিব? পরের দায়ে কেন ঠেকা বাবু?"

শরৎ। "তোমার সঙ্গে আর পারলুম না বিন্দুদিদি। মনে করেছিলুম

তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব, তা দেখছি আজ কিছুই হইল না।"

বিন্দু। "তা ঠিকঠাক আর কি? কেবল বামুন পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈত নয়, তা না হয় ডেকে দি বল? না কি আজকাল কলেজের ছেলে নিজেই বামুন পুরুতের কাজ সেবে নেয় তাও ত জানি নি। স্ত্রী-আচারটা কি আমাদের করিতে হবে, না তাও সুধা নিজেই সেরে নেবে? তা না হয় সুধাকে ডেকে দি? ও সুধা! একবার এ দিকে আয় ত ব'ন, শরৎ বাবু তোকে ডাকচেন. বড় দরকার, একটু শিগ্‌গির করে আয়।"

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও হাসিতে হাসিতে উঠিলেন। তখন শরৎ বিন্দুর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন,

"বিন্দুদিদি, তুমি ছেলে বেলা থেকে আমাকে বড় স্নেহ কর, একটী কথা শুন। তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছে, হেমবাবু তাহা আমাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটী মুখে বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর,—একবার আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।"

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "শরৎ বাবু. ভগবান্ আমার অভাগিনী ভগ্নীর জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কি আমাদের অমত? ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেষ্টা গুলি সফল করুন, তোমাকে মান্য ও যশ দান করুন। অভাগিনী সুধাকে ভগবান্ সুখে রাখুন, যেন চির-পতিব্রতা হইয়া সংসারে সুখলাভ করে।"

সাশ্রুনয়নে শরৎ উত্তর করিলেন ' বিন্দুদিদি, জগদীশ্বর তোমার এ দয়ার পুরস্কার দিবেন। তোমাদের দয়া, তোমাদের সৎকার্য্যে সাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় জ্ঞান এ জগতে দুর্লভ। লোকনিন্দা ভয় করিও না,—বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিতগণ বলেন বিধবা-বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।"

"বিন্দু। "শরৎ বাবু. আমি মেয়ে মানুষ, আমি শাস্ত্র বুঝি না। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে কচি মেয়েকে আমরা চিরকাল যাতনা দিব এরূপ আমাদের শাস্ত্রের মত নহে, দয়াবান পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নহে।"

জগতের মধ্যে সুখী শরৎচন্দ্র বিন্দুর নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিয়া বিদায় লইলেন। নীচে উঠানে আসিলেন। দেখিলেন সুধা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া একটী প্রদীপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! শরৎ সুধাকে প্রায় দুই মাস অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল। ঐ লাবণ্যময়ী পবিত্রহৃদয়া স্বর্গীয়া কন্যা কি শরতের হইবে? ঐ স্নেহপ্লাবিত নির্ম্মল নয়ন দুটী কি শরৎ চুম্বন করিবেন? ঐ লতা-বিনিন্দিত কমনীয় পেলব বাহুদুটী কি শরত নিজ বাহুতে ধারণ করিবেন? ঐ কুসুম বিনিন্দিত লাবণ্যবিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে ধারণ করিবেন? শরতের দরিদ্র কুটীরে কি ঐ সুন্দর কুসুমটী দিবারাত্র প্রস্ফুটিত থাকিবে? প্রাতঃকালে উষার আলোকের ন্যায় ঐ প্রণয় তারাটী শরতের জীবন আলোকিত করিবে? সায়ংকালে ঐ স্নেহ প্রদীপ শরতের ক্ষুদ্র কুটীর উজ্জ্বল করিবে? অসংখ্য উদ্যমে, অসংখ্য চেষ্টা ক্লেশে ও পরিশ্রমে ঐ স্নেহময়ী ভার্য্যা কি শরতের জীবনে শান্তি দান করিবে, জীবন সুখময় করিবে? এইরূপ চিন্তা লহরীতে শরতের পূর্ণ হৃদয় উথলিতে লাগিল, শরৎ একটী কথা কহিতে পারিল না।

সুধা কবাটের শিকলি দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, সুধা হেটমুখী হইল,—মাথায় কাপড়টী টানিয়া দিল। আবার শরৎ বাবুর কাছে মাথায় কাপড় দিল মনে করিয়া অধিক লজ্জিত হইল, চক্ষু দুটী মুদিত করিল,—চক্ষুর উপরের চর্ম্ম পর্য্যন্ত লজ্জায় রঞ্জিত হইয়াছে। সুধা আর দাঁড়াইতে পারিল না,—দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুধার সেই রঞ্জিত অবনত মুখ খানি অনেক দিন শরতের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। ক্লেশে, নৈরাশ্যে, পীড়ায়, সে মূর্ত্তি অনেক দিন তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শরৎ বাটী আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই স্বর্গীয় সুখ যথার্থই আছে? না অদ্য রজনীর দীপাবলির ন্যায় এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া যাইবে, ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে শরতের হৃদয় পূর্ণ করিবে? অপরিমিত সুখ মনুষ্য ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের সময় মনুষ্য হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হয়।

বাটী আসিবা মাত্র শরতের ভৃত্য শরতের হস্তে এক খানি পত্র দিল। শরতের হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, কেন হইল শরৎ তাহা জানেন না।

উপরে গিয়া বাতির আলোকে শরৎ দেখিলেন তাঁহার মাতার চিঠি। মাতা গুরুকে দিয়া এই পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এই রূপ।

"বাছা শরৎ! তুমি সুস্থ শরীরে কুশলে থাক, তোমার চেষ্টা সফল হয়, তোমার জীবন সুখময় হয়, তাহাই ভগবানের নিকট দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতেছি।"

"বাছা আজ একটী নিন্দার কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাছা শরৎ, তুমি ভাল ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস আমি ঐ নিন্দার কথা বিশ্বাস করি না; তুমি তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

"লোকে বলে তুমি সুধাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাছা এটী অধর্ম্মের কথা, এ কাযটী করিয়া তোমার বাপের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মা যত দিন বেঁচে আছে তাহাকে তুমি কষ্ট দিও না। বাছা, তুমি ত কথার অবাধ্য ছেলে নও।

"বাছা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার বাপ আমাকে কাঁদাইয়া রেখে গেছেন,—বাছা কালির যে অবস্থা তাহা তুমি জান। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, তোমার আশায় বেঁচে আছি, এ বয়সে তুমি আমাকে কাঁদাইও না,—আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই।

আমার মাথার চুলের মত তোমার পরমায়ু হউক। ভগবান্ তোমাকে সংসারে সুখ দান করুন, পুণ্য কর্ম্মে তোমার মতি হউক। এ অভাগিনী আর কি আশীর্ব্বাদ করিবে?"

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। দুর্ব্বল হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল;—শরৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাতা ও সন্তান।

সে দিন রাত্রিতে শরৎ যে যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। নৈরাশ্যের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদয়কে আবৃত করিল, আপনার কার্য্যে ঘৃণা ও লজ্জা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।

যে স্বপ্ন-বৎ সুখের আশা ছয় মাস ধরিয়া শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন তাহা অদ্য জলাঞ্জলি দিবেন? মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। সমস্ত জীবন সুখশূন্য উদ্দেশ্য-শূন্য চেষ্টা ও আশা শূন্য হইবে, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে, দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতে পারিবেন? মাতৃ আজ্ঞার জন্য শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেমচন্দ্র ও বিন্দুর নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে, তিরস্কার করিবে, অঙ্গুলি দিয়া তাহাদিগের দিকে দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটি কি সহ্য করিতে পারিবেন? লোকে এখন বলিবে ঐ দুইজনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বুঝিয়া সুঝিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যভচারিণীটা হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়-বিদারক কথা কি শরৎ সহ্য করিতে পারিবেন। যে বিন্দু বাল্যকালাবধি শরতের স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচরণ করিবেন? যে হেমবাবু স্বীয় ঔদার্য্যগুণে শরৎকে ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতেন, লোক নিন্দা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও সুধার সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের বিষম প্রস্তাবেও সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কি শরৎ জগতের তিরস্কার ও ঘৃণার পদার্থ করিবেন? যে স্নেহপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক পরিবারে প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিষধর সর্পের

ন্যায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিবেন? কালকূট বিষে সে পরিবার জর্জ্জরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনেয় কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন! এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন "মাতা, ক্ষমা কর, আমি এ কাযটী পারিব না।"

আর সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া হতভাগিনী সুধা? ছয় মাস পূর্ব্বে সে বালিকা ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের কথা মনে উদয় হয় নাই। এই ছয় মাসের মধ্যে শরৎই তাহাকে প্রণয় কাহাকে বলে শিখাইয়াছে, বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আশা জাগরিত করিয়াছে। আহা! ঊষার আলোক যেরূপ নিস্তব্ধে ধীরে ধীরে সুপ্ত জগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই নূতন আশা অনাথিনী বিধবার হৃদয়ে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, আজি লজ্জাবতী নম্রমুখী বিধবা তৃষার্ত্ত চাতকের ন্যায় সেই প্রণয় বারির জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। এখন শরৎ তাহাকে বঞ্চিত করিবেন? চিরকাল হতভাগিনী করিবেন, কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে এই নিষ্ঠুর সংসার মধ্যে ত্যাগ করিবেন? হয় ত অসহ্য অবমাননা ও কলঙ্কে দগ্ধহৃদয় হইয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন হৃদয়ে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে! শরৎ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিত যুবক আজি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘর বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইলেন, শরৎ কালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল, তাঁহার জ্বলন্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ও মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপ-পূর্ণ শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তব্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

মাতা পত্রে লিখিয়াছেন তিনি দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিবেন। মাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন? এ কার্য্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বৃথা আশা! শরৎ মাতাকে জানিতেন, বার্দ্ধক্যে বৈধব্যে, তিনি কখনই এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, কিম্বা যদি মুখে সম্মতি

প্রকাশ করেন, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ সাশ্রুনয়নে কহিলেন "পুণ্যা জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি, তোমার হৃদয়ে যেন সন্তাপ না দি, তোমার শেষ কাল যেন তিক্ত না করি!"

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরৎচন্দ্র ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল হইল, মন একটু শান্তি লাভ করিল, তিনি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত হৃদয়ে তিনি দিবালোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন তাহা তিনি জানেন না. কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিবামাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন,

"বাছা শরৎ তুমি এত কাহিল হয়ে গেছ; আহা তোমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বিছানায় না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা বিছানায় এস।"

শরৎ। "না মা, আমি বেশ ঘুমাইয়াছি আর ঘুমাব না। মা তুমি কখন এলে? কবে, আসিবে তাহা ঠিক করে আমাকে লেখ নি কেন? তোমার ষ্টেশন হইতে আসিতে কোনও কষ্ট হয়নি ত?"

মাতা। "না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ি টাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।"

শরৎ 'মা, আমি না বুঝিয়া সুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি সেটী ক্ষমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মা আমি তোমার অবাধ্য হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি সন্তানকে সে টুকু ক্ষমা কর। মা তুমি আমার সকল দোষই ত ক্ষমা কর।"

বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহ গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন,

"বাছা শরৎ, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তুই আমার কথাটী রেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করিলি। বাছা তুমি আমার কথা রাখিবে তাহা জানিতাম, তুমি ত বাছা আমার অবাধ্য ছেলে নও। আহা ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন।"

মাতার হস্তদুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া শরৎচন্দ্র অবারিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, মাতৃস্নেহে পুত্রের হৃদয় শান্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুল গৌরবের পরিণাম।

সুধার সহিত শরতের বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তথাপি মেয়ে মহলে সে কলঙ্কের কথা নিয়া অনেক দিন অবধি নাড়া চাড়া হইতে লাগিল, এমন সরস কথা কি আর রোজ রোজ মিলে? কালীতারার শাশুড়ীরা ত হাটের নেড়া হুজুক চায়, যখন একটু কায কর্ম্ম করিয়া অবসর হয়, অথবা কালীতারাকে গঞ্জনা দিতে ইচ্ছে হয় অমনি কথায় কথায় ঐ কথা উঠে।

ছোট। "হেঁ হেঁ বে ভেঙ্গে গেছে, মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙ্গে। আমার বেন কলকেতায় এসেছেন, ছেলে আর কি করে দিন কত চুপ করে আছে। বেনও গঙ্গাযাত্রা করবে আর ছেলেটা ঐ হতভাগা ছুঁড়ীটাকে আবার বিয়ে করবে।"

মেজ। "হেঁ গো হেঁ বেন বড় গুণবতী। ঐ পোড়ামুখীই ত সব করেছে, ও না করলে কি আর সম্বন্ধ হেতো? তার পর আমাদের ভয়ে সিন কাষটা

থেমে গেল, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছে পোড়ামুখীর প্রাণে ভয় নেই, ঐ বে হোলে কি আজ কালীকে আস্তো রাখতুম? আহা যেমন নচ্ছার মা তেমনি নচ্ছার মেয়েও হয়েছে, এমন ছোট লোকের ঘরের মেয়েও বে করে আনে? আমাদের এমন কুলেও কালী দিয়েছে।"

ছোট। "আর সেই মাগীই কি নচ্ছার বাবু,—ঐ হেমবাবুর স্ত্রীর কি নজ্জা সরম নেই? সে কিনা বিধবা ব'নটাকে বিয়ে দিতে রাজি হলো? ও মা ছি! ছি! চোদ্দ পুরুষকে একেবারে কলঙ্কে ডুবালে? অমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। বাপ মায় নুন খাইয়া মেরে ফেলেনি কেন?"

মেজ। "আর সেই এক রত্তি মেয়েটাই কি নচ্ছার গা? অমন বিধবাকে কি আর ঘরে রাখতে হয়? অন্য লোকে হলে কাশী বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিত, কি হরিনামের মালা হাতে দিয়ে বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাঠিয়ে দিত। ছি! ছি! ভদ্দর নোকের ঘরে এমন লজ্জার কথা?"

ছোট। "তা দিক্‌না সেটাকে বের করে, আর এত ঢলাঢলি কেন, সেটাকে বাজারে বের করে দিক্ না?"

মেজ। "ওলো ঢলাঢলির কি হয়েছে? আরও হবে। তোরা ত বন সব কথা জানিস নি, আমি ওদেব সব শুনেছি। এই দেখ না কি হয়? বড় দেরি নেই। তখন কেমন করে নুকোয় দেখব। পুলিসে খবর দিও না। অমন কুটুম থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, কুটুমের মুখে আগুণ।"

ছোট। "আবার বেন কলকেতা এসে কালীকে নিতে নোক পাঠিয়েছিল। একটু লজ্জা সরম নেই গা।"

মেজ। "ও লো লজ্জা সরম থাক্‌লে আর পোড়ামুখী ছেলের অমন সম্বন্ধ করে? তা হতভাগা বংশে আর কি হবে বল না? বৌমাকে নিতে আসবে? কাঠের চেলা দিয়ে পিঠ ভেঙ্গে দেব না? কালী একবার যাবার নাম করুক দিকি? ওর পিঠের চামড়া যদি না তুলি ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। ছি! ছি! অমন ঘরে বৌ পাঠায়, ওদের ছুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত যায়, কি ঝকমারি হয়েছে যে এমন হাড়ি ডোমের ঘরে গিয়ে বাবু বে করেছেন। ছি! ছি! ছি!"

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরতের সুখ্যাতি, বিন্দু ও সুধার সুখ্যাতি কালীতারাকে কত দিন শুনিতে হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃত-ভাষিণীদিগের সে অমৃত বচন এক্ষণ কিছু দিনের জন্য মুলতুবি রহিল,—বাবুর পীড়া সহসা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার প্রাণের সংশয়; তখন সকলে তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়-শাশুড়ীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারা ভয়ে ও চিন্তায় শীর্ণ হইয়া গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাত্রিতে চিন্তায় ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছেন জানিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেন। ভগিনীপতির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শরৎ চন্দ্র সে বাটীতে আসিলেন, কয়েক দিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্রও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কানাকানি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। হেমকে দেখিয়া শরৎও একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু উদার-চরিত্র হেম শরৎকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "শরৎ তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি মন্দ কার্য্য কর নাই, লজ্জা কিসের? বিবাহে তোমার মাতার মত নাই, মাতার কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছ তাহা কি নিন্দনীয়? তোমার মাতার অমতে তুমি যদি বিবাহ করিতে স্বীকার করিতে, আমরা স্বীকার করিতাম না। শরৎ তোমার কার্য্যে দোষ নাই, দোষের কার্য্য না করিলে নিন্দার কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।" শরৎ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যে বাল্যবন্ধুকে তিনি জগতের ঘৃণাস্পদ করিয়াছেন, যাঁহার পবিত্র সংসার তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি আপনি আসিয়া শরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকল মার্জ্জনা করিলেন। শরৎ হেমের কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন "এত দিন আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া স্নেহ করিতাম, অদ্য হইতে দেব বলিয়া পূজা করিব।"

হেমচন্দ্র ও শরৎ রোগীর যথেষ্ঠ সুশ্রুষা করিলেন। ঠাকুরের প্রসাদ

বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত না হইয়া কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকাইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয় দেখিবার জন্য শরৎ দিবারাত্রি রোগীর ঘরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ উৎকট পীড়া সহ্য করিয়া কালীতারার স্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তায় আধখানি হইয়া গিয়াছিল;—এ সংবাদ পাইবামাত্র চিৎকার শব্দে রোদন করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

শরৎ অনেক জল দিয়া বাতাস করিয়া দিদিকে সংজ্ঞাদান করিলেন, তখন কালীতারা একবার স্বামীকে দেখিবে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র সেটী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না,—আলু থালু বেশে আলুলায়িত কেশে শোকবিহ্বলা কালীতারা স্বামীর ঘরে দৌড়াইয়া গেলেন, মৃত স্বামীর চরণ দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রন্দন ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও জানে নাই, অদ্য সে প্রণয়টী জানিল, শূন্য-হৃদয় বিধবার অসহ্য যাতনায় স্বামীপদে বার বার লুণ্ঠিত হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে লাগিল। একবার করিয়া মৃত-স্বামীর মুখমণ্ডল দেখে, আর একবার করিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শান্তি হয় না। ক্ষণেক পর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল,—কালীর চৈতন্য শূন্য শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া শরৎ অন্য ঘরে লইয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরে কালীতারার শ্বশুরবাড়ীর সকলে বর্দ্ধমানে প্রস্থান করিলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের বাড়ীতে আসিয়া মাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলেন। কালীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখের সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীর-যষ্টিখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে। দেখিলে তাঁহাকে চত্বারিংশৎ বৎসরের চিররোগিণী বলিয়া বোধ হয়। চিরদুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

কুলমর্য্যাদা দেখিয়া কালীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল,—কিন্তু উৎকৃষ্ট কুল হইলেই সর্ব্বদা সুখ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধনগৌরবের পরিণাম।

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিলাম, আর একজন হতভাগিনীর কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব। শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি। শোক দুঃখের কথা না লিখিলে সংসারের চিত্রটী প্রকৃত হয় না। সংক্ষেপে সে কথাটি লিখিব।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন, সুতরাং বিন্দু বাড়ী থেকে বড় বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের পাড়ার লোকে অনুগ্রহ করিয়া যেরূপ প্রবাদ রটাইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে যাইতে বড় ইচ্ছাও ছিল না। তবে উমাতারা কেমন আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইতেন, লোকে যে খবর আনিত তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তিনি পাঁলকী করিয়া উমার বাড়ী গেলেন।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন তাঁহার জেঠাই মা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন, কিন্তু বাড়ী পঁহুছিয়া তাঁহার জেঠাই মাকে যে অবস্থায় দেখিলেন তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে জল আসিল। জেঠাই মার সে চিরপ্রফুল্ল মুখ খানি শুখাইয়া গিয়াছে, ভাসা ভাসা নয়ন দুটী বসিয়া গিয়াছে, কাক পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ গুলি স্থানে স্থানে শুক্ল হইয়াছে, সে স্থূল সুস্থ শরীর খানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কন্যার সেবায় দিবারাত্রি জাগরণ করিয়া, কন্যার মানসিক কষ্টের জন্য দিবারাত্র রোদন ও চিন্তায় উমার মাতা অকালে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিন্দু আসিবা মাত্রই তাঁহার জেঠাই মা চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিলেন

"আয় মা তোরা একে একে আয়, বাছা উমাকে একবার দেখ, যা করতে হয় কর, আমি আর পারি নি।"

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বিন্দু জেঠাই মার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। মৃত্যুর ছায়া সেই রক্তশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে।

বিন্দুদিদিকে দেখিয়া রোগীর মুখখানি একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটি ধরিয়া বাল্য-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ছেলে বেলার কথা উদয় হইতে লাগিল। অতি শৈশবে বিন্দু জেঠাই মার বাড়ী খেলা করিতে আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা আপনার সন্দেশটী ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত, আপনার খেলনা হইতে বিন্দুকে একটী দিত। তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু জেঠাই মার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ভাল বাসিত, উমাও গরিবের মেয়ে বলিয়া বিন্দুকে তুচ্ছ করিত না।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বাল্যকালের প্রণয়টী ভুলিলেন না, যখন জেঠাই মার বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত তখনই কত আনন্দ। ছয় মাস পূর্ব্বে জেঠাই মার বাড়ীতে দুই জন কত আহ্লাদে দেখা করিয়াছিলেন, আজ সে আনন্দ কোথায়! উমার সেই জগতে অতুল সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই সুন্দর ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায়,—সে সুগোল বাহুতে হীরক খচিত বলয় কোথায়? সরলচিত্তা জেঠাই মার সেই মিষ্ট হাসি কোথায়? সেই একটু ধনগর্ব্ব, একটু সাংসারিক গর্ব্ব কোথায়? সে সংসার সুখ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে,—সে সুখ উমাতারার অদৃষ্টাকাশে আর কখন, কখন, কখনই হইবে না। সে সুখ সাঙ্গ হইয়াছে, উমাতারার লীলা খেলাও সাঙ্গ প্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য্য, অকালে লীন হইল।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন

"বিন্দুদিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল।"

বিন্দু। "কালীতারার স্বামীর বড় পীড়া হইয়াছিল তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, উমা সেই জন্য তোমাকে দেখিতে আসিতে পারি নি।"

উমা। "ব্যারাম আরাম হইয়াছে?"

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন "কালী বিধবা।"

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন;—এক বিন্দু অশ্রুজল সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্ষণেক পর বলিলেন,

"কালী এখন কোথায়?"

বিন্দু। "শরতের বাড়ীতে আছে। কালীর মাও সেই খানে আছেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

উমা। "কালীকে বলিও, তাহার মন সুস্থ হইলে একবার আসিয়া দেখা করে। মরিবার আগে তাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করে।"

বিন্দু। "ছি উমা, অমন কথা মুখে আন কেন? তোমার উৎকট রোগ হয়েছে, তা ডাক্তার দেখ্‌ছে, ব্যারাম ভাল হবে এখন; ছি, অমন ভাবনা মনে আনিও না।"

উমা। "ভাল হয়ে কি হবে?"

বিন্দু। "ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মানুষের কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ দুঃখ সকলেরই কপালে ঘটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোণার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোনও উত্তর করিলেন না,—একটী ক্ষীণ হাসি সেই শীর্ণ ওষ্ঠ প্রান্তে দেখা গেল। ক্ষণেক যেন কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, পর বলিলেন

"ঐ জানালা থেকে দেখ"।

বিন্দু ও বিন্দুর জেঠাই মা জানালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ী আসিয়া ফাটকের নিকট দাঁড়াইল, ধনঞ্জয় বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দ্বারদেশে একটী বৃদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল তাহার সঙ্গে দুই জনে কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিন জনে পরামর্শ করিতেং উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "জেঠাই মা ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে ও বাবুটী কে?"

বিন্দুর জেঠাই মা বলিলেন "ও গো ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি।

ওঁর নাম সুমতি বাবু, কলকেতার যত বড় মানুষের কাছে গিয়ে পোড়ামুখো অমনি করে হেসে২ কথা কয় গো, আর যত মন্দ রীত চরিত শেখায় আর টাকা ফাঁকি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ভগবানই জানেন। যম কি পোড়ামুখোকে ভুলে আছেন?"

বিন্দু। "আর ঐ বুড়ী টা কে, ঐ যে হাত নেড়ে২ হেসে২ বাবুদের সঙ্গে কথা কইতে২ উপরে গেল?"

জেঠাই মা। "কে জানে ও হতভাগা মাগীটা কে,—এই কয়েক দিন অবধি জোঁকের মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে নেগে রয়েছে। কি কু চক্রে ঘুরচে, কে জানে?"

ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন "মা, আমি জানি, তোমরাও শীঘ্র জানিবে।" রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেই দিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার মাতার যত্ন সমস্তই বৃথা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, আশা নাই, জীবনে আর রুচি নাই; তাহার কাশি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে২ আমাশাও বাড়িল; দুর্ব্বল ক্ষীণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিল, আজ যায় কাল যায়, সকলে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল।

শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া নিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতভাগিনী বিধবা কালী দিদিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল;—রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালী ও উমার একটী হাত ধরিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া মুখ ভারি করিল, একটী নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বলিলেন "সমস্ত রাত্রি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব।"

উমার মাতা এ কয়েক দিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন বিন্দু বলিলেন "জেঠাই মা আজ তুমি ঘুমাও, আজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি।"

কালীতারাও থাকিতে ইচ্ছা করিল।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন। উমা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "আর কেন ঔষধ? আমি চলিলাম। যাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম, এই আমার পরম সুখ। বিন্দু দিদি, কালী দিদি, আমাকে মনে রাখিও।"

বিন্দু ও কালী রোগীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "মা, মা।" উমার মাতা পাশেই শুইয়া ছিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই। তিনি কন্যার আরও নিকটে আসিলেন। উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্ত পদ হিম হইল, নখ গুলি নীল বর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাতৃ বক্ষে স্নেহময়ী উমার মৃত দেহ শান্তি প্রাপ্ত হইল। * * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা ও বিন্দু ও কালীতারা পালকী করিয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ফাটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন সেই সুমতি বাবু সেই বৃদ্ধার সঙ্গে, বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া, নামিয়া আসিতেছেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন

"জেঠাই মা, ও বুড়ী কে তুমি এখন জেনেছ।"

জেঠাই মা কোনও উত্তর করিলেন না। দুই তিন বার বিন্দু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "ঐ বুড়ী মাগীর বনঝি না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, রাধিকা সাজে,—তার মুখে আগুন। সুমতি বাবু সেইটাকে ধনঞ্জয় বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০।১৫ হাজার টাকা বার করে নিয়েছেন, ভগবান্‌ই জানেন। বাছা উমা বেঁচে থাকিতে সেটাকে বাড়ী আনেন নি, এখন নাকি বাড়ীতে এনে রাখবেন, তার জন্য অনেক টাকা দিয়ে ঘর সাজান হয়েছে।"

ধনবান্ গুণবান্ রূপবান্ ধনঞ্জয় বাবু কলিকাতা সমাজের একটী শিরোরত্ন। সকল সভায় তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার খ্যাতি। তাঁহার অমাত্যেরা তাঁহার বদন্যতার সুখ্যাতি করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার রুচির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে হিঁদুয়ানীর জন্য পূজা করেন, কন্যাকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনার্থে ঘন ঘন ঘটকী পাঠাইতেছে। রাজপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্য জমিদার পুত্রকে "রাজা" খেতাব দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

সুবিজ্ঞ সুশিক্ষিত সুমতি বাবু শীঘ্র কলিকাতার এক জন অনরারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন এইরূপ শুনা যায়। তিনি সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবার লেভিতে গিয়াছিলেন, ভদ্রাচরণ ও সুমার্জ্জিত কথা বার্ত্তা শ্রবণে তুষ্ট হইয়াছেন। সুমতি বাবুর গাড়ী ঘোড়া আছে, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, ও মিষ্ট কথায় অসাধারণ ক্ষমতা আছে; তিনি সাহেব সুবোকে তুষ্ট রাখেন, বড় মানুষদের সর্ব্বদাই মন যোগান, উন্নতির পথে ক্রমশঃই উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটী শিরোরত্ন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

শরৎ বাবুর পরীক্ষা অতি নিকটে, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন; বাড়ীর ভিতর বড় যান না। শরৎ পড়িয়া২ বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক যত্ন সুশ্রূষা করেন, শরতের খাওয়া দাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন সে বিষয়ে দিবা রাত্রি যত্ন করেন। কিন্তু শরতের চেহারা ফিরিল না, শরৎ বড় পরিশ্রম করেন, রাত্রি জাগিয়া একাকী পড়বার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিন২ আরও বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন "বাছা, এত পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই, চল আমরা তালপুখুরে ফিরে যাই, তোমার বাপের বিষয় দেখিও, স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কলিকাতার জল হাওয়া তোমার সহ্য হয় না।"

শরৎ বলিলেন "না মা, এই বয়সে লেখা পড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কালীতারা পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বৌ ঘরে এলে শরতের মনে একটু স্ফূর্ত্তি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই বিবাহের কথা এক দিন শরতের নিকট উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন "দিদি পড়বার সময় ব্যস্ত কর কেন?"

বিন্দুর জেঠাই মা এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুখুরে ফিরে যান নাই। তিনি সর্ব্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেন। তাঁহারা দুই জনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুঃখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন "দিদি, তখন যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুঝে সুঝে কাজ করিতাম তা হইলে আর আজ এমনটী হইত না। তুমি তখন বড় কুল দেখিয়া বামুন পুরুতের কথা শুনে কালীর বিয়ে দিলে, আমিও পড়সীর কথা শুনে বাছা উমার বড় মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিলাম, তাই আজ এমন হইল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মানুষের হাত আছে, আমরা যা মনে করি সেইটী কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখিও, বাছা পড়েং বড় কাহিল হয়ে গেছে। শরৎকে মানুষ কর, সুখে সংসার করিতে পারে এইরূপে বে থা দাও, বৌ ঘরে নিয়ে এস, বৌয়ের মুখ দেখে শোক একটু ভুলিবে।"

শরতের মাতা বলিতেন "আমার ও তাই ইচ্ছে, বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই ভাবনা হয়েছে। আমার ও বোধ হয় বে থা দিলে বাছা একটু গায়ে সারবে। তা শরৎ যে এখন বে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিন্দা রটিয়েছে, মনে হলে কষ্ট হয়।"

উমার মাতা। "ছি, ছি, সে কথা আর মুখে এন না। আমি তখন মেয়েকে

নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না হলে কি আর এমন হয়। বাছা বিন্দু ছেলে মানুষ, হেম আর শরৎও ছেলে মানুষ, ওরা সব সে দিন-কার ছেলে, সে দিন ওদের হাতে করে মানুষ করেছি, ওদের কি এখনও তেমন বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে, তা নয়। বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন কাজ করে? তা যা হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটী মুখে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের যে আটকাবে না। নিন্দে মেয়েদেরই। ভুগতে হবে, নিন্দে সইতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা সে কচি মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেরাল নিয়ে খেলা করত, আর আঁকুসি দিয়ে পেয়রা পেড়ে খেত, তাকে ও এমন কলঙ্কে ডোবায়। আহা বাছার শরীর খানি যেন খেংরা কাটী হয়ে গিয়েছে, মুখ খানি সাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটী বসে গিয়েছে। দুদের ছেলে, এমন কলঙ্ক কি সে সইতে পারে? তা কপালে নিন্দে আছে, কে খণ্ডাবে বল?"

শরতের মা। "আহা বাছা সুধার কথা মনে হলে আমার বুক ফেটে যায়। কচি মেয়ে; ছেলে বেলায় বিধবা হয়েচে, আহা বাছার কপালে যে কি কষ্ট তা আমরাই বুঝি, সে দুদের ছেলে সে কি বুঝিবে? তার উপর আবার এই নিন্দে? যারা নিন্দে করে তাদের কি একটু মায়া দয়া নেই গো, একটু বিচার নেই? সুধা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ বল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মন্দ ভেবে এ কায করে নি; শরৎ সুধাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কলকেত্তায় নাকি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলে মানুষ, সে মনে ভাবলে এ বিয়ে হলেই বা। না হয় লোকে দুটা মন্দ বল্‌বে, শরৎ আর সুধা ত সুখে থাকবে। এই ভেবেই বিন্দু কাজটা করতে চেয়েছিল, সেও মন্দ ভেবে করে নি, আহা বিন্দুকে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি, তার মত মেয়ে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তা কে আসতে বলিও, তাকে দেখলেও প্রাণটা জুড়ায়।"

উমার মা। "আমি বলি গো বলি, তা সে সমস্ত দিনই কাজ কচ্চে তাই আসতে পারে না। বছা সুধা ত আর এখন কিছু কাজ করতে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কাজ করিতে দিই নে। আমি ও এই

শোকে পেয়ে উঠি নি, কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, ভাত বাড়তে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা বাছারে, এই বয়সে মাকে ফেলে কেমন কেরে গেলি?" উভয়ে অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন।

কালীতারা সেই সময়ে ঘরে আসিলেন। উমার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হেঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্চে কেন? তুই একটু দেখিস বাছা, একটু খাবার দাবার যত্ন করিস, পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করবে?"

কালী। "আমি যত্ন করিগো, কিন্তু সদাই পড়া শুনা করে; খাওয়া দাওয়ার তেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্চে।"

উমার মা। "বের কথা বলিছিলি?"

কালী। "একবার কেন, অনেকবার বলেছিলুম।"

উমার মা। "কি বলে?"

কালী। "সে কথায় কাণ দেয় না, কিম্বা বলে বিবাহে আমার রুচি নাই। অনেক জেদ করিয়া, মার নাম করিয়া বলিলে বলে, "মাকে বলিও, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তাহাতে, আমি সুখী হইব না।"

উমার মা। "ও সব ছেলেই অমন করে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয় বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

শরতের মা। "না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখনও মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমার ভয় করে, আমি জোর করে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়। আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেঙ্গেছে, বাছা কালীর উপর ও ভগবান্ নির্দ্দয় হইলেন, (রোদন।) কেবল শরৎ ই আমার ভরসা, শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

উমার মা। "বালাই, কেন গা বাছা শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বে না করে নেই নেই, পরে বে করবে। এখন পড়া শুনায় মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।"

শরতের মা। "দিদি, পড়া শুনাও যে তেমন হচ্চে, আমার বোধ হয় না।

শরতের চিরকাল পড়া শুনায় মন আছে, সে জন্য সে এমন কাহিল হইয়া যায় না।”

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন—“মা, তবে শরতের জন্য কি করিব ?’ ডাক্তার দেখাব ?

মাতা। “বাছা, মনের ভাবনায় ডাক্তার কি করিবে ? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা করিতে জানে না।”

কালী। “তবে কি হবে ? বিন্দু দিদির সঙ্গে এক দিন পরামর্শ করে দেখব ? আমাদের যখন যা কষ্ট হইত, বিন্দু দিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।”

মাতা। “বিন্দু এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না।”

কালী। “দেবে, বৈ কি মা, আমি এক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী যাব এখন।”

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আসিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল পরীক্ষায় হয় শরৎ চন্দ্র না হয় তাহার এক জন সহাধ্যায়ী কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। এক মাস পর পরীক্ষার ফল জানা গেল, কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইলেন, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র দিগের মধ্যে শরতের নাম নাই!

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন “বাছা এত করে পড়ে শুনে হাড় কালী করেও ত পরীক্ষায় পারিলে না। এখন কি করিবে ?”

শরৎ কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, “মা একবারে পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথম বার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।” শরৎ আর এক বৎসর পড়িলেন।

কালীতারা কয়েক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোন পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন “তোমার মাকে বলিও জেঠাই মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎ বাবুর জন্য যাহা ভাল হয় করিবেন। আমরা বন ছেলে মানুষ আমরা কি এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি!”

কালী এই কথা গুলি মাতাকে বলিলেন।

মাতা। “বাছা সুধাকে কেমন দেখিলে ?”

কালী। "সুধা ভাল আছে। কিন্তু কলকেতায় এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ঢেঙ্গা মেয়ে হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কাজ কর্ম্ম করচে। রংটাও সে ছেলে বেলার মত কাঁচা সোণার রং নেই, এখন কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুখুরের সেই কচি মেয়েটীর মত নেই।"

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোনও উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েক দিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার সময় মনে২ বলিলেন—

"বাছা শরৎ, মাতার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের আদেশ।

পর দিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা একখানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তর দিকে বড়শে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটী ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে পালকী নামান হইল, শরতের মাতা পালকীর ভিতর রহিলেন, সঙ্গে ঝি ছিল সে কুটীরের ভিতর গেল।

ক্ষণেক পর সেই ঝির সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স কত, ঠিক অনুভব করা যায় না; মস্তকে অল্পই কেশ আছে তাহা সমস্ত শুক্ল, শরীর গৌর বর্ণ ও স্থূল কিন্তু বলিপূর্ণ, মুখ খানি বার্দ্ধক্যের রেখায় অঙ্কিত কিন্তু প্রসন্ন। দুই কর্ণে দুইটী পুষ্প, ললাটে ও বক্ষে চন্দন রেখা, স্কন্ধদেশে উপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শিবিকার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,

"মা, আজ কি মনে করে আমাকে সাক্ষাৎ দিতে এসেছ? এস ঘরে এস।"

শরতের মাতা বৃদ্ধের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পিতা কুশলে আছেন,'

ব্রাহ্মণ। "হঁ বাছা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার সমস্ত মঙ্গল?"

শরতের মাতা। "ভগবান্ জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজি কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ নীরবে একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন, বলিলেন "মা, রোদন করিও না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধিত হইবে। কে নিবারণ করিতে পারে?"

শরতের মাতা। "সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সন্তাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।"

ব্রাহ্মণ। "আপনাকে দোষ দিবেন না। এ সমস্ত মনুষ্যের হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া ভাল বুঝিয়াই কাজ করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগের কল্পনা ও চিন্তা বিফল হইয়া যায়, ভগবান্ আপনার অভীষ্ট অনুসারে কার্য্য করেন।"

শরতের মাতা। "তথাপি সৎপরামর্শ লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা সেই জন্য অদ্য আপনার কাছে আর একটি বিষয়ে সৎপরামর্শ লইতে আসিয়াছি। একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার মত লইতে আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। "মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়া কর্ম্মে যাওয়া অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামত ও দিতে এখন সমর্থ নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতায় ও নবদ্বীপে আছেন,

শাস্ত্র আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপারগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রত্যহ দেব অর্চ্চনা করি, মনের তুষ্টির জন্য একটু ইচ্ছানুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।"

শরতের মাতা। "পিতা, যদি কেবল একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামীদেবের বংশানুগত গুরুদেব; আপনি আমর শ্বশুর মহাশয়ের সুহৃদ্ ছিলেন, স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন। আমাদের বংশে একটু বিপদ আপদ হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কার কাছে লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য যে টুকু স্নেহ ও মমতা করিবেন, কে সেরূপ করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?"

ব্রাহ্মণ। "মা রোদন করিও না, আমার যথাসাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষমতা অল্প, বিদ্যাও অল্প।"

শরতের মাতা। "যাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার রুচি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা তাহা আমাদের বঙ্গদেশে অবিদিত নাই, তা না হইলে এই ক্ষুদ্র পল্লিতে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিত না। পিতা আপনার কথাই আমার পক্ষে বেদবাক্য।"

ব্রহ্মাণ। "মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য। আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রতুল্য, আমি গণ্ডূষমাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। সহৃদয় অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাহাদিগের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই দুই এক জন আমার নিকট আসেন।"

শরতের মাতা। "পিতা, তবে সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্যই আসিয়াছি, কন্যাকে স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।"

ব্রাহ্মণ। "মা, বল তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতায় যদি তোমাদের কোনও উপকার সাধন করিতে পারি, সাধ্যানুসারে তাহা করিব।"

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন,

"পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটী বালবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ, আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ়মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন

"মা, বিধবা বিবাহ আমাদিগের রীতি বিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা কি তুমি জান না? এ ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত, সকলেই আপনাকে এ কথা বলিতে পারিত, এটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?"

শরতের মাতা। "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, এই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার মত, আপনার পরামর্শ, জানিতে ইচ্ছা করি এই জন্য আসিয়াছি। শ্রবণ করুণ, আমি নিবেদন করিতেছি।"

তখন শরতের মাতা আপন দুঃখের ইতিহাস আদ্যোপান্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দুর মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাদিগের কলিকাতায় আইসার কথা, শরৎ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ সুধার অখ্যাতি, অবমাননা, অসহ্য যাতনা ও শরীরের দুরাবস্থার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা, সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। তাহার পর শরতের পরীক্ষার কথা, তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা, তাহার অসহ্য অনন্ত হৃদয়ের যাতনার কথা গুরুদেবকে জানাইলেন। পরে বলিলেন—

"গুরুদেব, আমাদিগের চারিদিকেই দুর্দ্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিলেন,—বাল্যকালেই সে উমা যাতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা

শুনিয়া, আপনার সৎপরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালীর বিবাহ দিলাম, ভগবান্ সে পাপের শাস্তি আমাকে দিবেন না কেন? বাছা কালীর মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, জগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা শরৎ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা বিন্দু ও সুধা আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইহাদের বন্ধু, আপনিই ইহাদিগের অভিভাবক, আপনি এগুলির ভার লউন, যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন;—এ অনাথা বিধবা আর এ ভার বহনে অক্ষম।"

এ কথাগুলি বলিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতৃতুল্য গুরুর নিকট দুঃখের কথা বলিয়া যেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে ২ বৃদ্ধের চক্ষু অনেকবার অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহারও নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ ক্ষণেক আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন "মা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইয়াছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।"

শরতের মাতা। "পিতা, আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য বিধবাবিবাহ মহাপাপ কি না।"

গুরুদেব। "বাছা, জগদীশ্বরই পাপ পুণ্য ঠিক নিরূপণ, করিতে পারেন;—আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।"

শরতের মাতা। "তাহাই আগে বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে কি এ কাজ একেবারে রহিত? লোক-নিন্দার কথা আমাকে বলিবেন না;—আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, লোক-নিন্দায় আমার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

গুরুদেব। "মা, শাস্ত্র একখানি নয়, সকলগুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দু জাতির যেরূপ

আচার ব্যবহার ছিল তাহারই সার ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।”

শরতের মাতা। “পিতা, আমি স্ত্রীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন”

গুরুদেব। “এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্য্যটী নিষিদ্ধ বৈ কি।”

শরতের মাতা। “পিতা এখানকার শাস্ত্র আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না,—আমি মূর্খ অবলা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি নাই, যেগুলি আমাদের ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র তাহার মর্ম্ম কি এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। শুনিয়াছি কলিকাতার কোন কোন প্রধান পণ্ডিত বলেন যে শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন—

“মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা বলিতেছ তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রবিদ্যা আমি জানি, তাঁহার প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, এক দিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাঁহার কথাটী প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। মা, আর কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আর কিছু আমি বলিতে পারিব না।”

শরতের মাতা। “পিতা, আপনার অনাথা কন্যাকে আর একটী কথা বলিতে আজ্ঞা করুন, জগদীশ্বর তজ্জন্য আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি

শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামাজিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না। আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানে যেটি বোধ হয় কন্যাকে সেইটী বলুন,—বিধবাবিবাহে পাপ আছে কি না বলুন, যিনি জগতের নিয়ন্তা তাঁহার চক্ষুতে এই বিধবাবিবাহ কার্য্য কি গর্হিত?"

গুরুদেব। "মা, যিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনিও এ কথার উত্তর দিতে অক্ষম, এ হীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অণুমাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব হয় না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৈশাখ মাসে তালপুখুর গ্রামে আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে, চল তাঁহাদের সেই তালপুখুর গ্রামের বাটীতে যাইয়া বিদায় লই।

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র ঘুচিল না! তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোনও একটী কার্য্য দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি যুবক মাত্রই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধিটা তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগেঁয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েকমাস

থাকিতে অনেক খেদ করিয়াছিলেন ;—হেম বলিলেন "না শরৎ কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে বড় রুচি নাই।"

বিন্দু পূর্ব্ববৎ কচিআঁবের অম্বল রাঁধিতে তৎপর, এবং এক্ষণে সে রন্ধন কার্য্যের একটী সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জেঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না, উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ না ; ছিল তিনি প্রায়ই দুই প্রহরের সময় বিন্দুব বাটীতে আসিতেন। বিন্দুব বাড়ীর রকেতে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেলে গুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জেঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই প্রহর বেলা নাউসাগ কাটিত, সজ্‌নে খাড়া পাড়িত অথবা আঁকসি দিয়া কচি আঁব পাড়িত। জেঠাইমা বলিতেন, বিন্দু মেয়েটী ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কখনও পাকিল না।

তারিণী বাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াছে তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক শীঘ্রই সে শোক ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিশেষ বর্দ্ধমান কালেক্টরির সেরেস্তাদারি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্দেশ্যশূন্য নহে।

শরতের মাতা সাশ্রুনয়নে বধূ সুধাকে ঘরে আনিয়া বৃদ্ধ বয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতায়ই হইয়াছিল, কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না। কিন্তু কাজটা তজ্জন্য বন্ধ রহিল না। যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারাও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শান্ত প্রকৃতি দেবীপ্রসন্ন বাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করায় বিশেষ হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসিবার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একটা খুব হুলস্থূল করিলেন, খুব গণ্ডগোল করিলেন, কাজটা বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সে কাল গিয়াছে,—সেরূপ বাধা দেওয়ায় এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কাজ বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানীপুরের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন, কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন; আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহ সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘেঁষিলেন না; পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্য-সন্তানগণ, যাঁহারা এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঢিল ছুড়িতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একজন অনার্য্য পুলিষের সার্জ্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটেই রাখিয়া) তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণী বাবুর স্ত্রীর অনেক অনুরোধে তারিণী বাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। মীমাংসা হইল যে শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে—বলিলেন "আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না।" শেষে শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন, তাহাতেই সব মিটে গেল। তারিণী বাবু কিছু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন "ওহে বাবু তোমরা বুঝ না, বৃষ্টির জল যে দিক দিয়েই যাক শেষকালে গিয়া খানায় পড়বেই পড়বে। তোমরা বিধবাই বে কর আর ঘরের বৌকেই বার করে নিয়ে যাও, বামুনদের পেটে কিছু পড়লেই সব চুকে যায়। এই আমাদের সমাজ হয়েছে, তা তোমরা আপত্তি করিলেই কি হবে?" শরৎ উত্তর করিলেন "এইরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, ন্যায় অন্যায়ের একটু বিচার না থাকিলে সে সমাজ ও থাকে না।"

সনাতনের স্ত্রী অনেকদিন বাড়ীতে বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিত। বলিত "আমি তখনই বলেছিনু গো কলকেতায় যেও না, কলকেতায় গেলে জাত ধর্ম্ম থাকে না। ও মা সোণার সংসার কি হলো গা? আহা আমার সুধাদিদি, আমার চিনিপাতা দৈ খেতে বড় ভাল বাসিত গো, ও মা তার মনে এত ছিল কে জানে বল? ও মা তখনই বলেছিনু গো, কলেজের ছেলে জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়; ওমা তাই কল্লে গা?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সনাতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাতে পারলে না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনিপাতা দৈ শরৎ বাবুর বাড়ী লইয়া যাইত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম কর্ম্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না! কালীতারা সংসারের গৃহিণী, এত দিন পর জীবনের শান্তি কাহাকে বলে তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধনাদি করিতেন, সমস্ত গৃহটী পরিপাটী রাখিতেন, সংসার চালাইতেন। সুধা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, কালী দিদিকে স্নেহ করিত, কালীদিদি যাহা বলিত তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুখুর হইতে জল আনিত, বাটনা বাটিত, কুটনো কুটিত, দুদ জাল দিত, আর পুখুরে গিয়ে বাসন মাজিতে বড় ভাল বাসিত। পুখুরধারে আঁব গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, সুধা সেই খানেও ঘুরিত, যে ফলটী পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সুধা সেই গাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে এমন সময়ে শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল "কি ভাবিতেছ।"

সুধা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল "বলবো না।"

শরৎ। "হেঁ বলবে বৈ কি, বল না।"

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-স্তবকতুল্য দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই লজ্জাবনতমুখীর প্রস্ফুটিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুম্বন করিলেন। সে স্পর্শে সুধার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল। লজ্জায় অভিভূত হইয়া সুধা বলিল "ছি! ছেড়ে দাও।"

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন "তবে বল।"

সুধা একটু হাসিয়া বলিল, "ছেলে বেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, তখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে তাই মনে করিতেছিলাম।"

শরৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও

তুলিতে পারি নাই?" আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেয়ারা কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট একটা শব্দ হইল, কালীদিদি ঘাটে আসিতেছেন। সুধা লজ্জিতা ও ভীতা হইল, এবার শরৎ বাবু কোন পথ দিয়া পলাইবেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ থেকে এক লাফে বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়ে পড়িলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি লেখা পড়াও বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দু দিদি আক্ষেপ করিতেন, তাঁর গাছে চড়া অভ্যাসটা গেল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

সীতারাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম, তখন শিপাহীদিগকে দুর্গ প্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃণ্ময়ের সম্বন্ধে সম্বাদ জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন,

"মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচর বর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া, দেখিলাম ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিযা তীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গ রক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছেনা, দেখিয়া আপনার যাহা সাধ্য তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ, এবং গোলন্দাজ সিপাহিগণকে আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সম্বাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যতদূর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন,

"এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সম্বাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না ফৌজদার, সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এতদূর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্মরক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে

যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট—হিন্দুমাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারও শুভাদৃষ্ট, কেননা যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য মধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃণ্ময়ের সম্বাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃণ্ময়ের সম্বাদ আসিল। পীর বকশ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃণ্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড়, সীতারামকে বলিলেন, মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেইজন্য কি আসিয়াছি!

জয়ন্তী। তোমাকে পাইলে তিনি যতদূর সুখী হইবেন, এত আর কিছুতেই না। তবে, তাঁহাকে তুমি সুখী না করিবে কেন?

শ্রী। তুমি ত আমাকে শিখাইয়াছ যে ইন্দ্রিয়াদির নিরোধই যোগ।

জয়ন্তী। ইন্দ্রিয় সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?

শ্রী। আমার কথা হইতেছে না।

জয়ন্তী। যাঁহার কথা হইতেছে, তাঁহাকে তুমি এই পথে আনিতে পারিবে। সেইজন্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে, রাজর্ষি কর না কেন।

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি, যে তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

জয়ন্তী। আমি যে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত আছি, যে তোমাকে দেখাইব।

শ্রী। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্, দুই দিক বজায় রাখা যায় কি না।

অতএব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

কৃষ্ণচরিত্র।

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া

যায়, যে গীতোক্ত ধর্ম্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। দুই একটা কথা তাহার উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory" "Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরাজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Gloire" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফেড্রীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয়, যে এইরূপ "Gloire" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর, ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেননা দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে, যে আর্য্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। Diogenes মহাবীর আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একজন বড় দস্যু মাত্র।" ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিয়াছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

"তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও এক প্রকার তস্কর-কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের

---

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্য্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেননা রাজনীতিজ্ঞ নহি।

হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজির নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়। তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ত্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্ব্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন, যে উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্ম্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেননা এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

এইখানে সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায়ের শেষ ভাগে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে; "প্রজাগর" "সনৎসুজাত" এবং "যানসন্ধি।" প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্ব্যাধ্যায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহার কিয়দংশ মৌলিক সন্দেহ নাই, সকলই যে মৌলিক, এমন বোধ হয় না। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয় মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, যে তিনি পাটিপি পাটিপি—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্ত্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন "আমি যখন, সহায় তখন অর্জ্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে "অনন্তর মহাবীর কিরীটি তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন" এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে, যে বুঝি উনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিগ দিয়া উনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে

বলিলেন। ষষ্টি•ম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিছু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্য্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা, চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে অর্জ্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই, যে ৫৯।৬০ ৬১।৬২।৬৩,৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া একপদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায় গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্ত্তী এই অধ্যায় গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে, যে ইহা যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি; এবং সুরনিপাতিনী অসুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্রে উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্ব্বে যাঁহাকে মদ্য পানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে এমন কিছুই নাই, যে তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ

চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল। এইখানে আমরা কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম। ইহার পর ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়। সে অতি বিস্তৃত কথা—দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার সমালোচনা আরম্ভ করিব। যতদূর আমরা আসিয়াছি, ততদূরে বোধ হয় তিনটি কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে।

১। কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন দৈব শক্তিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করেন নাই।

২। মানুষ চরিত্রে তিনি সর্ব্বগুণের আধার, এবং সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—অথচ স্বয়ং নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত।

৩। ঈদৃশ পুরুষই আদর্শপুরুষ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য।

আদর্শমনুষ্যত্ব ঈশ্বরাবতার ভিন্ন অন্য মনুষ্যে সম্ভবে কি না, এ কথার বিচার পাঠক নিজে করিবেন।

গোময়ের সদ্ব্যবহার।

যাহা আছে তাহার কখনও অভাব হয় না এবং যাহা নাই, তাহার অস্তিত্ব কখনও সম্ভবে না, হিন্দুদের দর্শন শাস্ত্রে এই রকম কথা আছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ কাল সেই কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পদার্থের বিনাশ নাই, এবং এই বিশ্বের পদার্থ সমূহের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি নাই—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ আজ কাল এই সত্য সাধারণের চক্ষের উপর ধরিয়া দিতেছেন। কাঠে আগুণ দিলাম কাঠ জ্বলিয়া গেল, সাধারণে মনে করিতে পারেন যে, যে ওজনের কাঠ পোড়াইলাম তাহার অধিকাংশই ত ধ্বংস হইয়া গেল,

কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা দেখাইয়া দেয় যে বাস্তবিক কাঠের পদার্থের ধ্বংস কিছু মাত্র হয় নাই; কতক পদার্থ ধুঁয়ার আকারে বাতাসে মিশাইয়া রহিল, কতক পদার্থ ভস্মরূপে পড়িয়া রহিল; ঐ ভস্ম ও ধুঁয়া প্রভৃতি একত্রে মিশাইয়া ওজন করিলে কাঠের ওজনের সঙ্গে ঠিক সমান হয়। এইরূপে তাঁহারা দেখাইয়া দেন যে ধ্বংস বলিয়া কথা নাই—তবে এক পদার্থ আজ এক প্রকার অবস্থায় আছে কাল তাহা অন্য অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপে পদার্থের বিকার ঘটিয়া থাকে কিন্তু হ্রাস বর্দ্ধন বা বিনাশ কখনও সম্ভবে না।

পদার্থ সকল এক প্রকার অবস্থা হইতে যে অন্য প্রকার অবস্থায় পরিণত হয় সেই পরিণামও প্রকৃতির একটী চমৎকার নিয়মের বশে চলিতেছে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এই নিয়মটীকে পরিণাম চক্র বলিয়া উল্লেখ করা আছে, ইংরাজী বিজ্ঞান ইহাকে Cyclic change বলা হয়। এই পরিণাম চক্র কিরূপ তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চাই। সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ হইতে উত্তাপের হ্রাস হইয়া বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টি মাটিতে পড়িয়া নদী প্রভৃতিতে পড়িয়া পুনরায় সমুদ্রে আসিয়া সমুদ্রের জলরূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের জলীয় পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তনে কখন বাষ্প কখন মেঘ কখন বৃষ্টি কখনও নদীর জলের আকার পাইয়া অবশেষে উহার পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রকৃতির বশে জগতে পদার্থের যা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সকলেই চক্র পথে ঘুরিতেছে। কি জড় জগৎ কি জৈব জগৎ যেখানেই দেখ সেইখানেই প্রকৃতির পরিণামচক্র নিয়মানুযায়ী খেলা দেখিতে পাইবে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; আবার সূর্য্য এই সমস্ত গ্রহাদি সঙ্গে লইয়া কোন নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরিতেছে। চাকার ভিতর চাকা আবার তাহার ভিতর চাকা এইরূপ চাকার পাকে কি অণু কি পরমাণু কি শৈল কি নদী কি সাগর কি মহাসাগর কি দ্বীপ কি দেশ কি বৃক্ষ কি কীট কি পতঙ্গ কি মনুষ্য কি সমাজ কি সাম্রাজ্য সমস্তই ঘুরপাক খাইতেছে। আজ ঐ অভ্রভেদী দেবাত্মা ভীষণ-

দর্শন হিমাদ্রীকে অচল অটল দুর্ভেদ্য গগণস্পর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এমন কাল আসিবে যখন প্রকৃতির পরিণাম চক্র নিয়মানুযায়ী খেলায় গিরিরাজের ভীম কলেবর সমুদ্র তটস্থ শিলাখণ্ডে পরিণত হইবে, পরে তাহাও থাকিবে না, নদীতটস্থ বালুকাকণার সহিত মিশিয়া যাইবে আবার কালচক্র যেমন ঘুরিবে সেই সঙ্গে ঐ ধূলারাশি আবার একত্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈলাকারে পরিণত হইবে। এই শৈল যখন আবার গগনভেদী হইয়া উঠিবে তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে হিমাদ্রি সম্বন্ধীয় একটি চক্র পূর্ণ হইবে।

জীবের জীবনে, জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যুতে এই পরিণাম চক্রের খেলা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলি—এই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি কথাটির অর্থ বুঝিলে চক্র তত্ত্বের ভিতরের কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাটি জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকল যাহা ভূমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রাণী শরীরে উপাদান সকল সেই সেই পদার্থ হইতে আহৃত হইয়া একত্রে যখন সমাবিষ্ট থাকে তখন প্রাণীর জীবিতাবস্থা, আর এই একত্ব ঘুচিয়া যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তখন প্রাণীর মৃত্যু অবস্থা; মৃত্যু অর্থে মহাজনের ধার সব শোধ দিয়া তাহাদের সঙ্গে ফারখতি লওয়া। মাটি থেকে যাহা লইয়া বাঁচিয়া আছি মরিবার সময় তাহা মাটিতে ফিরিয়া যায়, জলীয় ভাগ জলে মেশে, বায়ু থেকে যাহা লইয়াছি তাহা বায়ুতে মিশিয়া যায় এইরূপ যেখানকার পদার্থ সেইখানে চলিয়া যায়, মাঝে থেকে জবের জীবন চক্রখানি একবার ঘুরিয়া পড়ে।

জীবন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণীগণ কেবল ধার করিতেছে, আর ধার শুধিতেছে। আমরা যে প্রত্যহ আহার করি ইহার ভিতরে যে কি চমৎকার লেন দেনের ব্যাপার রহিয়াছে তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। উদ্ভিদ্‌গণ আমাদের জন্য আহারের উপযোগী পদার্থ সকল যোগাইয়া দেয়, আমরা সেই সকল পদার্থ অন্নরূপে গ্রহণ করি, এবং সেই অন্ন আমাদের শরীরে অঙ্গারক বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া নিশ্বাসের সহিত বাহিরের বাতাসে মিশে; এই অঙ্গারক বাষ্প হইতে উদ্ভিদ্‌গণ আবার তাহাদের শরীর ধারণোপযোগী পদার্থ সকল আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। আজ মাঠে যে ধান

শীষগুলি দেখিতেছ ঐ গুলি আমাদের জঠরানলে দগ্ধ হইয়া এক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাই রক্ত রূপে পরিণত হয়, উহাই আবার নিশ্বাসের সহিত বাষ্পাকারে বাহির হইয়া বাতাসে মিশে, পরে উহাই আবার উদ্ভিদ্ জীবনের উপযোগী পদার্থ হইয়া উদ্ভিদ্জীবন রক্ষা করে, এইরূপ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণত হইয়া ধান্যস্থ পদার্থ পুনরায় যখন ধান্যেই পরিণত হয় তখন ঐ পদার্থের একটি চক্র পূর্ণ হয়। প্রাণীগণ যখন স্বভাবের অধীন হইয়া কার্য্য করে তখন ইহাই দেখা যায় যে তাহারা উদ্ভিদ্গণ হইতে যে সকল পদার্থ ধার করে মলমূত্র প্রশ্বাস ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদ্গণের ধার শোধ দিয়া থাকে। প্রাণীগণ উদ্ভিদ্গণ হইতে তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী পদার্থ আহরণ করে উদ্ভিদ্গণ আবার প্রাণীশরীর নিঃসৃত মল মূত্র বায়ু ও তাপ হইতে তাহাদের জীবনের উপযোগী পদার্থ ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রকৃতি প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ্জগতের মধ্যে পরস্পরের এই লেন দেন সম্বন্ধ সুচারুরূপে বজায় রাখিতে সদাই ব্যাস্ত।

মানুষের কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য—পদার্থ সম্বন্ধে কোনটি সদ্ব্যবহার কোনটিই বা অসৎদ্ব্যবহার এইটি ঠিক বুঝিতে গেলে কোনটি প্রকৃতি সুন্দরীর অভিমতানুযায়ী কার্য্য কোনটিই বা তাঁহার অভিমতানুযায়ী নহে সেইটি বুঝা কর্ত্তব্য।

হিন্দুদের মধ্যে গোজাতি ও গোজাত দ্রব্য সমুদয়ের যেরূপ আদর পৃথিবীর কুত্রাপি আর সেরূপ নাই; আমরা গাভীগুলিকে ভগবতীস্বরূপ পূজা করি, যে বাড়ীতে গরুর যত্ন থাকে লক্ষ্মী সেইখানে বাস করেন এইরূপ কথা আমরা বলিয়া থাকি। গরুর দুগ্ধ হিন্দুর কাছে পবিত্র আহার বলিয়াই যে কেবল আমাদের কাছে গরুর এত আদর তাহা ঠিক নহে, গোমূত্র এবং গোময় ও আমাদের কাছে পবিত্র পদার্থ। কবিরাজগণ ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করেন তাহাদের শোধন করিবার জন্য অনেক সময় গোমূত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া কেহ যদি অশুচি হয় তবে সে ব্যক্তি গোময় ভক্ষণ করিলেই পবিত্রতা ফিরিয়া পায়। ঘর দুয়ার দেয়াল পবিত্র রাখিবার জন্য প্রত্যহ গোময় লেপন করিয়া থাকি। গোময় ও গোমূত্র মাহাত্ম্য মহাভারতে এইরূপ কীর্ত্তিত।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গো সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গো সমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি তুমি কে? কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন স্থানেই বা গমন করিবে আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গো সমুদায়, আমি লোককান্তা শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। * * *

এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি, তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজনভোগ্যা, এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদের অভিলাস নাই। আমরা স্বভাবতঃই রূপ সম্পন্ন রহিয়াছি সুতরাং তোমারে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

* * * *

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাভাগ, ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না।

* কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ, অনুশাসনিক পর্ব্ব্যাধ্যায়।

কিন্তু তোমাদের কোন অঙ্গই কুৎসিৎ নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার, এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে দয়াপরায়ণ ধনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব আমরা তোমার অনুমতি করিতেছি তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

গো সমুদয় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক।"

গোময় ও গোমূত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন এ কথাটী বড়ই সত্য। ভাবুক ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং আজ কালকার লোকে এই সত্যটি ঠিক বুঝিতে পারিলেই দেশের পূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিবে এই আশা করা যায়।

যাহা মহৎ কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত তাহাকে যদি সামান্য কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার যে অনাদর করা হয় এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা আজ কাল সচরাচর গোময়ের যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি—উহা অপব্যবহার—গোময়ের অনাদর। গোময় কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ঘুঁটের আকারে জ্বালানি কাঠের কার্য্যও করিয়া থাকে। যে রাশি রাশি গোময় জ্বালানি কাঠের কার্য্য করে উহার তুলনায় যে টুকু সারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় উহা অতি সামান্য। ঘর দ্বার লেপিবার জন্য ও অন্যান্য কাজে অতি সামান্য গোময়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাই যে গোময় সারস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া ইন্ধনে পরিণত হইলে উহার বড়ই অসদ্ব্যবহার করা হইল। একমাত্র কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহারই গোময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার—প্রকৃতি সুন্দরীর অভিপ্রেত।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়।

ফুলের হাসি।

আঁধারে আজি, ফুল, ফুটিলি কেন বল্,
কি সুখ প্রাণে তোর লুকায়ে পরিমল!
তোর এ রূপরাশি; তোর এ সুধা-হাসি,
আঁধারে মিশাইয়ে লভিলি কোন্ ফল—
আঁধারে আজি ফুল ফুটিলি কেন বল্!

তুই ফুটবি ব'লে প্রবাসে যেতে যেতে,
সাঁঝের রবিখানি আপনি আড়ি পেতে,
মেঘের আড়ে থেকে চাহিল তোর পানে,
চাহিল কত বার লোহিত দু নয়ানে।
সোণার কর দিয়ে অতুল সুষমায়,
সাজা'লে কভু সাধে আপনি তোর কায়,
বিষাদে কত বার করিয়ে কত ভাণ,
গাছের আড়ে গিয়ে জানা'লে অভিমান।
তুষিতে তার প্রাণ, তবু ত উঠিলি না—
কই রে, ফুলবালা, তুই ত ফুটিলি না।

চুমিছে পরিমল, আকুল অলিদল
কত-না আশা ক'রে এখানে এসেছিল,
পাখিরা নেচে নেচে, পাখিরা গেয়ে গেয়ে,
ঘুরিয়ে তোর পাশে সকলে ফিরে গেল।
নদীতে ছুটে ছুটে আকুল ঢেউ গুলি,
ধরিতে হাসি তোর আসিল মুখ তুলি'।
চাহিয়ে তোর পানে কত-না আশা ক'রে,
হতাশে চ'লে গেল মিশিতে পারাবারে।

পবন ছুঁয়ে তোরে ঠেলিল কত বার,
সে কালে, শুনিলি না তুই ত কথা তার।
সোহাগে কত বার গেল দে মুখ চুমে,
রহিলি তবু তুই অঘোর হ'য়ে ঘুমে।
কাতর সে সবারে ভাল ত বাসিলি না—
কই রে, ফুলবালা, তুই ত হাসিলি না!

তিমিরে বসুমতী হইলে নিমগন,
সকলে চ'লে গেল—গেল না সমীরণ।
শীতল জল-কণা যতনে আনি' ছুটি'
মুছা'য়ে দিল তোর অলস আঁখি দুটি।
অমনি ধীরে ধীরে দেখিলি তুই চেয়ে,
ঝরিল সুধাহাসি অধর তোর বেয়ে।
খেলিলি বায়ু সনে সরমে ফিরে ঘুরে,
কখনো কাছে তার, কভু বা গিয়ে দূ'রে।
শ্যামল-কিসলয় তোর সে কেশ-ভার,
লুকা'লি তার মাঝে মু'খানি কত বার।
হাসিয়া সমীরণ আসিয়া পুন তুলে,
সোহাগে চুমি' তবে ঘোমটা দিলে খুলে।
অমনি হেসে তুই হইলি ঢল্ ঢল্
আঁধারে আজি, ফুল, ফুটিলি কেন বল্!

ভালবাসা।

শি। এই জগতের পদার্থ সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত; চেতন জীব এবং জড় পদার্থ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বশে জগৎ চক্র ঘুরিতেছে তাহা

দিগকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; যে শক্তিসূত্রে একটি জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত বাঁধা থাকে তাহার নাম জড় শক্তি; যে শক্তি নিবন্ধন চেতন জীব জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিষয়াশক্তি এবং জীবের সহিত জীবের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহার নাম ভালবাসা।

যে ভাব নিবন্ধন আমরা সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি তাহাই চেতন ভাব অর্থাৎ জীব-ভাব। আমার দেহ আছে, রক্ত আছে অস্থি আছে রূপ আছে ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু ইহারা চেতন পদার্থ নহে। যে পদার্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন আমি সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি সেই টুকুই আমার চেতনত্বের কারণ, হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমার রক্তের সহিত আর একজনের রক্তের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহা জড় সম্বন্ধ; একজনের রূপ শব্দ প্রভৃতির সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক যে অনুরাগ তাহার নাম বিষয়ানুরাগ; একজনের সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক আকর্ষণের নাম ভালবাসা বা প্রণয়। যিনি অপর একজনের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তিনিই যথার্থ প্রণয়ী। সাংখ্যকার বলেন যে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী; এই গুণ কথাটির অর্থ বন্ধনরজ্জু—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। এই তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ তাহা সাত্বিক সম্বন্ধ, চেতন জীবের সহিত জড় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা রাজসিক সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত জড়ের যে সম্বন্ধ তাহা তামসিক সম্বন্ধ।

শক্তি তত্ত্ব আলোচনা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ কেবল জড়জাতীয় শক্তিতত্ত্বই আলোচনা করিতেছেন এবং আর্য্য-বিজ্ঞানে কেবল চেতন জাতীয় শক্তিতত্ত্বই সমালোচনা করা আছে। ইহাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। সাত্বিক ও রাজসিক শক্তিকে চেতন জাতীয় শক্তি বলিতেছি।

জড় জগতে শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার লক্ষিত হয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। রাজসিক শক্তির ক্রিয়াও প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়, রাগ ও দ্বেষ।

এই রাগের অপর নাম কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব।" রজোগুণ সম্ভূত বিষয়াশক্তির নাম কাম এবং সত্ত্বগুণ সম্ভূত আসঙ্গ লিপ্সাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।

এইবারে সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বলি শুন। চিত্ত রজোভাব অর্থাৎ বিষয় সুখভোগেচ্ছা প্রবল হইলে যখন সেই সুখ প্রাপ্তি জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়; কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে।

চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব কিরূপ তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি শুন। চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য একজনের সুখ অন্বেষণেই ব্যাস্ত, যাহাতে সেই অন্য ব্যক্তি সুখী হয় সেই কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার অন্তরে সাত্ত্বিক ভাব উদয় হইয়াছে; অর্থাৎ যথার্থ যাহাকে ভালবাসা বলা যায় সেই ভালবাসার ভাব যাঁহার চিত্তে বিরাজমান তাঁহার চিত্তের অবস্থাকে সাত্ত্বিক ভাব বলা যায়। আকর্ষণের চরম ফল দুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া, ভালবাসার ও চরম উদ্দেশ্য দুটি মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ দুজনের সুখ দুঃখ মিশিয়া যাওয়া। সাত্ত্বিক ভাব প্রবল হইলে মনুষ্য এমন একজনকে খুঁজিতে থাকে যাহার সুখ দুঃখের সহিত তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে পারেন, যাহার সুখ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে গিয়াই যাহার সুখ সাধনোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়াই তিনি সুখী হইতে পারেন। রাজসিক ভাব প্রবল হইলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যে বিষয় ভোগেচ্ছা জন্মে তাহার নাম কাম; যদি কেহ কাম্য বস্তু লাভের প্রতিকূলতা চরণ করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য জড় ভাব প্রাপ্ত হয় (যেমন আলস্য নিদ্রা অবস্থা) তাহাই চিত্তের তামসিক অবস্থা।

এইবার তুমি কাম ও প্রেম এই দুইটি কথার অর্থ বোধ হয় অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ এই দুইএর প্রভেদটি ঠিক বুঝিতে পারা বড় প্রয়োজনীয় কেননা মনুষ্য জীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে যাহা প্রকৃত পক্ষে

রাজসিক ভাব যাহা কাম তাহাকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া বুঝিয়া প্রকৃত প্রেমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

প্রকৃত প্রণয়ের সাহায্যে কাম দমন করিতে হয়, নচেৎ জোর জবরদস্তি করিয়া যাঁহারা কাম দমন করিতে চান তাঁহারা ভুল পথে চলিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের আধিক্য উপস্থিত না হইলে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব কমে না। যদি নিষ্কাম কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে চাও তবে প্রকৃত ভালবাসা অভ্যাস করিতে শিখ। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা দ্বারা নিজের কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোনগুলি রজোগুণ সমুদ্ভব আর কোন্ গুলিই বা সত্ত্ব গুণ সমুদ্ভব তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে চিত্তে যে ভাব উদয় হয়, স্মৃতি বৃত্তির সাহায্যে সেই ভাব চিত্তে সতত জাগরুক রাখিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা রাজসিক বৃত্তি সমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়। ঈশ্বর ভক্ত যে সময় ঈশ্বরের উপাসনা করেন সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য উপস্থিত করাই সেই উপাসনার উদ্দেশ্য।

ভালবাসা তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়া জগৎশুদ্ধ সকলকে ভাল বাসিতে শিখ তবেই ক্রমে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমে একজনকে ভাল বাসিতে শিখ তাহার পর পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য সমষ্টিকে তোমার ভালবাসার আধার পদার্থ বুঝিয়া সেই পদার্থে তোমার ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখ।

যে ভাবে জগৎকে ভাল বাসিবে সেই ভাবটি সম্যক্ না বুঝিয়া যদি "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" দেখিতে যাও তবে প্রচারের "গ্রাম্য কথার" সেই যে বালকের বিদ্যার পরিচয় দেওয়া আছে তোমার বিদ্যাও সেই ধরণের হইয়া দাঁড়াইবে।

ভালবাসা রহস্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে জোর জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা জন্মে না। যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহারই সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে প্রবৃত্তি জন্মে। যে চিত্ত উন্নত তাহাই সুন্দর; যাহা যথার্থ সুন্দর নহে মোহবশতঃ তাহাকেই সুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনা হারা হইও না তাহা হইলে তোমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না যাহাকে আজি ভ্রম বশতঃ সুন্দর

বলিয়া বুঝিয়াছ কিছুকাল মিলনের পর সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া দারুণ দুঃখে পতিত হইতে হইবে। মোহবশতঃ যে ভালবাসা তাহা চিরস্থায়ী হয় না।

জ্ঞানালোকে মোহ দূর হয় সুতরাং জ্ঞানালোকের সাহায্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভাল বাসিতে শিখিবে। ভালবাসা রহস্য সম্বন্ধে আমার উপদেষ্টা এইরূপ কথা বলেন যে "প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক"। কি ভাল কি মন্দ, কি সুন্দর কি সুন্দর নয় ইহা সম্যক বিচার করা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। কিন্তু মনুষ্যগণ মায়ার বশে থাকায় জ্ঞানের আলোক সম্যক প্রস্ফুরিত হয় না এবং সেই জন্যই এ পৃথিবীতে এত গোলমাল; যে সৌন্দর্য্য সূত্রে জীব সকল গাঁথা রহিয়াছে সেই সূতা গাছটিতে যেন জোট পড়িয়া রহিয়াছে, সূতাটির কুড় খুঁজে পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে।

'Tis distance lends enchantment to the view' ইংরাজী এই enchantment কথাটি আর আমাদের "মায়ার মোহ" কথাটি একার্থ-বোধক বলিয়া বুঝি। এই মায়ার মোহ বসে যাহাকে আজ সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিছু দিন মিলনের পর আর সেখানে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না এই জন্যই পৃথিবীতে নূতনের আদর পুরাতনের আদর নাই। কিন্তু যিনি যথার্থ প্রেমিক তাঁহার কাছে নূতন পুরাতন দুইই সমান। কেননা ভাল বাসার আধারে কোন অংশটুকু প্রকৃত সুন্দর এবং কোন অংশ সুন্দর নয় সেই সত্য পূর্ব্বে সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি ভালবাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুটি চিত্ত মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসার চরমফল কিন্তু মনের মতন সৌন্দর্য্য এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া মেলা ভার সেই জন্য যিনি প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনি মনের মতন সৌন্দর্য্য গড়িয়া সেই ভবিষ্যৎ সুন্দরের চিত্তে চিত্ত অর্পণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর চিত্তের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার অভিপ্রায়ে যিনি কোন এক আধার অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য গঠন কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহার কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলি।

যিনি ভালবাসা অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে কি কি অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা বলি শুন।

১ম। চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য যাহাতে জন্মে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমে চিত্তের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যে অন্য একটি চেতন জীবের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার জন্য অন্তরে একটা ব্যগ্রতা উপস্থিত হইবে।

২য়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রকৃত সুন্দর ও উন্নত চিত্তের ভাব কিরূপ ক্রমাগত চিন্তাদ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতে হইবে।

৩য়। নিজের চিত্তে চিত্রিত সুন্দরের সৌন্দর্য্যে অপর একজনকে ভূষিত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে।

৪র্থ। এইরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার সময় কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল ফলে তাহা সবিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

৫ম। এই সুন্দর গঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যে উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ প্রত্যাশা করিও না। যদিও এই এক জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয় এই সুন্দর গঠন কার্য্যে তোমার চিত্ত যে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইবে পর জন্মে সেই উন্নত চিত্ত লইয়া তুমি জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সে জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকর হইয়া উঠিবে।

৬ষ্ঠ। যদি তোমার মনের মানুষ গড়িয়া লইতে সক্ষম হও তবে তাহার সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া নিজের অহংজ্ঞান ঘুচাইতে শিখিবে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার ভালবাসার শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

৭ম। তাহার পর যেমন একজনকে সুন্দর করিয়াছ সেইরূপ এই সমস্ত পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার আধার বুঝিয়া মনুষ্য সমষ্টিকে সুন্দর ও উন্নত করিতে যত্নবান হইবে। যিনি এইরূপ কার্য্যে ব্রতী ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে আবির্ভূত হয়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়া থাকে।

ছা। কি উপায় অবলম্বনে চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য জন্মে সে বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। মনে করুন একজন রূপের সৌন্দর্য্য-গ্রাহী, যেখানে তিনি সেই রূপের সৌন্দর্য্য দেখেন তাঁহার ভালবাসা সেই-খানেই গিয়া পড়ে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার রূপতৃষ্ণা দূর হইয়া অন্তরে সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য জন্মিতে পারে?

শি। সুন্দরকে ভালবাসা আর সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা এ দুটি কথায় বড় প্রভেদ সেটি স্মরণ রাখিও। যাঁহার রূপ তৃষ্ণা প্রবল তিনি রূপ উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু যিনি যথার্থ সুন্দর রূপ ভাল বাসেন তিনি সেই সৌন্দর্য্য গ্রাহী হইয়াও রূপ উপভোগের কামনা করেন না। উপভোগে সুন্দরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কিন্তু যিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্য-গ্রাহী সুন্দরের সৌন্দর্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে তিনি সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।

"সোনার বিগ্রহ করি পূজ এক দিন
সেও রে পরশ দোষে হয়রে মলিন" হেমচন্দ্র।

উপভোগে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় সুতরাং যিনি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্য ভালবাসেন তিনি কখনও সেইরূপ উপভোগ করিতে গিয়া রূপবান্ বা রূপবতীর রূপ নষ্ট করিতে চান না। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি যেন রূপ ভাল বাসিতে শিখেন। যিনি রূপ তৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি রূপবান্ বা রূপবতীকে রূপের আভায় উজ্জ্বলতর করিতে যত্নবান হউন, যেখানে কেবল রূপের সৌন্দর্য্য আছে সেইখানে যাহাতে গুণের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া মুখকান্তি অধিকতর দীপ্তিশালী হইতে পারে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন, এবং এইরূপ কর্ম্মেই তৃপ্তিলাভ করিতে শিখুন তবেই তাঁহার রূপভোগ তৃষ্ণা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।'

চেতন জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া পুরুষ, স্ত্রী উপভোগের জন্য তৃষ্ণাতুর হইয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা হইতে পৃথিবীতে, দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি যত কিছু অসুখের কারণ জন্মিয়াছে। পুরুষ যবে স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক যবে পুরুষকে যথার্থ ভাল বাসিতে শিখিবে সেই দিন এই পৃথিবী রম্যস্থান হইয়া উঠিবে। যে পুরুষ স্ত্রীকে উন্নত করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করেন তিনিই যথার্থ স্ত্রীকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোককে উন্নত করিবার অভিপ্রায় যাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় না অথচ যিনি স্ত্রী সঙ্গ কামনা করেন তিনি কামুক তাঁহার ভালবাসা এবং ব্যাঘ্রের হরিণ শিশুকে ভালবাসা অনেকটা এক রকম।

মানুষ নিজে আপনার মুখ দেখিতে পায় না, সেই জন্য নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়; মানুষ তাহার নিজের মন সুন্দর কি কুৎসিৎ সেইটি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু সেটি না বুঝিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; যত দিন সেইটি বুঝিতে না পারে তত দিন এক একখানি দর্পণের প্রয়োজন হয়। স্ত্রী-চিত্ত পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের চিত্ত স্ত্রীর পক্ষে সেই দর্পণ।

দর্পণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সত্যের অনুরূপ হয় না; যে চিত্তে একেবারে কপটতা নাই তাহাই নির্ম্মল কিন্তু এরূপ নির্ম্মল দর্পণ সহজে খুঁজিয়া মেলে না। হীরক সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন যখন মাটির ভিতর থাকে তখন তাহারা সমল থাকে পরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাহাকে বা আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ পুরুষরত্ন বা স্ত্রীরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উঁহাদিগকে ঘসিয়া মাজিয়া, প্রয়োজন মতে আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়।

সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার, কুৎসিতকে সুন্দর করিবার আগ্রতাকে প্রেম প্রণয় ভালবাসা ভক্তি বা স্নেহ নাম দেওয়া যায়। সমলকে নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায় যদি না থাকে তবে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পর যে সঙ্গ লালসা তাহাকে ভালবাসা বলিতে চাই না।

ভালবাসার ভাব তিন প্রকার,—ভক্তিভাব, প্রেমভাব এবং স্নেহভাব। যিনি আমাকে উন্নত করিতে পারিলেই আনন্দিত হন তাঁহার প্রতি আমার যে ভাব তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি নিবন্ধন ভক্ত ভক্তির পাত্রের আজ্ঞানু-পালনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সৎপাত্র বুঝিয়া যাহাকে উন্নত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহার প্রতি আমার যে ভাব দাঁড়ায় তাহার নাম স্নেহ। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট সেইখানকার ভাবের নাম প্রেম।

ভক্তির পাত্রে ভক্তি স্নেহের পাত্রে স্নেহ এবং প্রেমের পাত্রে প্রেম ন্যস্ত করিয়া আনন্দের উদ্দেশে সতত অগ্রসর হইতে শিখ।

প্রবোধ।

শীতল চাঁদের আলো
পড়েছে ভুবন ময়,
হাঁসেরে প্রাণের হাসি
লতা পাতা ফুল চয়।

বিমল চাঁদের আলো
প্রাণেতে পড়েনি ব'লে,
তাই কি পরাণ আজি
উঠিতেছে জ্বলে জ্বলে ?

কোন পথে গেছি আমি
আমার আমাকে লয়ে,
সেথায় নাহিক আলো
বিষাদ রহেছে ছেয়ে।

কত কি আমার ছিল
কিছুই নাহিক আর,
জন শূন্য প্রাণ প'ড়ে,
করিতেছে হাহাকার।

অন্ধ কারাগার হ'তে
বার হয়ে আয় প্রাণ
আগেকার মত আজ
বারেক গাহিরে গান।

চাঁদের কিরণে দ্যাখ্
ধরাতল গেছে ভেসে,

যাতি যূথী শেফালিকা
স্বপনে উঠিছে হেসে।

শিহরি' উঠিছে বায়ু
পরশি হরষ কায়
আঁধারে ঢাকিয়া তনু,
বসে কেন তুই হায়?

ফুলের হাসির মত
বারেক হাসিয়া উঠ্,
শিশির সিঞ্চন করি,
ফোটারে আঁধার ঠোঁট।

বিমল চাঁদের আলো,
কত ভালবাসা ময়,
এ দেখে কি ভালবাসা
প্রাণে নাহি উথলয়?

মিশে যারে অশ্রু জল
বিমল শিশির সনে,
আনন্দ লহরী মালা
উথলি' উঠুক মনে।

স্নেহ শিশু গুলি আহা
জন্ম' লভি পুনরায়
বেড়াক হৃদয়ে ছুটে
বসন্ত সমীর প্রায়।

অমিয় জড়িত ভাষে
আয় আয় আয় বলি
ডাকিয়ে তাদের চাঁদে
হোক্ তারা কুতুহলী

কত টুকু ভাল বাসা
তোর মনে ছিল প্রাণ
একজনে দিয়ে তাহা
হ'ল তার অবসান?

হাসে চন্দ্র ভাসে দিক্
উথলি কৌমুদী রাশি
শূন্যে শূন্যে ছুটে গিয়ে
ছড়ায় বিমল হাসি।

চাঁদের মতন আজি
স্থাপি মনে ভালবাসা,
বসন্ত মুকুল সম
লইয়ে শতেক আশা।

অবিশ্রান্ত ভাল বাসা
জগ-জনে বিতরণ
করিয়ে চাঁদের মত
হ' দেখিয়ে ফুল্লানন?

যে চাবে রে ভালবাসা
করিবি তাহারে দান,
যে ভাল বাসেরে ভাল
তার তত বাড়ে মান।

দান ক'রে ভালবাসা
ফুরাইয়ে যায় যা'র,
হৃদয়ের ভাল বাসা
নহে তার আপনার।

যে ভাল বাসিলে পরে
মানুষে দেবতা হয়,

সেই ভালবাসা আজ
শিক্ষা কর রে হৃদয়।

কালিদাসের উপমা।

আজকাল ইংরেজি সাহিত্য বড় নেড়া রকম—অলঙ্কারশূন্য। পূর্ব্বতন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যায়। বর্কের বক্তৃতায় এবং গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতায় তুলনা কর। বর্কের কথা কেমন রসময়ী—অলঙ্কৃতা, নানা রত্নে বিভূষিতা, কাব্যের সপত্নী। গ্লাডষ্টোনের সে সব কোথায়? হব্‌সের দর্শনশাস্ত্র এবং স্পেন্‌সারের দর্শনশাস্ত্র তুলনা কর। হব্‌সের লিপি-প্রণালী—নানাবিধ অলঙ্কারে সুভূষিতা, স্পেন্‌সরের রচনা "শুষ্ককাষ্ঠংতিষ্ঠত্যগ্রে"। বেকনের সন্দর্ভ এবং আর্থর হেল্পসের সন্দর্ভ তুলনা কর, এ তুলনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মিল্‌টনের আরিওপেজিটিকা এবং মিলের লিবর্টি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তুলনা করিলেও ঐরূপ প্রভেদ দেখা যায়। আর প্রাচীন ইংরেজি কবিদিগের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি কবিদিগের তুলনাই করা যায় না। প্রাচীনদিগের তুলনায় আধুনিকেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীবী।

আমরা বাঙ্গালী, ইংরেজের অনুকারী; বাঙ্গালা সাহিত্যও ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে চলিতেছে, কাজেই আমাদেরও সেই রোগে ধরিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও সচরাচর বড় অলঙ্কারশূন্য। অলঙ্কারশূন্য বলায় আমার এমন বলিবার অভিপ্রায় নয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দাড়ম্বরশূন্য। ইংরেজি সাহিত্যে অন্য অলঙ্কার আজকাল না থাকুক, শব্দাড়ম্বর কিছু আছে; আর বাঙ্গালিরা ভিক্টর হিউগো প্রভৃতি কতকগুলি ফরাসি লেখকের গ্রন্থের অনুবাদও পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং শব্দাড়ম্বরের আদর্শের তাঁহাদের

অভাব নাই। অতএব বাঙ্গালি লেখকের সে গুণে ঘাট নাই। মশা মারিতে সচরাচর কামানই পাতা হইয়া থাকে। যাঁহাকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলা হইয়া থাকে, সেই মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থেও একটা ইঁদুর নড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠে, রুদ্ধবায়ু সকল পর্ব্বত-গহ্বর হইতে নিক্রান্ত হইয়া হুহুঙ্কারে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়—পর্ব্বতশৃঙ্গ খসিয়া পড়ে, লোকালয়ে হুলস্থূল উপস্থিত হয়। * মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থে যা, একখানি ক্ষুদ্র সম্বাদপত্রেও তাই দেখিতে পাই। কিন্তু বিশুদ্ধ—যথার্থ মনোহর—অলঙ্কারের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সচরাচর বিশেষ অভাব।

দুঃখের বিষয় এই যে বিশুদ্ধ এবং যথার্থ মনোহর অলঙ্কারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দেশীয় সাহিত্যে থাকিতেও বাঙ্গালি লেখকেরা তাহার অনুবর্ত্তী হয় না। সংস্কৃত লেখকদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ অলঙ্কার প্রয়োগপটু লেখক-জাতি আর কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদপ্রণেতা ঋষিগণ হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশুদ্ধ অলঙ্কারপ্রয়োগপটু। একা মহাভারতেই যে অলঙ্কারচ্ছটা আছে ইংলণ্ডের সমস্ত সাহিত্য একত্র করিলে তাহার তুলনীয় হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অলঙ্কার প্রয়োগ-শক্তি থাকিলেই যে শ্রেষ্ঠ কবি হয়, এমন নহে। কিন্তু যে সকল শক্তি থাকিলে কবি শ্রেষ্ঠকবি হয় কালিদাসের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না, প্রায় সকলই পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ইউরোপীয়েরা কালিদাসে বুঝিতে পারেন না, এবং মাক্ষমূলরের ন্যায় কেবল ঋগ্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কালিদাসকে কেবল "Mere prettinesses" দেখেন। যাঁহারা কালিদাসকে বুঝিতে পারেন তাঁহারা তাঁহাকে পৃথিবীর কোন কবির নিচেয় বসাইবেন না। তবে অন্যান্য গুণে অন্যান্য কবিগণ কেহ না কেহ কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারে, এমন কেহই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

---

* পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মধুসূদনের রচনায় বিশুদ্ধ অলঙ্কারেরও অভাব নাই।

অলঙ্কার বিবিধ প্রকার—তন্মধ্যে উপমা একজাতীয় অলঙ্কার। ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। কালিদাসের উপমা বিখ্যাত। এক্ষণকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশুদ্ধ, অলঙ্কারশূন্য শোভাহীন অবস্থা দেখিয়া কালিদাসের উপমার প্রতি বাঙ্গালি লেখক ও পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে। এজন্য আমরা দুই চারিটা উপমা কালিদাসের কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠককে উপহার দিব ইচ্ছা করিয়াছি। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকও তাহা পুনঃ পাঠ করিলে সুখী ভিন্ন অসুখী হইবেন না। দুই একটা উপমা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটা কথা বলিবারও আছে, এজন্য তাঁহাদিগকে এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা প্রথমতঃ "কুমারসম্ভব" হইতে উপমা সংগ্রহ করিব। কুমারসম্ভবের প্রায় আরম্ভেই এমন একটী উপমা আছে যে তাহা এখন "কথার কথা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"Familiar as household words"—লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের বর্ণনায় কবি হিম ছাড়িতে পারেন না, অথচ হিমটা ভাল জিনিষও নহে। কবি উপমা দ্বারা বুঝাইতেছেন যে শুধু হিমে হিমালয়ের গুণের লাঘব হইতেছে না।

> অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
> হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতং।
> একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

হিম অনন্ত রত্নের আকর সেই হিমালয়ের সৌভাগ্য হানি করে নাই, (কেন না) গুণসমূহেতে একমাত্র দোষ—চন্দ্রকিরণেতে কলঙ্কের ন্যায় ডুবিয়া থাকে।

এইখানে উপমা বুঝিবার সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া গেলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না। যে পাঠক সোজা বুঝেন তিনি এই উপমা পড়িয়া বলিবেন যে উপমাটা বড় লাগিল না। কৈ চন্দ্রের কিরণে কলঙ্ক ত ডুবিয়া যায় না—পূর্ণচন্দ্রেও আমরা মৃগাঙ্ক বেশ দেখিতে পাই। কিন্তু যিনি বুঝেন তিনি দেখিবেন যে এই মৃগাঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের শোভা বর্দ্ধন করে। চাঁদখানা আগাগোড়া সাদা হইলে তত শোভা হইত না। কলঙ্ক সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে

পড়িয়া, নিজে অসুন্দর হইয়াও সৌন্দর্য্যে পরিণত হয়, অসৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়—নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

কিন্তু এ উপমার আর এক প্রকার প্রতিবাদ হইতে পারে। সত্য সত্যই কি একটা দোষ গুণরাশিতে ডুবিয়া যায়? একজন ইংরেজি কবি ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিয়াছেন,

"In beauty faults conspicuous grow,
As smallest speck is seen on snow."

এখন কোন্ কথাটা ঠিক? "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" সত্বেও যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক, রামচন্দ্র নিরপরাধিনী পত্নী ত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ পরিচিত, William Pitt প্রভৃতি মদ্য-মাংসের শ্রাদ্ধ করিয়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের "গুণসন্নিপাতে" এক এক দোষ ডুবিয়া গিয়াছে। ইংরেজ কবির জয় আমরা গায়িতে পারিলাম না। কিন্তু একজন দেশী কবি এই উপমার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার আর উত্তর নাই বলিলেও হয়। প্রবাদ যে ঘটকর্পর কালিদাসের সমসাময়িক কবি। ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে কালিদাসের অবস্থা উত্তম ছিল। ডাক্তার ভাওদাজি প্রভৃতি বলেন তিনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। ঘটকর্পর দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে তিনি কালিদাসের তুল্য কবি, তবে তিনি দরিদ্র বলিয়া তাঁহার কবিতার আদর হয় না। তিনি এক কথায় কালিদাসের উপমার বড় সকরুণ প্রতিবাদ করিলেন।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীতি কবি বদ্ধভাবে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী॥

কথাটা বড় ঠিক্। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ঠিক হউক না হউক, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে বড় ঠিক। সর্ব্বগুণসম্পন্ন দরিদ্রের কোন দর নাই, আর সর্ব্বদোষসম্পন্ন ধনী ব্যক্তি অর্জ্জুনের রথধ্বজস্থিত কপির ন্যায় সমাজের চূড়ায় বসিয়া লাঙ্গুলাস্ফালন করিতেছে দেখা যায়।

কুমারের প্রথম সর্গে কবি প্রধানতঃ হিমালয়ের ও হিমালয়কন্যা উমার বর্ণনা করিয়াছেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন—ইহাই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়জয়, অর্থাৎ কামের ধ্বংস, এবং তপস্যার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিবে। তৃতীয়ে সেই কামের ধ্বংস বা ইন্দ্রিয়জয়। পঞ্চমে তপস্যা। ইন্দ্রিয়জয় ও তপস্যার ফলে সপ্তমে মোক্ষ, পরমাত্মার জীবাত্মার লয়, বা হরপার্ব্বতীর বিবাহ। প্রথম সর্গে সেই জীবাত্মার পরিচয়।* সচরাচর কালিদাসের কাব্যের উদ্দেশ্য আদর্শ প্রণয়ণ বা চরমোৎকর্ষের স্থষ্টি। জীবাত্মাকে পরিস্ফুট করিতে জড়প্রকৃতি এবং তাহাতে বদ্ধ জীবকে পরিস্ফুট করিতে হয়। হিমালয় এই জড়ের চরমাদর্শ এবং উমা এই বদ্ধ জীবের চরমাদর্শ। অতএব কালিদাস প্রথম সর্গে হিমালয় এবং উমার বর্ণন করিয়াছেন। এই উভয় বর্ণনার মধ্যে প্রভেদ এই দেখা যায় যে হিমালয় বর্ণনে উপমার প্রয়োগ বড় অল্প; উমার বর্ণনায় উপমার বড় আধিক্য। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। জড়ের যে সৌন্দর্য্য তাহা একজাতীয়, উপমার সাহায্য ব্যতীত কেবল বর্ণন মাত্রেই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু চৈতন্যবিশিষ্টের বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৌন্দর্য্য এত জটিল—এমন বহুজাতীয়, যে সহজে বাক্যে তাহা ধরা যায় না,—উপমার প্রয়োজন হয়। উমার বর্ণনা হইতে আমরা দুইটী উদাহরণের দ্বারা ইহা দেখাইতেছি। একটী মানসিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, আর একটী শারীরিক সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে।

উমাকে কালিদাস প্রকৃত মানবীস্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আর্য্য কন্যাকে সচরাচর লেখাপড়া শিখানর প্রথা ছিল; উমাকেও বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইল। কিন্তু উপদেশকালে মেধাবিনী উমা এমনি সহজে বিদ্যা লাভ করিলেন যে তাহা উপমার দ্বারা ভিন্ন বুঝান যায় না। কবি বলিতেছেন, যে উমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা যথাসময়ে আপনি আসিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। যেমন হংসগণ অন্য সময়ে যেখানেই থাকুক না

---

* জ্ঞানমার্গে মুক্তি লাভের রূপক হরপার্ব্বতীর উপন্যাস। ভক্তিমার্গে মুক্তিলাভের রূপক রাধাকৃষ্ণের উপন্যাস।

শরৎকালে গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইবেই; যেমন ওষধি সকলের প্রভা রাত্রি হইলে আপনিই সঞ্চারিত হয়, তেমনি উপদেশ কাল উপস্থিত হইলে বিদ্যা আসিয়া উমাকে প্রাপ্ত হইল,

তাং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ॥

শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উপমাটী আরও সুন্দর। উমার প্রথম যৌবন সঞ্চারের শোভা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্ন মিবারবিন্দং।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥

যেমন তুলিকার সম্বন্ধে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, যেমন অরবিন্দ সূর্য্য রশ্মির দ্বারা প্রোদ্ভিন্ন হয় তেমনি তাঁহার "সর্ব্বত্র ন্যূনাতিরেকশূন্য" দেহ নবযৌবনের দ্বারা উদ্ভিন্ন হইল।

চতুরস্রশোভি শব্দের প্রতিশব্দ দুর্ল্লভ। মল্লিনাথ অনুবাদ করিয়াছেন "ন্যূনাতিরেক শূন্য" আমরাও তাই রাখিলাম। ইংরেজি Symmetrical শব্দ কথাটা উহার নিকটে আইসে। কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্যাংশুভিন্ন অরবিন্দের চতুরস্র শোভা না মনে করিলে, ইহার অপরিমেয় সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। এই শব্দটী এখানে অমূল্য, আর উপমা দুটীও অমূল্য।

দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুর-পীড়িত দেবগণ স্বর্গের দ্বারে উপায় জন্য ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত। দেবগণ সম্মুখে বিধাতার রূপ প্রকাশ কালিদাস উপমার দ্বারা বুঝাইতেছেন।

তেষা মাবিরভূদ্ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াং।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব॥

অর্থাৎ পরিম্লানমুখশ্রী সেই দেবগণের সম্মুখে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন যেমন সুপ্তপদ্ম সরোবরের সম্মুখে প্রাতঃসূর্য্যের প্রকাশ হয়। এইস্থলে

উপমা বুঝাইবার জন্য কিছু বলিবার আছে। তাহা বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান লেখক প্রণীত কালিদাসের উপমা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপ্রচারিত একটি প্রবন্ধ হইতে প্রথমতঃ কিছু উদ্ধৃত করিব। যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"উপমা দ্বিবিধ। প্রথম সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে কেবল একটী বস্তুর সহিত আর একটী বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্র তুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

"দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটী বা ততোধিক পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয় সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি বিকীর্ণ করে, রাজা দশরথ তেমনি ধন বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই উপমার এক দিকে দশরথ ও ধন একটী বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট; দশরথ ধন ব্যয়কারী, ধন দশরথ কর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্য দিকে মেঘ ও জল সেই রূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘ কর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কল্পিত সম্বন্ধবশতই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধের যেরূপ সাদৃশ্য, যদি সম্বন্ধ বিশিষ্টেরও সেইরূপ সাদৃশ্য থাকে, সেই উপমাই সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উপরে তেষামাবিরভূৎ ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি ইহাতে এইরূপ সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপমা আছে। এখানে চারিটী বস্তু চারিটীর সঙ্গে তুলিত। (১) দেবতাদিগের মুখ ও সরোবরের পদ্ম, (২) দেবতাদিগের মুখের পরিম্লানাবস্থা এবং পদ্মগণের সুপ্তাবস্থা, (৩) ব্রহ্মা এবং প্রাতঃসূর্য্য, (৪) অপর দুইটী যুগ্মের সহিত শেষোক্ত যুগ্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ ম্লানাবস্থাপন্ন দেবগণের মুখের সঙ্গে এবং সুপ্তাবস্থাপন্ন পদ্মের সঙ্গে ব্রহ্মা ও প্রাতঃসূর্য্যের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ এই যে, উভয়েই প্রফুল্লতা সম্পাদন করে। অতএব সম্বন্ধের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ। কিন্তু সম্বন্ধবিশিষ্টেরও সাদৃশ্য তেমনি সম্পূর্ণ। কেন না দেবতাদিগের মুখ ও পদ্ম উভয়েই সুন্দর; পদ্মের সঙ্গে সুন্দর মুখের সাদৃশ্য এত সহজে অনুমেয় যে পদ্মমুখ ইতি উপমা চিরপ্রচলিত। পরে ম্লানমুখে এবং মুদিতপদ্মে সাদৃশ্যও বড় সুন্দর।

এবং শেষে তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মরূপে এবং তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যে তুলনাও অতি সুন্দর। অতএব এই উপমা সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—ঈদৃশ উপমা অতি দুর্ল্লভ। কিন্তু কালিদাসের এমনই শক্তি যে কেবল সুন্দর মুখের সহিত পদ্মের সাদৃশ্য এই প্রাচীন উপমা লইয়া তিনি অনেকবার এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন উপমা প্রযুক্ত করিয়াছেন। দুই একটা উদ্ধৃত করিতেছি।

মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন,

রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিবকমলান্যভ্যবর্ষণ্মুখানি ॥

যেখানে (অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে) গাণ্ডীবধন্বা (অর্জ্জুন) নিশিত শর নিকরের দ্বারা ভূপতিবর্গের মুখ সকল নিষিক্ত করিয়াছিলেন, বৃষ্টিধারার দ্বারা তুমি যেমন পদ্ম সকল নিষিক্ত কর।

এর একটী রঘুবংশ হইতে।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং
তববিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং।
নিশিসুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনং ॥

বায়ুবশে অলকাগুলি চালিত হইতেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরস্থিত ভ্রমরের গুঞ্জন রহিত, একটী পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

পুনশ্চ—

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাজ্ঞানামকালজলদোদয়ঃ ॥

অকালে উদিত মেঘ যেমন পদ্মের বালাতপ (রঞ্জন) সহিতে পারে না, তেমনই তিনি (রঘু) যবন রমণীগণের মুখ পদ্মের মধুমদ সহ্য করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ যেমন অকাল জলদ পদ্মকে রৌদ্রে রাঙ্গা হইতে দেয় না, রঘু ও যবনীদিগের মুখগুলিকে রঞ্জিত করিতে দেন নাই। স্বামীবধ দুঃখে তাহারা কাতর।

জগতের সকল বস্তুই উপমার বিষয় হইতে পারে, এবং এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন

বিষয়ের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কালিদাসের কখন কখন এমন আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাই, যে এক বস্তুর সঙ্গে যাহার তুলনা করিলেন সময়ান্তরে ঠিক তাহার বিপরীত প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিবেন; সাদৃশ্যও দেখাইবেন এবং তদুপলক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বের অবতারণা করিবেন। একটা উদাহরণ দিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে উমার যৌবনোদ্ভেদ চিত্রের সঙ্গে তুলিত করিয়া কালিদাস বড় সুস্পষ্ট করিলেন। বাল্যে যে সৌন্দর্য্য জীবন শূন্য ছিল চিত্রের তুলনায় তাহা জীবনময় হইয়া উঠিল। আবার নিম্নলিখিত কবিতায় দেখিব যে যাহা অত্যন্ত জীবনময়, তাহা অত্যন্ত নির্জীব করিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সেই চিত্রের সঙ্গেই তুলিত করিতেছেন। মহাদেব অরণ্য মধ্যে দেবদারুদ্রুমবেদিকায় তপস্যায় নিমগ্ন। তপোবিঘ্ন বিনাশার্থে নন্দী লতা-গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া আপনার বামপ্রকোষ্ঠে হেম-বেত্র রক্ষা করিয়া মুখে অঙ্গুলি মাত্র প্রদান করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা সকলের চাপল্য নিষেধ করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত তপোবন নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং।
তচ্ছাশনাৎ কাননমেবসর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥

গাছের পাতা নড়িতেছে না, ভ্রমর সকল লুকাইয়াছে, পক্ষী সকল নীরব, বনে আর মৃগ বিচরণ করে না, নন্দীর শাসনে সেই কানন সর্ব্বত্র চিত্রার্পিতবৎ নিস্তব্ধ। নীরব ও নির্জ্জনতার বর্ণনা এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কোলরিজ কৃত Ancient Mariner নামক কাব্যে বায়ুশূন্য সমুদ্রে গতিশূন্য অর্ণবযানের এইরূপ একটা বর্ণনা আছে, সেখানেও এইরূপ চিত্রের উপমা আছে—

Like a painted ship on a painted ocean!

কিন্তু কোলরিজের সে বর্ণনা কালিদাসের এ বর্ণনার কাছে তুলনীয় নহে। কালিদাস ও আর এক স্থানে (রঘুবংশে) নীরব ও নির্জ্জন বর্ণন করিয়াছেন, সেও অতি সুন্দর।

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কৃশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশা
অদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥

কিন্তু ইহাও পূর্ব্বোক্ত কবিতার তুলনীয় নহে।

আর স্থান নাই, এ জন্য আর বিস্তারিত টীকার সহিত উদাহরণ গুলি বুঝাইতে পারিতেছি না। এই কুমারের তৃতীয় সর্গে একটী শ্লোকে এমন কয়েকটী উপমা আছে যে বোধ হয়, আর কখন কোন কবি কর্ত্তৃক তাদৃশ উৎকৃষ্ট উপমা প্রযুক্ত হয় নাই। যোগস্থিত মহাদেবের বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা
ন্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং ॥

যোগস্থিত মহাদেব বৃষ্টি সংরম্ভশূন্য মেঘের সহিত, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের সহিত এবং বায়ু ও কম্পশূন্য প্রদীপের সহিত তুলিত হইলেন। কিন্তু উপমা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সাহায্যে পাঠক যেন এই কবিতাটীর বিচার করেন।

কালিদাসের উপমা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই এবং বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন পাঠকদিগের প্রাপ্যও নহে। অতএব সেই প্রবন্ধে উদ্ধৃত আর কয়েকটী উপমা আমারা অন্যান্য উপমার সহিত সঙ্কলিত করিলাম।

উমার বর্ণনা কালে—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্ক রাগং।
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

স্তনভরে (উমার) শরীর যেন ঈষৎ নত হইয়াছে। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকে নম্র ও নবপল্লবশালিনী লতা বায়ু ভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।

বসন্ত এবং মদনের কার্য্যে

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য

শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ—

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির ন্যায় মহাদেব ও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

পরে রতিবিলাপে—

কুসুমাং ত্বদধীনজীবিতাং

বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।

নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো

জলসংঘাতইবাসি বিদ্রুতঃ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ জলরাশি যেমন জলাধীন জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ ত্বদধীনজীবিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভগ্ন পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে?

কামসখ বসন্তকে রতি বলিতেছেন—

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে

স সখা দীপইবানিলাহতঃ।

অহমস্য দশেব পশ্যমা

মবিষহ্য ব্যসনেন ধূমিতাং॥

তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

রতির প্রতি অনুকুল আকাশবাণী হইল—

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং

রতিমাকাশভবাসরস্বতী।

সফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং

প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥

সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্না সফরীকে প্রথম জলধারা যেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করে, সেইরূপ দেহ ত্যাগে কৃতনিশ্চয় রতিকে আকাশবাণী অনুগৃহিত করিল।

উমা তপশ্চারণে অভিলাষিণী হইলে জননী মেনকা তাঁহাকে বিরত করিতেছেন—

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা
তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥

হে বৎসে গৃহেতেই মনোভীষ্ট দেবতা আছেন। তুমি তাঁহাদিগের আরাধনা কর।. কষ্টসাধ্য তপই বা কোথায় আর তোমার সুকোমল শরীরই বা কোথায়? কোমল শিরীষ কুসুম কেবল ভ্রমরেরই পদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর পারে না।

মেঘদূতে—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতংমে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়িসহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসুবালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম। কিন্তু দৈব নিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্ত্তী। সুতরাং সহচর চক্রবাক বিরহিত একাকিনী চক্রবাকী তুল্য সেই মিত-ভাষিণীকে আমার দ্বিতীয় জীবিত তুল্য জানিবে। আমি অনুমান করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠান্বিতা সেই সুকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এই সকল দিবস অতি-ক্রান্ত হইতে হইতেই হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় পূর্ব্বাকারের বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নূনং তস্যাঃ প্রবল রুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠং।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি॥

হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্ছ্বসিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাস বশতঃ বিবর্ণ অধরোষ্ঠ, সংস্কারাভাবে লম্বমান কুন্তলহেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতলবিন্যস্ত প্রিয়ার বদন, তোমারই অবরোধে ম্লানকান্তি চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছে।

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিত ভ্রূলতা বিভ্রমানাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলাস কৃষ্ণসারপ্রভানাং।
কুন্দক্ষেপানুগ মধুকর শ্রীমষামাত্ম বিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্দশ পুরবধূনেত্র কৌতুহলানাং॥

এই কবিতায় দশ-পুরবধূ দিগের উৎক্ষিপ্ত কটাক্ষের সহিত প্রক্ষিপ্ত কুন্দের অনুগামী মধুকরের তুলনা করা হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিতে যে উপমাকে লক্ষ্য করিয়া দেশী রুচি ও বিলাতি রুচির প্রভেদ দেখান গিয়াছে সে উপমা এই—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভির্কাননাম্রৈ
স্তয্যারূঢে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যেশ্যামঃ স্তন ইব ভুব শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

ঈশ্বরের গুপ্তের জীবনীতে ইহার তাৎপর্য্য বুঝান হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলা মাত্র শেষাং হিমাংশোঃ—

হে মেঘ! মানসিক যন্ত্রণায় কৃশাঙ্গী বিরহশয্যায় এক পার্শ্বে শায়িনী—সেই প্রিয়াকে পূর্ব্বদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমৃত শিশিরান্ জালমার্গ প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং॥

পূর্ব্ববৎ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শীতল চন্দ্ররশ্মির প্রতি গত, কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরগুরুপক্ষ্ম

দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, মেঘাচ্ছন্ন দিনে অবিকসিত অথচ অমুদিত স্থলনলিনীর অবস্থাপ্রাপ্ত তাঁহাকে দেখিবে।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা—
মীনক্ষোভাকুল কুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালকবশতঃ অপাঙ্গ প্রসরবিহীন, স্নিগ্ধাঞ্জনরহিত, মধুপানাভাবে ভ্রূবিলাসবর্জ্জিত, মৃগনয়নীর নয়ন তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে উপরিভাগে স্পন্দিত হইয়া মীনচলনবশতঃ চঞ্চল কমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

যে অলকানগরীতে মেঘ যাইবে সেই অলকানগরীর প্রাসাদ সমূহের সহিতই কবি মেঘের তুলনা করিতেছেন।

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং।
অন্তস্তোয়ং মনিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

মেঘে যেমন বিদ্যুৎ আছে অলকানগরীর প্রাসাদে তেমনই সুন্দরী রমণী আছে, মেঘে যেমন ইন্দ্রধনু, প্রাসাদ সকলে তেমনি চিত্রশ্রেনী, মেঘের যেমন স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন, প্রাসাদ সকলে তেমনি সঙ্গীতার্থবাদিত মৃদঙ্গ বাদ্য—মেঘের জল, প্রাসাদের মণি—মেঘ যেমন উচ্চ, প্রাসাদ সকল তেমনই মেঘস্পর্শী।

স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ের কোমলতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপমাটী সুন্দর—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

অর্থাৎ, কুসুম যেমন শুষ্ক হইলেও বোঁটায় আটক থাকে, স্ত্রীলোকদিগের কুসুমসুকুমার হৃদয়ও বিরহ দুঃখে সদ্যঃপাতী অর্থাৎ ভগ্নপ্রায় হইলেও আশাবৃন্তে বদ্ধ হইয়া থাকে—আশাকেই অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে।

[ক্রমশঃ।

সংসার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় মানুষের কথা।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণী বাবুর বাড়ীতে যাইলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর আছে, দু তিনটী ধানের গোলা আছে, একটী পূজার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজির বাবুর বাড়ীতে বড় ধূমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ গাওনা বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে, এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজির মশাই পূজার সময় বাড়ী আসেন, এবার কোনও আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণী বাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটী পাকা ঘর করিয়াছেন, এবং বাড়ীর পাশে কতকগুলি ইটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে শোবার ঘরটীও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটী তেলের বাতি জ্বলিতেছে, একটী বড় তক্তা-পোশের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণী বাবু বসিয়া ধূম সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪। ৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্প রহস্য করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণী বাবু তাহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটী মিষ্টালাপ করিয়া একটী ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর সুন্দর তিন চারি খানি চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর।

ঘরের ভিটিগুলি সুন্দররূপে লেপা. উঠান ঝাট দেওয়া ও পরিষ্কার, এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটী বড় রকম পুখুর, তাহার চারিদিকে বাগান, নারিকেল আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই শাশুড়ীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গৌরবর্ণ, স্থূল এবং কিছু খর্ব্ব হইলেও জমকাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তাবিজ ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য ও সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা দুই গাছি বালা, পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও গৌরবের শরীর খানি দেখিলে, তাঁহার আস্তে আস্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অল্প অল্প হাসিমাখা একটু একটু গৌরব ও দর্পমাখা কথা গুলি শুনিলে তাঁহাকে বড় মানুষের গৃহিণী বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি তারিণী বাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সাদা, তাঁহার কথা গুলিতে একটু একটু দর্প থাকিলেও হাস্যপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি বা ধন গৌরবের কথা শুনিতে ভাল বাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্লেশ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শাশুড়ী। "বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি এক দিনও আসতে নেই? বুড়ী আছে কি মরেছে বলে আর খবর নাও না?"

হেম। "না তা নয়, প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্ব্বদাই কায কর্ম্মে রত থাকিতে হয়।"

শাশুড়ী। "হ্যাঁ, এখন তাই বলবে বই কি? এই এত করে বিন্দুকে হাতে করে মানুষ করলুম, এত করে তার বিয়ে থা দিলুম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞেস করে না যে জেঠাই মা কেমন আছে।"

হেম। "সে সর্ব্বদাই আপনার তত্ত্ব লয়, আর এই উমাতারা আসিয়া অবধি একবার আসবে আসবে মনে কচ্চে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাহাকেই কর্ত্তে হয় আর ছেলেটীরও ব্যারাম, সেই জন্য আসতে পারে না। তা উমাতারা যদি একদিন আমাদের বাড়ী যায় তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে দুটীকেও দেখিয়া আসিতে পারে।

শাশুড়ী। "না বাপু, উমার যে ঘরে বে হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তারা ভারি বড় মানুষ,—ধনপুরে বনিয়াদী বড় মানুষ, ঐ যে আগে ধনেশ্বর বলে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারি বড় লোক, এ অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।"

হেম। "হাঁ তা আমি জানি।"

শাশুড়ী। "হ্যাঁ, জানবে বৈকি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া কর্ম্ম দান ধর্ম্ম সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটী মেয়ের বে হল বর্দ্ধমানে, ঐ ইনি যেখানে কর্ম্ম করেন, সেইখানে, তা বে-তে দশ হাজার টাকা খরচ কল্লে। তাদের কি আর টাকার গণাগুন্তি আছে। বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুরে দক্ষিণা পায় না এমন বামুনই নাই।"

হেম। "তা আমি জানি।"

শাশুড়ী। "তা,উমাকে কি শীগ্‌গির পাঠায়;—সেই পূজার সময় একবার করে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার এই ইনি ছুটি নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোক পাঠিয়ে হাঁটাহাঁটি করে তবে উমাকে পাঠিয়েছে, তাও বলে দিয়েছে ১৪ দিনের বাড়া যেন এক দিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, নিচু, এই সব আন্‌তে দিয়েছি, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড় ঘরে মেয়ের বে দিলে কিছু খরচ কর্‌তেই হয়।"

হেম। "তা হয়ই ত, তা ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীকে ছেলেদের নিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

শাশুড়ী। "হাঁ, তা আস্‌বে বৈ কি,বিন্দু আমার পেটের ছেলের মত, সে আসবে না? সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এস, আমাদের খোঁজ খবর নিও।"

হেম। "হাঁ তা আসবো বৈকি। এখন উমা আর আছে ক দিন?"

শাশুড়ী। "আর আছে কৈ? এই বর্দ্ধমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দেব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড় মানুষ কুটুম করেছি, কিছু না দিলে থুলে কি ভাল দেখায়?

আবার দেখ এই আস্‌ছে মাসে ষষ্ঠিবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। "তা বটেই ত।"

শাশুড়ী। "কাজেই যেমন কুটুম করেছি তেমনি তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মান সম্ভ্রম আছে, কুটুমেরাও জানে আমরা বিষয়ী লোক, কাজেই কিছু দিয়ে থুয়ে তত্ত্ব না করিলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটি ভাল আছে?"

হেম "না, খোকার ৫।৭ দিন থেকে একটু রাত্রিতে গা গরম হয়, তা আমি কাল কাট্‌ওয়া থেকে অষুদ এনে খাওয়াচ্ছি, আজ একটু ভাল আছে।"

শাশুড়ী। "বেশ করেছ। বাছা, বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হত। আহা সেদিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে মুখটী খুলে কখনও কিছু চায় নি, আমি যতক্ষণ না ডেকে তাকে ভাত খাওয়াতুম ততক্ষণ সে মুখটী খুলে একবার বলতো না যে জেঠাই মা, ক্ষিদে পেয়েছে। জেঠাই মা তার প্রাণ; তার বাপ মরে অবধি তার মার আর মন স্থির ছিল না, সুতরাং বিন্দুকে আর সুধাকে আমি যতক্ষণে খাওয়াতুম ততক্ষণ খেত, যতক্ষণ পরাতুম, ততক্ষণ পরিত। আমার উমাতারা যে বিন্দুও সে, আহা বেঁচে থাকুক, আর এক একবার আসতে বলো।"

হেম। "হাঁ, আসবে বৈ কি।"

শাশুড়ী। "এই পূজার সময় বিন্দু এল, আবার সেই দিনই চলে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কায কর্ম্ম ক'রবে। আর কায কর্ম্মও ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করিতে, বুঝলে কি না, এই ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর কি ভদ্র সকলেই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে আস বাইরে থেকে চলে যাও, ঘরের কায ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চড়ে আর বেলা তিনটে পর্য্যন্ত উনুনের জাল নেবে না তবু ত কুলিয়ে উঠতে পারি নে। লোকই কত, খাওয়া দাওয়াই কত, তার কি সীমা পরিসীমা আছে?"

হেম। "তা আর আমি দেখিনি, প্রতি বছরই দেখিতেছি, আপনার বাড়ীতে পূজার ধূমধাম এ সকলেই জানে।"

শাশুড়ী। "তা কি জান বাপু, বংশানুগত ক্রিয়া কর্ম্মটা উনি না করিলে নয়। তবে যদি টাকা না থাকিত সে আলাদা কথা। এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না। তবে আমাদের পুরুষানুক্রম থেকে এটা আছে, মল্লিক-দের বাড়ীর একটা নাম আছে, এঁর চাকুরিও আছে, কাজেই আমাদের না করিলে নয়, এই জন্য করা।"

হেম। "তা বটেইত।"

কতক্ষণ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিক বাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুরের ধনেশ্বরের বংশেব গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেই দিন সায়ং-কালে শুনিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে ক্ষণেক পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটী একটু একটু মুদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই "তা বটেই ত," "তা বৈকি" ইত্যাদি শাশুড়ীর সন্তোষজনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূ, ষোড়শবর্ষীয়া, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা, রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোনার মত, এবং তাহার উপর সুবর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় সুন্দর চিক্কণ কালো চুলের কি সুন্দর চিক্কণ খোঁপা, তার উপর কপালে জড়ওয়া সিঁতির কি বাহার হইয়াছে, খোঁপায় সোনার ফুল, সোনার প্রজাপতি আর একটী হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈচা, যবদানা, মরদানা, আর জড়োয়া বালা, বাহুতে জড়ওয়ার তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠঝাঁপা দুলিতেছে, কটিদেশে চন্দ্রবিনিন্দিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বুকে সখের সাতনর মুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা

ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"ইস্ আজ কি ভাগ্গি, না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি!"

হেমচন্দ্র। "আমার ভাগ্য বল; ভাগ্য না হইলে কি তোমাদের মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়।"

উমা। "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা নৈলে আর এই দশ দিন এখানে এসেছি একবারও দেখা কত্তে আস না? তা যা হোক্ ভাল আছ ত? বিন্দু দিদি ভাল আছে?"

হেম। "সে ভাল আছে। তুমি ভাল আছ?"

উমা। "আছি যেমন রেখেচ, তবু জিজ্ঞাসা করিলে এই ঢের। তা আজ এখানে আমাদের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ রাগ করিবেন না ত?"

হেম। "তোমার বিন্দুদিদি আপনি আস্তে পারলে বাঁচে, সে আর ছেড়ে দেবে না। সে এই কতদিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্য আসবে আসবে কচ্চে। তা কাল পরশুর মধ্যে একদিন আসিবে।"

উমা। "তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবে ত?"

হেম। "আচ্ছা কালই আসিবে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে অতিশয় উৎসুক, তুমি শ্বশুরবাড়ী থাকিলে সর্ব্বদাই তোমার মার কাছে তোমার খবর জেনে পাঠায়।"

উমা। "তা আমি জানি। বিন্দুদিদি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল বাসে, ছেলে বেলা আমরা দুইজনে একত্রে খেলা করিতাম, আমাকে এক দণ্ড না দেখে থাকতে পারিত না। ছেলেবেলা মনে করিতাম বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল একত্র থাকিব, প্রত্যহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেদুটীকেও পাঠিয়ে দিবে?"

হেম। "দিব বৈ কি, অবশ্য দিব।"

উমাতারা অতিশয় অহ্লাদিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে উমার পিতার ধনলিপ্সায়, মাতার ধন গৌরবে, শ্বশুরবাড়ীর বড়মানুষী চালে, উমার বাল্যহৃদয়, বাল্য ভালবাসা একেবারে বিলুপ্ত করে নাই, সে এখনও

বাল্যকালের সৌহৃদ্য কখন কখন মনে করিত, বাল্যকালের সুহৃদকে একটু স্নেহ করিত। ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূর অপূর্ব্ব রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরকমুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম,—এগুলি দেখিলেই আমাদিগের একটু ভয় সঞ্চার হয়,—এক্ষণে যাহা হউক তাহার হৃদয়ের একটী সদ্গুণ দেখিয়াও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম;—আর এই সামান্য সদ্গুণটী জগৎসংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর উমা বলিলেন,

"তবে এখন একবার উঠ, অনুগ্রহ করে যখন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জলখাবার তৈয়ের হয়েছে।"

উমা ঝম্ ঝম্ করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবারঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্মুখে দুটী সমাদান জ্বলিতেছে, রুপার থালে খানকত লুচি আর নানা রূপ মিষ্টান্ন,চারিদিকে রুপার বাটীতে নানা রকম ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ ক্ষীর, যেন পূর্ণ চন্দ্রের চারিদিকে কত নক্ষত্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আযোজন, এরূপ খাবার দাবার সহসা ঘটে না, এই রৌপ্য সামগ্রীব মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সংসারিক খরচ চলিয়া যায়!

উমাতারা আবার, বলিলেন "তবে খেতে বস, আমাদের গরিবদের যথা সাধ্য কিছু করেছি, ত্রুটী হইযা থাকিলে কিছু মনে করিও না।"

শ্যালীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন। যে বৎসব বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল তাহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা অতিশয় গৌরবর্ণা ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন দুটী সুন্দর ও মুখের শ্রী অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে, হেমচন্দ্র নিরপক্ষ সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামে সকলে বলিত বিন্দু কালো মেয়ে. উমা সুন্দরী এবং সেই সৌন্দর্য্য গুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুরের জমিদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণী বাবু এত ধনবান সম্বন্ধ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতেন,

তারিণী বাবুর মহিষী ও ধনপুরের দাসীর নিকট গঞ্জনা সহিতেন; কিন্তু বড় মনুষের কাছে লাথী ঝেঁটাও সয়, গরিবের একটী কথা সয় না।

তারিণী বাবু বড় কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মান সম্ভ্রম বাড়িল; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটী গঞ্জনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অন্য সুখ তত হইয়াছিল কি না জানি না, যদি এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপুরের জমিদার পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয় তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি বয়সের সহিত সেই জমিদার পুত্রের রূপলালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড় মানুষেব কথায় আমাদের এখন কায নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি।

উমার শ্বশুর বাড়ীতে অন্য কষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে কখন কখন কথা সহিতে হইত, শাশুড়ীর ঘৃণা, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গঞ্জনা। কিন্তু গা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয় অনেক কষ্ট সয়, মুক্তাহার ও জড়ওয়া দেখিলে বোধ হয় হৃদয়জাত অনেক দুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, সুবর্ণ রৌপ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়ওয়া চক্ষে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিন্য ও অন্ধকার কতদূর দূর হয় বিজ্ঞবর পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অবধি উমাতারার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে এবং অনেক বার উমাতারার সেই সুবর্ণ-মণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্দিগ্ধমনা হইলেন। তাঁহার বোধ যেন সেই হীরকমণ্ডিত সুন্দর ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্য-বিস্ফারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটী কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া? না সেই সমাদানের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন সেই যৌবনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিষয় কর্ম্মের কথা।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন তারিণী বাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন,—সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র নহে, সে একটী পুরাতন তমস্থক। তারিণী বাবুর কপালে দুই একটী বয়সের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর ক্ষীণ, বর্ণ গৌর, চক্ষু দুটী ছোট ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েকটী চুল পাকিয়াছে। তারিণী বাবুর আকারে বা আচরণে কিছু মাত্র বাহ্যাড়ম্বর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাঁহারা বিষয় সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সে গুলি বড় থাকে না, যাঁহারা ভোগ করেন বা উড়াইয়া দেন তাঁহাদেরই সে গুলি ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণী বাবু কাগজ রাখিলেন, ধীরে ধীরে চসমাটী খুলিয়া রাখিলেন, পরে নম্র ধীর বচনে বলিলেন "এস বাবা, বস।" হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্যান্য কথার পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণী বাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। "অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী আসিয়াছেন আপনাকে দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া বড় সুখী হইলাম, যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

তারিণী। "হাঁ তা বল না, তার আবার অনুমতি কি বাবা, যা বলিবে বল, আমি শুনিতেছি।"

হেম। "আমার শ্বশুর মহাশয় যে সামান্য একটু জমী চাষ করাইতেন তাহারই কথা বলিতেছি।"

তারিণী। "বল।"

হেম। "সে জমীটুকু আমার শ্বশুর মহাশয় আজীবন দখল করিতেন ও

চাষ করাইতেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আজীবন চাষ করাইতেন তাহা অবশ্যই আপনি জানেন।"

তারিণী। "জানি বৈ কি। এবং হরিদাসের পিতার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা সেই জমি চাষ করাইতেন, তিনি আমারও পিতামহ হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হইলে আমার পিতাই সমস্ত জমীই চাষ করাইতেন, হরিদাসের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিষয় বুদ্ধি বড় ছিল না, এই জন্য পিতামহ আমার পিতাকেই সমস্ত সম্পত্তি দেখিতে শুনিতে বলিয়া যান। পরে আমার জেঠা হরিদাসের পিতা, পৃথক হইয়া গেলে তাঁহার জীবন যাপনের জন্য আমার পিতা তাঁহাকে কএক বিঘা জমী চাষ করিতে দিয়াছিলেন মাত্র। হরিদাসও আজীবন সেই জমী টুকু চাষ করিয়া আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদিগের সম্পত্তি এজমালি। এ সকল কথা বোধ হয় তুমি জান না, কেমন করেই বা জানিবে, তুমি সে দিনের ছেলে, আর ছেলেবেলা ত গ্রামে বড় থাকিতে না, বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় লেখা পড়া করিতে।"

হেমচন্দ্র এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি এজমালি তাহা এই নূতন শুনিলেন! তারিণী বাবুর এই নূতন সুন্দর তর্কটী শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অদ্য তিনি তর্ক খণ্ডন করিতে আইসেন নাই, আপস করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং হাসি সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন; "পূর্ব্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক অধিক জানেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই মাত্র বলিতেছিলাম যে শ্বশুর মহাশয় যে জমী আজীবন কার্য পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার অনাথা কন্যা কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে কি?"

তারিণী। "আহা! বাছা বিন্দু এ বয়সেই পিতা মাতা হারা হইয়া অনাথা হইয়াছে তাহা ভাবিলে বুক ফেটে যায়! আহা! আজ যদি হরিদাস থাকিত, এমন সোণার চাঁদ মেয়েকে নিয়া, এমন সচ্চরিত্র সোণার জামাইকে লইয়া ঘর করিতে পারিত, তাহা হইলে কি এত গণ্ডগোল হইত, এত খরচা করিয়া আমাকে তাহার কর্ষিত জমীটুকু রক্ষা করিতে হইত? তবে ভগবানের ইচ্ছা। হরিদাস গিয়াছেন, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন করিতে

হইল; এজমালি জমীর যে অংশটুকু তিনি চাষ করাইতেন তাহা পুনরায় অন্যান্য জমীর সহিত আমাকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছে। তাঁহাতে আমার লাভ বিশেষ নাই, সেই জমীটুকু রক্ষার জন্য তাহার মূল্য অপেক্ষা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি করি পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমীদার অন্যকে দেয় তাহা ত আর চক্ষুতে দেখা যায় না।"

হেম। "তবে শ্বশুর মহাশয়ের জমী হইতে কি তাহার কন্যা কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

তারিণী। "প্রত্যাশা আবার কি বল; আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের সব কথা, একটু ভাঙ্গিয়া না বলিলে, কি বুঝিয়া উঠিতে পারি? বিন্দু আমাদের ঘরের ছেলে, আমার উমা যে বিন্দু সে, যত দিন আমার ঘরে এক কুনকে চাল আছে তত দিন বিন্দু ও উমা আহার সমান ভাগ করে খাবে। তাহাতে আবার জমীর অংশই কি প্রত্যাশাই কি?"

হেমচন্দ্র দেখিলেন তারিণী বাবুর সঙ্গে পেরে উঠা ভার, তারিণী বাবুর সুন্দর তর্ক তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বৃথা চেষ্টা করিয়া, অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা করিয়া অবশেষে কহিলেন, "মহাশয় যদি অনুমতি দেন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটী কথা বলি।"

তারিণী। "বল না বাবা এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় আবার রাগ?"

হেম। "আপনি বোধ হয় জানেন যে শ্বশুর মহাশয় যে জমী আজীবনকাল পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা যে এজমালি সম্পত্তি তাহা আমরা স্বীকার করি না।"

তারিণী। "তোমরা স্বীকার করবে কেন? তোমরা কালেজের ছেলে, ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করিবে? এখন কালেজের ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকিতে পারে না, শুনেছি মায়ে পোয়ে এজমালীতে থাকিতে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝিনা, আমরা এজমালিতে থাকতে ভালবাসি, বাপ পিতামহ যা করে গিয়েছেন তাই করিতে ভালবাসি। আহা, থাকতো আমার হরিদাস সে জানিত এ জমি মল্লিক বংশের এজমালি

সম্পত্তি কি না, তোমরা সে দিনকার ছেলে তোমরা কি জানবে বল?”

হেম। “তা যাহাই হউক, আমরা এজমালি বলিয়া স্বীকার করি না, তাহা আপনি জানেন। আর এজমালিই হউক আর নাই হউক, সে সম্পত্তির একটু অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। আমার শ্বশুর মহাশয় যে জমীটুকু চাষ করিতেন এক্ষণে আমার স্ত্রীর পক্ষে আমি যদি সেই জমীটুকু পৃথক রূপ চাষ করিতে চাহি তাহাতে কি আপনি সম্মত আছেন?”

তারিণী বাবু কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন “ছি বাবা, তুমি স্বভাবত বুদ্ধিমান ছেলে, লেখা পড়া শিখিয়াছ. এমন নির্ব্বুদ্ধির কথা কেন? মল্লিক বংশের বংশানুগত এজমালি জমী কি পৃথক করা যায়? তাহাই যদি পারিতাম তবে সেই জমীটুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করিয়া আমার হাতেই রাখিলাম কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুনিতে পারি; অসঙ্গত কথা শুনিব কেমন করিয়া? “ওরে হরে! আর এক ছিলুম তামাক দিয়ে যা রাত হইয়াছে, আর এক ছিলুম তমাক খেয়ে শুতে যাই, কাল রাত্রিতেও গ্রীষ্মে বড় ঘুম হয় নাই, গাটা বড় ঘুম্ ঘুম্ করচে” ইত্যাদি।

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমী তারিণী বাবুর ন্যায় বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া আসিয়াছেন সেটী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেনঃ—

“আপনার যদি শয়নের সময় হইয়া থাকে তবে আমি আর আপনাকে বসাইয়া রাখিব না. তবে আর একটী কথা আছে যদি আজ্ঞা করেন তবে নিবেদন করি”।

তারিণী। “না না তাড়াতাড়ি উঠিও না; অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম চক্ষু জুড়াইল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা এখনই আমি শুইতে যাইব না, বিলম্ব আছে, কি বলিতেছিলে বল।”

হেম। “আপনি সে জমী টুকু ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিবেন তাহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে সেই জমীর জন্য আমরা কিছু কি প্রত্যাশা

করিতে পারি? এ বিষয়ে মকদ্দমা করাতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা কোনও মতে আপসে এ বিষয়টা মিমাংসা হয় তাহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি আদালতে যাইতে হয়, তবে জমী এজমালী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না এবং হইলেও আমরা এক অংশ পাইব কি না, বিবেচনা করিয়া দেখুন; কিন্তু আপসে নিষ্পত্তি হইলে আদালতে যাইতে আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা।"

হেমচন্দ্র উগ্রস্বভাব লোক সহসা আদালতে যাইতে পারেন, তিনি সেই জন্য সম্প্রতি উকিলদিগেব পরামর্শ লইতেছেন, এ কথাগুলি তারিণী বাবু জানিতেন। আদালতে যদি হেমচন্দ্র মকদ্দমার ব্যয় বহন করিতে পারেন তবে শেষে কি ফল হইবে তাহাও তারিণী বাবু কতক কতক অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপসের কথায় বড় অসম্মত ছিলেন না। যৎকিঞ্চিৎ টাকা দিয়া হরিদাসের সত্ব একেবারে ক্রয় করিয়া লইবেন এরূপ মত পুর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বড় অল্প। বলিলেন,

"দেখ বাপু, যদি আদালত করিতে ইচ্ছা কর তবে অগত্যা আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে, আদালতের বিস্তর খরচ, কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার্থ আমি বোধ হয় বহন করিতে পারিব, তুমি বহিতে পারিবে কি না, তুমিই ভাল জান। আর যদি সে কথা ছাড়িয়া দিয়া সত্যই আপসের কথা বল, তবে বিন্দুকে হাত তুলিয়া কিছু দিব তাহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে? আমরা মূর্খ মানুষ, তোমাদের ন্যায় আইন কানুন দেখি নাই, কিন্তু বর্দ্ধমানে চাকুরি করিয়া আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, মকদ্দমাও বিস্তর দেখিয়াছি। মকদ্দমা করিয়া যে মল্লিক বংশের এজমালি সম্পত্তির এক অংশ ছাড়াইয়া লইতে পারিবে এমন বোধ হয় না, ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিয়া দেখ। কিন্তু যদি সত্য সত্যই সে বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, যদি তোমাদের কালেজের ইংরাজী শিক্ষায় আত্মীয় সজনের সহিত বিবাদ করিতে না শিখাইয়া থাকে, যদি বুড়ো সুড়ো লোককে একটু শ্রদ্ধা করিয়া, তাহাদের একটু বশ হইয়া চলিতে শিখাইয়া থাকে, তবে সঙ্গত কথা বল, তাহাতে আমার কখনই অমত হইবে না। দেখ বাপু, আমি এক কথার মানুষ, ঘোর ফের বড় বুঝি ওনি ভালও বাসিনি, এক কথাই ভাল বাসি। যদি ৩০০ খানি

টাকা নিয়া এই জমীটুকুর সত্ব একেবারে ছাড়িয়া দাও তবে আমি সম্মত আছি। আমরা সামান্য বেতনের চাকুরি করি, ৩০০ টাকা করিতে অনেক মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, টাকা বড় যত্নের ধন। তবে বিন্দু আমার ঘরের মেয়ে, তাকে হাতে করে মানুষ করেছি, তার বিয়ে দিয়েছি, তাকে টাকা দিব তাহাতে আর কথা কিসের? আমিই ত বিন্দুর বিয়ে দিয়েছি. না হয় আর একখানি ভাল গহনা দিলাম, তাতেও ত দুই তিন শত টাকা লাগিত। তা দেখ বাপু, বুড়োর এ কথায় যদি মত হয় ত দেখ, আর যদি মত না হয়, তোমরা ভাল লেখাপড়া শিখেছ, যেটা ভাল মনে হয় কর।”

হেম। “মহাশয় ৩০০ টাকা বড়ই অল্প বোধ হয়। সে জমীতে বৎসরে প্রায় ২০০ টাকার ধান হয়।”

তারিণী। “তাহার মধ্যে বিচ খরচ, জন খরচ, জমিদারের খাজনা, পথকর, বাজে খরচ ইত্যাদি দিয়া সালিয়ানা কত থাকে তাহা কি হিসাব করা হইয়াছে?”

হেম। “অল্পই থাকে বটে।”

তারিণী। “সে জমীটুকু রক্ষার্থ কত আমাকে খরচ করিতে হইয়াছে তাহা কি জানা আছে?”

হেম। “আজ্ঞে না, তা জানি নি।”

তারিণী। “তবে আর অল্প মূল্য হইল কি অধিক হইল তাহা কিরূপে বুঝিবে? দেখ বাপু, এ বিষয়ে আর তর্ক অনাবশ্যক, আমি এক কথার মানুষ ইহার উর্দ্ধ দিতে পারিব না। যদি ৩০১ টাকা চাহ তাহা দিতে পারিব না। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যদি মত না হয় অন্য পথ অবলম্বন কর।”

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। এরূপ মূল্য পাইয়া জমী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ হইল; কিন্তু বিন্দুর সৎ পরামর্শ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

“মহাশয় যাহা দিলেন তাহাই অনুগ্রহ, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম।”

তারিণী বাবুর স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখখানি সম্প্রতি কিছু রুক্ষ হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার কথা হইতেই আমরা তাহা কিছু কিছু বুঝিয়াছি; কিন্তু

এক্ষণে সে মুখকান্তি সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্নতা লাভ করিল। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন,

"তা বাবা, তুমি যে সম্মত হইবে তাহা ত জানাই আছে। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে কি আজ কাল আর দেখা যায়? কর্ত্তা দেখে শুনে তোমার সঙ্গে আমার বিন্দুর বিবাহ দিয়াছি, আমি কি না জেনে শুনেই কায করেছি? আর তুমি কালেজে লেখা পড়া শিখেছ, কালেজের ছেলে ভাল হইবে না কি আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ভাল হবে? আজ তোমাকে দেখে যে কত আহ্লাদিত হইলাম তা আর তোমার সাক্ষাতে কি বলিব? আর দুটা পান খাও না।" "অরে হরে! বাড়ীর ভিতর থেকে দুটো পান এনে দেত।"

হেম। "আজ্ঞে না, আপনার ঘুমের সময় হইয়াছে আর বসব না।"

তারিণী। "কোথায় ঘুমের সময়? আমি দুই প্রহর রাত্রের পূর্ব্বে ঘুমাইতে যাই না। আবার কাল রাত্রিতে খুব ঘুম হইয়াছিল আজ একবারেই ঘুম পাইতেছে না।"

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

তারিণী। "আর তুমি এত দিনের পর এলে, তোমাকে ফেলে ঘুম! দুটা কথাই কই। আর দেখ বাবু এই টাকাটা লইয়া একটা দলীল লিখিয়া দিলেই ভাল হয়। তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের কথাই দলীল, তবে কি জান একটা প্রথা আছে, সেটা অবলম্বন করিলেই ভাল হয়।"

হেম।"অবশ্য; যখন কোন কায করা যায়, নিয়ম অনুসারে করাই ভাল।"

তারিণী। "তাত বটেই, তোমরা ইংরাজী শিখিয়াছ তোমাদের কি আর এসব কথা বলিতে হয়। আর তোমরা যখন দলীল দিচ্ছ, বিন্দু যখন সুই করিবে, আর তুমি যখন তাহাতেই সাক্ষী হইবে তখন রেজিষ্টরি করা বাহুল্য মাত্র। তবে একটা রীতি আছে।"

হেম। "অবশ্য আমি সাক্ষী হইব এবং দলীল রেজেষ্টরী হইবে; এরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই হইবে।"

তারিণী। "তা বৈকি, তা কি তোমার মত ছেলেকে কি আর বুঝতে হয়? আর একটা কি জান দলীলের ষ্টাম্প খরচা আছে, রেজিষ্টরী আপিসে যাইতে গাড়ীভাড়া আছে, শেনাক্ত করে সাক্ষীর খরচা আছে, রেজেষ্টরী ফি আছে,

এ কাযটা যে ৮। ১০ টাকার কমে সম্পাদন হয় বোধ হয় না। তা বিন্দু আমার ঘরের ছেলে সে টাকা আর বিন্দুর কাছে লইতাম না তবে কি জান, এই ৩০০৲ টাকা দিতেই আমার ভারি কষ্ট হইবে, আর যে একটী পয়সা দিতে পারি আমার এমন বোধ হয় না।”

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে করিলেন “তারিণী বাবু যাত্রায় এক রাত্রিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়!” প্রকাশ্যে বলিলেন “আজ্ঞে আচ্ছা, তাহাও দিতে আমি সম্মত হইলাম।”

তারিণী। “তা হবে বৈ কি, তোমার ন্যায় সুবোধ ছেলেকে কি আর এ সব কথা বলিতে হয়?”

আরও অনেকক্ষণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণীবাবু একটী একটী করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয় বুদ্ধি হীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণীবাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে সত্বর বর্দ্ধমানে একটী চাকুরী করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে একজন ধনী জ্ঞানী মানী দেশের বড়লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও শ্বশুর মহাশয়ের ভদ্রাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয় তারিণীবাবু ও হেমচন্দ্রের এই পরস্পরের প্রচুর মিষ্টালাপ ও স্তুতিবাদ তাঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃতভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “শাইলককে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায় কিন্তু ধনী মানী বিষয়ী বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী তারিণীবাবুর পণ বিচলিত হয় না।” তারিণীবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন “আজকাল কালেজের ছেলে-গুলকি হারামজাদা; আর এই হেমই বা কি গোঁয়ার; বলে কি না জাঠ-শ্বশুরের সঙ্গে মকর্দ্দমা করিবে! বলিতেও লজ্জা বোধ হয় না। শীঘ্র অধঃপতনে যাবে।” গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি ধনবান কুটুম্বের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র।

আমরা এপর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণু জ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। * তাঁহাকেও এপর্য্যন্ত মনুষ্য শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখন তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও দেখি। এপর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন, যে এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, যে এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল না। কেন না নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধ বধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধের রথ খানা লইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ম্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র

* কোথাও কোথাও কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ নামক প্রাচীন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত তাহাও দেখিয়াছি। এ সকল স্থলে ঋষির অর্থ কি? নরনারায়ণ একটা রূপক নহে কি?

গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আব কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আব কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবাব বেলা হইল!

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থির-সঙ্কল্প হইলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ কবিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসাবে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না!

এই ব্রহ্মার আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি, যে এইগুলি, আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া বাখা ইহাব উদ্দেশ্য। আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র, দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাবটা পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে "ধর্ম্মরক্ষার" জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও দেখি, কোথাও কিছু নাই, খানখা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো!" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন, ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না, যে তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম, যে ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই

ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম, যে এই সময়ে কৃষ্ণ কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের সম্ভাব্বিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জবাসন্ধকে বধ কবেন নাই,—সর্ব্বলোক সমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিযাছিলেন। সে কার্য্যেব প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাঁহাব কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্ত্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আবোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মবণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণেব সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধ বধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আব তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগেব এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনেব অনুবর্ত্তী হইবার আব কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে জরাসন্ধ বধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্ব সূচনা পরবর্ত্তী কবি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণেব ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপব নির্ভব করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, যে এই জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে তাহার আব এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধ জনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারত-কার কি বলিতেছেন, শুনুন।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে

বহুদিবস তপোঽনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।"

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তারে বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারত প্রণেতা অদ্ভুত রসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,

"মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্ম্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণ সমীপে গদা পতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।"

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে, যে বর্ত্তমান জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিগে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধ বধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।" "চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।" (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দ্দশ দিবসে "বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে: অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভারতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্ত্তব্য নহে)। ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। তাই তখন বলিয়াছিলাম, ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান দ্বিপাদ মাত্র।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধ বধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না— পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।”

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, “রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।”

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতিপদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপাল বধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

সীতারাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণীপ্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন, যে তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রি দিন রমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম, আর তত রমার দিগে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল, যে মুসলমানের, সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলেই সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া মাথা খোঁড়া,—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখন ইল্‌সে গুড়ুনি, কখনও কাল বৈশাখী, কখন কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণের অপেক্ষাও শোভাময়ী জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরি-

পূর্ণ, দলে দলে শিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য, শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারে খারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি! এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার সম্মুখেই রমা দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

পাঠক দেখিয়াছেন, সীতারাম নন্দার অপেক্ষা রমাকেই ভাল বাসিতেন। বলা বাহুল্য রমার এই বিরক্তিকর আচরণে রমা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রী স্মরণ-পাটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এ জন্য সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব।" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক স্নেহই তাহার মূল। পাছে স্বামীর কোন বিপদ ঘটে এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা! স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুর রাজ্য

সুসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখানা জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে, এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমত নহে। নন্দাও তাহার সহায়—কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি। তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদ সেবায় নিযুক্তা। লক্ষ্মী নারায়ণ জিউর মন্দিরে ফকির যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নন্দা তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিলেন। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা. সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত! "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার!"—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে "ভালবাসা," স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী, দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা

স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য. নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে সম্পদে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই, তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য।, তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটু খানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটু খানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। তাই নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে —অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? মিলিবে বৈ কি? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন, এসো, আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জালা জুড়ায়? আমার জালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণী সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাতে অতি দূরে নীল মেঘের মত নীলগিরির * শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকত মধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্তমাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুবরূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎস রসরূপধারিণী যমপ্রসূতী ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা লুলিতকেশা নগ্নবেশা খণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাতে বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চচূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন। অতিদূরে উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশ প্রান্তে শয়ান। † এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল,—"হায়! এই ত বৈতরণী! পার হইলে আমার জালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে—
যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—
আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।

---

* বালেশ্বর জেলার উত্তর ভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরিণী তীর হইতে দেখা যায়।

† পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বামে থাকে। নিকট নহে।

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল এক ভৈরবী।

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই ভৈরবী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে না ও পারে?"

ভৈরবী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

ভৈরবী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ওপারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া, বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

ভৈরবী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

ভৈরবীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই—বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। ভৈরবীও সেই রকম উত্তর দিল "তুফানের ভয় কর মা! কেন তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

ভৈরবী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরিণী তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই নাকি পারের কাণ্ডারী।

ভৈরবী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে যুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রে যাত্রার দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

ভৈরবী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুই বার পারে কাজ নাই। একবারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে।

ভৈরবী। সে কথাটা না হয় তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয় তাহাই করিও। বৈতরণীত তোমার ভয়ে পলাইবে না। কেমন আমার সঙ্গে আসিবে কি?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই। শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ভৈরবীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল,

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

ভৈরবী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না—বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

ভৈরবী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স—তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি—

ভৈরবী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—যসা ফানুষের ভিতর, আলোর মত রূপের আগুণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে ভৈরবী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসার-ত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি ভৈরবী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে, বিল্বপত্রের সঙ্গে পোকার মত বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে? বলিবে কি যে উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে?

ভৈরবী হাসিল—ফুল্লাধরে সে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রী ভাবিল "পুরুষ থাকিলে ভাবিত—এ ভৈরবীই বটে!"

ভৈরবী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? আমি ভৈরবী হইবার কে?"

ভৈরবী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। আর তুমি যখন সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি? কিন্তু এখন সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই ছদ্মবেশ স্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

ভৈরবী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

ভৈরবী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলাতে কখন তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া, বাঁধিয়া দিই।

ভৈরবী। জন্মান্তরে হইবে,—যদি মানব দেহ পাই। এখন তোমায় ভৈরবী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখাইলেই কি সাজ হইবে?

ভৈরবী। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।"

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী ভৈরবী শ্রীকে আর এক রূপসী ভৈরবী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি রক্ত চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবনবিজয়াভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুইজনে যাত্রা করিয়া বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেব মন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতো * জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও ভৈরবী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি "সঞ্চারিণী দীপশিখা" দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশ-বাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তিপারা?" কেহ বলিল, "সে মানে দ্যাবতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল। একজন পণ্ডিত, তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না; ইহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামীদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব নিশ্চয়ই ইহারা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজেই যাইতেছেন। এই

* নদীর নাম।

সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ! যা! যা! সে ঠিরে তা ভঁউড়ী * অছি; তুমানঙ্কো মারি পাকাইব।"

এদিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। ভৈরবী বৈরাগিনী, প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার পক্ষে সুহৃৎ কেহ নাই; আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রাজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়া ছিল, কেন না শ্রী দুঃখ কি তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

ভৈরবী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে কখন ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

ভৈরবী। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

ভৈরবী। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি, যে তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

ভৈরবী। ললিতগিরিতে হস্তী গুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

ভৈরবী। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

---

* সুভদ্রা।

তখন দুই জনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয়গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে। *

নিষ্কামকর্ম্ম।

শি। মনুষ্যের কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং কোন কর্ম্মই বা কর্ত্তব্য নহে এই বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে কিছু বলিতে চাই। কিন্তু এই বিষয়টি আমি যে তোমাকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব সেরূপ সাধ্য আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"। (৪র্থঅ, ১৭ গীতা) কর্ম্মের গতি বুঝিতে পারা অতি দুর্জ্ঞেয়। যিনি কর্ম্মের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এ জগতে তাঁহার আর কিছুই জানিতে বাকি নাই। যে কর্ম্ম-বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা কর্ম্মের গতি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তিনি বুঝিয়াছেন কেননা কর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই এই জগৎ চক্র ঘুরিতেছে।

কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথমে ইহা জানা উচিত যে তোমারও পক্ষে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য আর একজনের পক্ষেও যে সেই সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্য তাহা নহে। আজ তুমি যেরূপ অবস্থায় আছ তাহাতে তোমার পক্ষে যেরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কাল হয়ত সেই কর্ম্মই তোমার কাছে অকর্ম্ম। অর্থাৎ দেশ কাল ও

---

* হিন্দু জোতিষশাস্ত্রে গ্রহের Accelerated Motion কে শীঘ্রগতি বলে। দুইটি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়। সম্প্রতি সিংহরাশিতে এই দুই গ্রহের যোগ হইয়াছিল। আকাশের মধ্যে এই দুইটি গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, এই জন্য তদুভয়ের যোগ দেখিতে পরম রমণীয়। সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াই এ উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা সকলের দর্শনীয়। এ বৎসর আর বৃহস্পতি শুক্রের যোগ হইবে না। আগামী বৎসর কার্ত্তিক মাসে কন্যা রাশিতে চিত্রানক্ষত্রে আবার হইবে।

পাত্রানুযায়ী কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিচার করিতে হইবে। আমার পক্ষে যাহা ধর্ম্ম তোমার পক্ষে হয়ত তাহাই অধর্ম্ম; সেই জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"।

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটির অর্থ যত দূর বুঝাইতে পারি তাহাই আজি বুঝাইব।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল বিশেষ বিশেষ দৈবঘটনা স্রোতে পতিত হইয়া থাকে তাহাও তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে যে ঘটনার অধীন হইতে হয়, যে সকল ঘটনাকে অকস্মাৎ ঘটনা দৈবাৎ ঘটনা বলিয়া থাকি সেই সকল ঘটনায় যে আমাকে পতিত হইতে হয় ইহা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল জানিও; আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের সহিত ইহ জীবনের যে কর্ম্মশৃঙ্খলের একতান সম্বন্ধ (Harmony) আছে সেই কর্ম্মই আমার স্বধর্ম্ম। এবং এই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

ছা। আপনি স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলেন আমি তাহা বড় বুঝিতে পারিলাম না।

শি। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি নিজের মনে সেই সকল কথা লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলে পর আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে, যে, যে বিষয় লইয়া নিজে কখন ভাবে নাই সে বিষয়ক কথার ভাব সহজে তাহার মনে অঙ্কিত হয় না। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটা মুটী কথা তোমাকে প্রথমে বলি শুন।

আমি যে ঘটনাস্রোতে ভাসিতেছি, মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্মদ্বারা সেই ঘটনাস্রোতে সন্তরণ দিয়া, কূল পাইবার চেষ্টা করাই স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরপদ অর্থাৎ নিত্য সুখালয়—ঘটনাস্রোতের কূল। সর্ব্বদা সেইকূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাঁতার দিতে যাইও, নচেৎ আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে যে জন্য যুদ্ধে রত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলে স্বধর্ম্ম কথাটির অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়-নাশ-জনিত শোকে মোহ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন সেই সময়ে তাঁহার কি কর্ত্তব্য ইহা বিচার করিতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল ভগবদ্গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা গীতার পাতা উল-টাইয়াই উহার মর্ম্ম সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছেন মনে করেন তাঁহারা গীতাকে নানা কারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু গীতার গুহ্যভাবের ভিতর যাঁহারা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, গীতার কথঞ্চিৎ রসাস্বাদনেই তাঁহারা মোহিত হইয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রের সাহায্যে আমি এইরূপ বুঝি যে, যে ঘটনার অধীন হইয়াছি সেই ঘটনানুযায়ী এবং নিজের মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। অর্জ্জুনের মূল প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়বৃত্তি। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইলেই যে তাঁহাকে কেবল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে তাহা কর্ত্তব্য নহে। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করাই যে কেন কর্ত্তব্য তাহার প্রধান কারণ গীতার ২য় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোক হইতে বুঝা যায়। শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে এই যুদ্ধ "যদৃচ্ছয়া উপপন্নং।"

শ্লোকটি এই—

> যদৃচ্ছয়া যোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
> সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং॥

এই 'যদৃচ্ছয়া যোপপন্নং' কথাটির ভিতর যে কত গূঢ় রহস্য নিহিত রহি-য়াছে তাহা অনেকেই ভাবেন না। যদৃচ্ছয়া উপপন্ন অর্থাৎ যে ঘটনা আমি খুঁজি অথচ যাহা আমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মই তাহার কারণ। এইরূপে অপ্রার্থিত ঘটনার সাহায্যে ইহজীবনের কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মক্ষয় করাই স্বধর্ম্ম।

প্রবৃত্তির শান্তিতেই সুখ এবং প্রবৃত্তির শান্তি করাই ধর্ম্মকর্ম্ম। এবং যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত বিষয়ের সাহায্য লইয়া প্রবৃত্তির শান্তিভাব আনয়ন করিতে

যাওয়াই স্বধর্ম্ম। যুদ্ধবিষয়ে অর্জ্জুনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কুরুক্ষেত্র সমরের সময়ে অর্জ্জুনের সেই প্রবৃত্তি শান্তভাব ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি কুরুক্ষেত্র সমর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং এইরূপ অযাচিত যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া, কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করাই অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ত্তব্য ; ইহাই গীতার অভিপ্রায়।

ছা। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধবিষয় হইতে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যুদ্ধে যে প্রবৃত্তি ছিল ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পূর্ব্বে তিনি বন্ধুবধ-জনিত অনিষ্ট সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই, সেই জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনিষ্ট বিষয় চিন্তা দ্বারা তাঁহার যুদ্ধবিষয়ক প্রবৃত্তি শান্ত হওয়াতেই তিনি যুদ্ধে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে ?

শি। মনুষ্যের প্রবৃত্তি অগ্নির স্বরূপ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এই অগ্নির ইন্ধন, বিষয় বায়ুর সংস্পর্শে এই অগ্নি জ্বলিতে থাকে। এই কর্ম্ম রূপ ইন্ধন সদাই জ্বলিতে চায়। যতক্ষণ না উহা ভস্মসাৎ হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তির শান্তি সম্ভব নহে। প্রবৃত্তি অগ্নি কখন কখন ধূমাবৃত বা ভস্মাচ্ছাদিত হয় এবং সেই সময়ে উহার আভা বাহিরে প্রকাশ পায় না বটে কিন্তু আভা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেই প্রবৃত্তি যে শান্ত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা ভুল। মনে কর তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছ, এমন সময়ে কোন আত্মীয়ের বিপদ সম্বাদ আসিল। তোমার খাওয়া দাওয়া ঘুরে গেল ; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ক্ষুধা যে উপশম হইল ইহা ঠিক কথা নহে। অর্জ্জুনের পক্ষেও সেইরূপ। বন্ধুনাশ-জনিত অনিষ্ট চিন্তায় তাঁহার যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল সেই মোহ-ধূমে তাঁহার ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তির আভা আচ্ছাদিত হইয়াছিল মাত্র, তাঁহার প্রবৃত্তি উপশম হয় নাই। অর্জ্জুনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহার মূল প্রবৃত্তির আভা তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাই ভবদ্গীতার আসল কথা। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন যে কালচক্রের বশে দুর্য্যোধনাদি নিহত হওয়াই নিশ্চয়, জগতের হিত সাধন জন্য

দুর্য্যোধনাদির নিধন সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল, তাঁহার ক্ষত্রিয়বৃত্তির আভা পুনঃ প্রকাশিত হইল। তখন তিনি গুরুধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন জন্যই কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গীতার মর্ম্ম যতই বুঝিতে চেষ্টা করিবে ততই নূতন নূতন ভাব সকল মনোমধ্যে উদয় হইবে। আমার নিকট হইতে মাঝে মাঝে গুটিকত গুটিকত কথা শুনিয়া কিছুই শিখিতে পারিবে না। নিজে না ভাবিতে শিখিলে কেহ কিছু শিখিতে পারে না। "পড়, দেখ, এবং নিজে ভাবিতে আরম্ভ কর" এই উপদেশটী, আমি যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছি সেই সময় আমার একজন শিক্ষকের নিকট হইতে পড়িয়াছিলাম, আমিও তোমাকে এই উপদেশে উপদিষ্ট দেখিতে চাই। দেখ, কর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝিবার অনেক কথা আছে এবং এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আর একদিন উত্থাপন করা যাইবে।

কেতাব কীট।

গ্রন্থকর্ত্তা। দপ্তরি, এই পোকাগুলোকে মেরে ফেলত।

কে-কী। কেন বাপু, মার্ ধর্ করা কেন, পড়িতে আসিয়াছ পড়।

গ্র। আ গেল, এ পোকাটাত ভারি জেঠা দেখ্‌ছি।

কে-কী। সত্য কথা বলিলেই জেঠামি হয়!

গ্র। কীট-রত্ন! আপনিও কি কোন মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন নাকি? ক্ষুদ্র মানবের শিক্ষার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্।

কে-কী। বিদ্রুপ! ভালই। তাহাতে আমার কিছুই হইবে না, তুমি যে কেবল দম্ভ-সর্ব্বস্ব তাহাই প্রকাশ হইবে। অসার দাম্ভিক বই আর কেহ বিদ্রুপ করে না।

গ্র। যে আজ্ঞে! এখন মহাসত্যটা কি বলুন

কে-কী। বলিব বই কি। ঠাট্টাই কর আর যাহাই কর, বলিব। বলি, পুস্তকাগারে পড়িতে আসিয়াছ পড়, আবার মারপিট্ করা কেন? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে?

গ্র। আমাদের কত মারপিট্ করিতে দেখিয়াছ?

কে-কী। মারপিট্ ছাড়া তোমাদের কোন কাজইত দেখিতে পাই না। পাঁচজনের অন্ন না মারিয়া তোমরা আপনারা অন্ন করিয়া খাইতে পার না। পাঁচজনকে সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া তোমরা আপনারা ধনবান হইতে পার না। পাঁচজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অখ্যাতি না করিয়া তোমরা আপনারা খ্যাতি-লাভ করিতে পার না। এমন কি, পরকে না মারিয়া তোমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেও পার না—

গ্র। সে কেমন কথা?

কে-কী। এই তোমাদের Vivisection-এর কথা। জীয়ন্ত পশুপক্ষী-গুলাকে না মারিলে তোমাদের বিজ্ঞানের কলেবর বাড়ে না। পাঁচজনকে না মারিলে তোমরা আপনারা জীবনরক্ষা করিতে পার না। এমনি তোমা-দের ক্ষমতা আর এমনি তোমাদের ধর্ম্ম! তোমাদের জাতিকে ধিক্! তোমাদের মানব নামে ধিক্!

গ্র। এখন দপ্তরি তবে তোকে করে দিক্ ঠিক্। দপ্তরি! এই পোকাগুলোকে মেরে ফেলত।

কে-কী। মরিতে ভয় করি না। তোমাদের জাতির ঢের শ্রাদ্ধ করেছি, এখন মরিলে দুঃখ নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে কি জন্য মারিবে? আমাকে মারিলে তোমার অন্নও বৃদ্ধি হবে না, ঐশ্বর্য্যও বৃদ্ধি হবে না, যশও বৃদ্ধি হবে না, সুখও বৃদ্ধি হবে না। তবে আমাকে কি জন্য মারিবে? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে?

গ্র। তুই জানিস্ না, আমাদের কত লোকসান্ করিতেছিস্? এই সব বই কাটিয়া কাটিয়া তুই একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিস্, তোকে অবশ্য মারিব।

কে-কী। আমি মরিলেই কি তোমাদের বই আর নষ্ট হবে না? তোমাদের সব বই অমর হবে?

গ্র। হবে বৈকি। তোরা না কাটিলে বই আর কেমন করে নষ্ট হবে?

কে-কী। গ্রন্থকারকুলভূষণ! গ্রন্থ কাকে বলে তাও জান না, পোকা কাকে বলে তাও জান না? এই দেখ দেখি—এই সেক্সপীয়র খানা, এই হোমরখানা, এই বাল্মীকিখানা, এই উপনিষদখানা, এই Wealth of Nations খানা—এসব গুলোত কাটিয়া কুঁচি কুঁচি করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এসকল পুস্তকের কি কিছু করিতে পারিয়াছি? কিছু না। করিবার যো কি? এসব পুস্তক হয় মানব-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, নয় মানবাত্মার সুগভীর আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নয় উন্নত নরনারীর প্রাণবায়ুস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, নয় সমাজ-শরীর নিয়ামক মহাশক্তি হইয়া উঠিয়াছে, নয় সামাজিক আচার ব্যবহার প্রথা প্রক্রিয়ারূপে বিকসিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এ সকল পুস্তক আর পুস্তকে নাই, এ সকল পুস্তক আত্মারূপ, হৃদয়রূপ, সমাজ-রূপ, শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। এসকল পুস্তক আর পুস্তকাগারে থাকে না। এ সকল পুস্তক যদি পড়িতে হয় ত এস্থানে আসিও না। এ সকল পুস্তক এখন মানবজীবনে আছে, মানব-সমাজে আছে, মানব-শক্তিতে আছে, মানব-জগতে আছে। এসকল পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা হয় ত এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া মানব-জগতে প্রবেশ কর। আমি, কেতাব-কীট, এ সকল পুস্তকের কি করিতে পারি! এ সকল পুস্তক আমি যতই কাটি না কেন, ইহাদের উচ্ছেদ অসম্ভব। ইহাদের এত কাটিয়া খাই তবু আমাদের পেট ভরে না, মনে হয় যেন পেটে কিছুই যায় নাই।

গ্র। সব বইই কি এই রকমের? তুমি ত সব বইই কাট।

কে-কী। আমি সব বইই কাটি। কিন্তু এই সব বইয়ের ন্যায় যে সব বইয়ের আত্মা আছে সে সব বই আমি কাটিলেও কাটা পড়ে না, নষ্ট হয় না। যে সব বই শুধু বই নয়, মানবজাতির প্রকৃত **বল**; সে সব বইয়ের আমি, কেতাব-কীট, আমিও কাটিয়া কিছু করিতে পারি না, এবং তুমি, অসূয়ারূপী গ্রন্থকার, তুমিও নিন্দা করিয়া কিছু করিতে পার না। সে সব বইয়ের সম্বন্ধে তোমার ক্ষমতা দেখিতে যত বেশিই হউক প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষুদ্র কেতাব-কীটের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী নয়!

প্র। আবার জেঠামি?

কে-কী। জেঠাদের কথা কইতে গেলেই জেঠামি হইয়া পড়ে, কি করিব বল। সে যা হউক। যে সব বইয়ের আত্মা নাই, সে সব বই কেবল বই মাত্র, মানবজাতির প্রকৃত বল নয়, সে সব বই আমি কাটিলেও নষ্ট হয়, না কাটিলেও নষ্ট হয়। সে সব বই থাকা না থাকা সমান। সে সব বই নষ্ট হওয়াই ভাল। সে সব বই কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, হাঁকডাক বাড়ায়, মানুষকে আড়ম্বরে ভুলায়, সোজা পথকে বাঁকা করিয়া দেয়, শস্যের পরিবর্ত্তে খোসা খাইতে দেয়, জ্ঞানকে মত্ততায় বিলুপ্ত করে, সুস্থ আত্মাকে রোগগ্রস্থ করিয়া মারিয়া ফেলে। সে সব বই না থাকাই ভাল। তবে আর আমাকে মার কেন?

প্র। আচ্ছা, তুমি যদিও আমাদের কোন অপকার কর না, কিন্তু তোমা হইতে আমাদের কোন উপকারও ত হয় না। তবে তোমাকে মারিব না কেন? তোমাকে রাখিয়া কি লাভ?

কে-কী। হাঁ, এটা ঠিক্ ইংরেজের চেলার মতন কথা হইয়াছে বটে। যাহা দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না, যেমন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা, তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাহাকে মারিয়া ফেলাই ভাল। যাহাকে লইয়া সুখ সম্ভোগ হয় না—যেমন নিঃসহায়া বৃদ্ধা কুটুম্বিনী বা নিরক্ষর উপার্জ্জনাক্ষম জ্ঞাতিপুত্র—তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাহাকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হিন্দুর ছেলে হইয়া তোমরা যেরকম পাকাপোক্ত ইংরাজের চেলা হইয়াছ তাহাতে তোমাদের বাহাদুর বলিতে হয়। ফলতঃ এখন তোমাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্যই নাই—ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, উন্নতি বল, পরোপকার বল—কোন লক্ষ্যই নাই, এখন বাহাদুরী তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু, বাহাদুর সাহেব! আমি লোকের কিছু উপকারও করিয়া থাকি। শুনিবে কি?

প্র। বল, কিন্তু অত impertinence talk করিও না।

কে-কী। বাপ্‌রে! তোমার কাছে কি আমি impertinence talk করিতে পারি? সে যে বড় স্পর্দ্ধার কাজ হবে। সে ভাবনা করিও না। এখন বলি শুন। তুমি ত একজন গ্রন্থকার। সকল গ্রন্থকারের ন্যায় তোমারও

পড়াশুনা খুব কম কিন্তু পড়াশুনার ভাণ খুব বেশী। তুমি সেক্সপীয়রের নাটক ৩খানা কি ৪ খানার বেশী পড় না, মিণ্টনের ৩সর্গের বেশী পড় না, বাল্মীকির রামায়ণের একটা শ্লোকও পড় না, কালিদাসের শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক বই আর কিছুই পড় না। কিন্তু এমনি ভাণ করিয়া থাক, যেন সেক্স‌পীয়র মিণ্টন বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি সব দেশের সব গ্রন্থকারের সব রচনাই খাইয়া ফেলিয়াছ। এ গুমোর টুকু কেবল আমার প্রসাদাৎ করিতে পার কি না বল দেখি? আবার কখন কখন প্রকৃত বিদ্বন্মণ্ডলিকেও যে Alcuin, Thomas Aquinas, Paracelsus প্রভৃতির কথা বলিয়া তাক্ লাগাইয়া দেও, সেও কেবল আমি, কেতাবকীট, আমার জোরে কি না বল দেখি? তবেই ত আমি, ক্ষুদ্র কেতাব কীট, আমিও তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া থাকি। আমার বাতাস একটু পাইলে তোমার ভাল হয় কি না বল দেখি?

প্র। ঠিক্ বলেছ। তোমাকে কি মারিতে পারি! তুমি চিরকাল এই পুস্তকাগারে থাকিয়া পুস্তক কাট, আমি তোমায় কিছু বলিব না। কিন্তু এখন আমাকে Winckelmann-এর Troy সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে দুই চারিটা কথা বলিয়া দেও দেখি, আমি Gladstone এর বর্জিল সম্বন্ধীয় মতটা খণ্ড খণ্ড করিয়া Plevna নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীতে একটা প্রকাণ্ড কীর্ত্তিপতাকা উড়াইয়া দি।

কে-কী। আঃ সে আর কোন্ কথা? এই বলিয়া দিতেছি লিখিয়া লও। দেখিতেছি, বই কাহাকে বলে এবং কেতাব কীট কাহাকে বলে তুমি যেমন বুঝিয়াছ তেমন আর কেহ বুঝে না। আহা! তুমি আমার শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিলে! তুমি বাহাদুরের গোষ্ঠীতে বাহাদুর! এখন যাও তুমি Gladstoneএর মাথা খাওগে—আমি তোমার গোষ্ঠীর মাথা খাইগে। দপ্তরি, ঐ বাঙ্গালা আল্‌মারিটায় আমাকে তুলিয়া দেও ত, দেখি, আমার উদরসাৎ হয়েও ওদের কয়জন বেঁচে থাকে। কেতাব-কীটকে চেনে না, আবার বই লিখ্‌তে চায়? হা কপাল!

[কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্—]

সংসার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালের বন্ধু।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন বিন্দু তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবা মাত্র সে শান্ত মুখ খানি স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হইল, নয়ন দুটীতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বিন্দু বলিলেন,

"কি ভাগিগ তুমি এলে এতক্ষণে; আমি মনে করিলাম বুঝি বাড়ীর পথ ভুলিয়াই গিয়াছ। কিম্বা বুঝি উমাতারার কথা ঠেলিতে পারলে না, আজ জেঠা মহাশয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আস্‌তে পার্‌লে না।"

হেম। "কেন বল দেখি, এত ঠাট্টা কেন? অধিক রাত্রি হইয়াছে নাকি"?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন, "না এই কেবল দুপুর রাত্রি! আর সন্ধ্যা থেকে তোমার একজন বন্ধু অপেক্ষা করিতেছেন"।

হেম। "কে? কে? কে?"

বিন্দু। "এই দেখ্‌বে এস না" এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর যাইবা মাত্র একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; হেমচন্দ্র ক্ষণেক তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, বিন্দু তাহা দেখিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর হেম বলিলেন "একি শরৎ! তুমি কলিকাতা হইতে কবে আসিলে? উঃ তুমি কি বদলাইয়া গিয়াছ; আমি তোমাকে তোমার দিদি কালীতারার বিবাহের সময় দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়িতে, একবার বাড়ী আসিয়া-

ছিলে; তখন তুমি সাত আট বৎসরের বালক ছিলে মাত্র। এখন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় যুবক হইয়াছ; তোমার দাড়ী গোঁপ হইয়াছে; তোমাকে কি সহসা চেনা যায়।"

শরৎ। "নয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয় তাহার সন্দেহ কি? দিদির বের পরই বাবার মৃত্যু হইল, তাহার পর মাও গ্রাম হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া রহিলেন, সেই জন্য আর বাড়ী আসা হয় নাই। আমি এণ্ট্রান্স পাস করিলে পর বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় যাইলাম, মাও বর্দ্ধমানের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় গ্রামে আসিয়া রহিয়াছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটীতে গ্রামে আসিলাম। নয় বৎসরের পর আপনি আমাতে পরিবর্ত্তন দেখিবেন তাহাতে বিস্ময় কি? আমিই তখন কি দেখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি! বিন্দু দিদি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়, সুতরাং আমরা ছেলে বেলা সর্ব্বদা একত্রে খেলা করিতাম, আমি মল্লিকদের বাড়ী যাইতাম, অথবা বিন্দু দিদি সুধাকে কোলে করিয়া আমাদের বাড়ী দেখিতে আসিত পেয়ারা তলায় সুধাকে রাখিয়া আঁকুসি দিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইত; আজ কিনা বিন্দুদিদি সংসারে গৃহিণী, দুই ছেলের মা।"

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আর তুমি আর বলিও না, তোমার দৌরাত্ম্যে তালপুকুরের আঁব বাগানে আঁব থাকিত না, এখন কলিকাতায় গিয়ে লেখা পড়া শিখিয়া তুমি কালেজের ছেলেদের মধ্যে নাকি একজন প্রধান ছাত্র হয়েছ, তখন গেছোদের মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে!"

শরৎ। "বিন্দু দিদি সেও তোমাদের জন্য! তোমার জেঠাই মা কাঁচা আঁবগুলো খেতে বারণ করিতেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়া গলিয়ে তোমাদের রান্নাঘরে আঁব দিয়া আসিতাম কি না বলিও!"

হেম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আর পরস্পরের গুণ ব্যাখার আবশ্যক কি, অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে! আমিও তোমাদের বাড়ী যাইতাম, এবং সুধাকে তথায় কখন কখন দেখিতে পাইতাম, তখন সুধা ৪।৫ বৎসরের ছোট মেয়েটী। সুধা! ঘোষেদের বাড়ী যেতে মনে পড়ে? সেখানে তোমার দিদি তোমাকে ক্রোলে করিয়া লইয়া যাইতেন মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে?"

সুধা। "শরৎ বাবুকে একটু একটু মনে পড়ে, দিদি আপনি পেয়ারা পাড়িয়া খাইত, আমি পাড়িতে পারিতাম না, শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়রা পাড়িয়া খাওয়াইতেন।" সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়াছে? শরৎ খেয়েছে?"

শরৎ। হাঁ, বিন্দু দিদি আমাকে যেরূপ কচি আঁবের অম্বল খাইয়েছেন, সেরূপ কচি আঁব কখনও খাই নাই।"

বিন্দু। "কেন, নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন গাছে গাছে বেড়াইতে, তখন?"

শরৎ। "হাঁ তখন খাইয়াছি বটে, কিন্তু তখন ত এরূপে রাঁধিয়া দিবার কেহ ছিল না।"

বিন্দু। "থাকবে না কেন? বেঁদে দিবার তর্ সইত না তাই বল।"

হে। "সুধার খাওয়া হইয়াছে, তোমার খাওয়া হইয়াছে?"

বিন্দু। "সুধা খেয়েছে, আমি এই যাই খাইগে। তুমি আর কিছু খাবে না।"

হেম। "না; তোমার জেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যেরূপ খাইয়া আসিয়াছি। আর কি খাইতে পারি? যাও তুমি যাও খাওয়া দাওয়া করো গিয়ে, অনেক রাত্রি হইয়াছে।"

বিন্দু রান্না ঘরে গেলেন। সুধা হেমচন্দ্রের জন্য এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটী মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তাশূন্য বালিকা শুইবা মাত্র সেই শীতল নৈশ বায়ুতে ও শুভ্রবর্ণ চন্দ্রালোকে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুখুর গ্রাম এখন নিস্তব্ধ এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। তালপুখুরের ঘোষ বংশ ও বসু বংশের মধ্যে বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন, ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র, উন্নত হৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীর প্রকৃতি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত, তেজোপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে

পারিলেন। এ জগতে আমাদিগের অনেক আলাপী লোক আছে, মনের ঐক্য অতি অল্প লোকের সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অনুরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র যতই কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এস পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিন্দু আহারাদি সমাপন করিয়া সেথায় আসিয়া বসিলেন; সুধার মাথায় বালিশ ছিল না, সুপ্ত ভগ্নীর মস্তকটী আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহার সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ গুলি লইয়া সস্নেহে খেলা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শরৎ তুমি এবার "এল এর" জন্য পড়িতেছ। ছয় সাত মাস পরই তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় তুমি যে প্রথম শ্রেণিতে হইবে এবং জলপানি পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর কি করিবে স্থির করিয়াছ কি?"

শরৎ। "কিছুই স্থির নাই। আমার ইচ্ছা "বি এ" পর্য্যন্ত পড়িতে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন এবং আমাকে এই পরীক্ষা দেখিয়া গ্রামে আসিয়া বিষয়টী দেখিতে ও এখানে থাকিতে বলেন। তা দেখা যাউক্ কি হয়। আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত, আট শত টাকার অধিক লাভ নাই, কোনও উপযুক্ত চাকুরি পাইলে করিতে ইচ্ছা আছে। মাও চাকুরি স্থানে আমার সহিত থাকিবেন; এখানে লোক জন বিষয় দেখিবে।

হেম। "তা যাহা হউক তোমার পরীক্ষার পর হইবে। এই কয়েক মাস কলিকাতায় থাকিয়া মনোযোগ করিয়া পড়া শুনা কর, "এণ্ট্রান্স" পরীক্ষা যেরূপ সম্মানের সহিত দিয়াছ এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। "সেই রূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কলিকাতায় যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিব। আমি মনে মনে এক এক বার ভাবি আপনারাও কেন এক বার কলিকাতায় আসুন না; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করিবেন? আপনি নয় বৎসর পুর্ব্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলেন, বিন্দু দিদি কখনও কলিকাতা দেখেন নাই; একবার উভয়েই

চলুন না কেন? এই চাষ দেওয়া ধান বুনা হইয়া গেলে আসুন, আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, আবার ইচ্ছা হইলে পুনরায় ভাদ্রমাসে ধান কাটিবার সময় আসিবেন।

হেম। "শরৎ তুমি আমাদের স্নেহ কর তাহাই এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমি কলিকাতায় গিয়া কি করিব বল? তুমি লেখা পড়া করিবে, পরীক্ষা দিবে, সম্ভবতঃ চাকুরি পাইবে;—আমি গিয়া কি করিব বল?"

শরৎ। "কেন, আপনি কি কোনও প্রকার চেষ্টা দেখিতে পারেন না। আপনি এ রূপ লেখা পড়া শিখিয়া কি চিরজীবন এইখানে কাটাইবেন? শুনিয়াছি আপনি কলেজ ছাড়িয়া বিস্তর বই পড়িয়াছেন, যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, "বি এ" দিগের মধ্যে অল্প লোকেরই আপনার ন্যায় সেটী আছে? আপনার শিক্ষায়, আপনার অধ্যবসায়ে, আপনার উন্নত সততায় কি কোনও এক প্রকার উপায় হইবে না?"

হেম। "শরৎ আমার শিক্ষা অধিক নহে, সামান্য; পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয়, অন্য কায নাই, সেই জন্য দুই এক খানা করিয়া দেখি। আর কলিকাতার ন্যায় মহৎ স্থানে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতেছে, কিছু হয় না, আমি যখন কলেজে ছিলাম তাহা দেখিয়াছি। গুণ থাকিলেও এত লোকের মধ্যে গুণের পরিচয় দেওয়া কঠিন, আমার ন্যায় নির্গুণ লোক তিন চারি মাসে কিছুই করিতে পারিবে না, ব্যর্থযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

শরৎ। "যদি তাহাই হয় তাহাতে ক্ষতি কি? আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে থাকিলে আপনাদিগের কিছু মাত্র ব্যয় হইবে না, একবার সকলের কলিকাতা দেখা হইবে, একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে; আমার স্থির বিশ্বাস যে বিশাল মনুষ্য-সমুদ্রেও আপনার ন্যায় শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরিচিত ও পুরস্কৃত হইবে। আর যদি তাহা না হয়,—পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?"

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন "শরৎ তুমি আমাদিগকে নিজ গৃহে স্থান দিতে চাহিলে এটী তোমার অতিশয় দয়া। কিন্তু আমরা

যদি সত্য সত্যই কলিকাতায় যাই তাহা হইলে নিজেরাই একটী বাসা করিয়া থাকিব, তোমার পড়ার অসুবিধা করিব না। সে যাহা হউক, এ কথা অদ্য রাত্রিতে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে; তারিণীবাবু বর্দ্ধমানে যাইতে বলিতেছেন,' তুমি কলিকাতায় যাইতে বলিতেছ, আমার ও ইচ্ছা কোথাও যাইয়া একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখি। বিবেচনা করিয়া, তোমার পরামর্শ লইয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিষ্পত্তি করিব।"

শরৎ। "বিন্দু দিদি! তোমার কি ইচ্ছা,—একবার কলিকাতা দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

বিন্দু। "ইচ্ছা ত হয় কিন্তু হইয়া উঠে কৈ? আর শুনিয়াছি সেখানে অতিশয় খরচ হয়,—আমরা গরিব লোক, এত টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?"

শরৎ। "আপনারা ইচ্ছা করিয়া টাকা খরচ করিলেই খরচ হয়, নচেৎ খরচ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আপনারা যদি আমাদের বাড়ীতে থাকেন, তাহা হইলে আমার লেখাপড়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; অনেক সময় যখন পড়িতে পড়িতে মনটা অস্থির হয়, তখন আপনাদিগের লোকের সহিত কথা কহিলে মন স্থির হয়।

বিন্দু। "আবার অনেক সময় যখন পড়া শুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর আসিয়া ছেলে বেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা হবে; তাহাতে খুব লেখা পড়া হবে!"

শরৎ। "আর অনেক সময় যখন ভাত খাইতে অরুচি হইবে তখন কচি কচি আঁবের অম্বল খাওয়া হইবে;—আমি দেখিতে পাইতেছি লাভের ভাগটাই অধিক।"

বিন্দু। "হাঁ তোমার এখন লাভেরই কপাল! ঐ যে শুনছিলুম অম্বল-রাঁধুনী একটী শীঘ্র আসিবে?"

শরৎ। "কে?"

বিন্দু। "কেন কিছু জান না নাকি? ঐ তোমার মা তোমার বের সম্বন্ধ স্থির কচ্চেন না?

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন,—বলিলেন "সে কোনও কাযের কথা নয়।"

হেম। "তোমার মাতা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন না কি?"

শরৎ "মা তত জেদ্ করেন না, কিন্তু দিদির বড় ইচ্ছা যে, আমার এখনই বিবাহ হয়, দিদিই নাকি বর্দ্ধমানে সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন এবং পরশু গ্রামে আসিয়া অবধি মাকে লওয়াইতেছেন। কিন্তু আমি মাকেও বলিয়াছি, দিদিকেও বলিয়াছি, এই পরীক্ষা না দিয়া এবং কোনও প্রকার চাকুরি বা অন্য অবলম্বন না পাইয়া আমি বিবাহ করিব না।"

বিন্দু। "আহা কালীতারার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয় নাই। ছেলে বেলা আমি আর কালীতারা আব উমাতারা একত্রে খেলা করিতাম, কালী আমার চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আর উমা আবার কালীর চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আমরা তিনজন সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতাম। কিন্তু এখন ছয়মাসে নয় মাসে একবারও দেখা হয় না! কাল একবার তোমাদের বাড়ী যাইব, আবার উমাতারার সঙ্গেও দেখা করিতে যাইব।"

শরৎ। "দিদি কাল উমার বাড়ী যাইবে, বিন্দুদিদি তুমিও সেইখানে গেলেই সকলের সহিত দেখা হইবে।"

বিন্দু। "তবে সেই ভাল। আহা কালীকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে। আমার বিয়ে হইবার আগে কালীর বিয়ে হইয়াছে, আহা সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পাইয়াছে কে বলিতে পারে। আচ্ছা, শরৎ বাবু তোমার মা দেখিয়া শুনিয়া এমন ঘরে বিবাহ দিলেন কেন? বের সময় বরকে দেখিয়াছিলাম, লোকে বলে তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ছিল!"

শরৎ। "বিন্দুদিদি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। মার ও সম্বন্ধে অধিক মত ছিল না, কিন্তু বরেদের কুল বড় ভাল, লোকে বলিল বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ কুল পাওয়া দুষ্কর, পাড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ করিতে লাগিল, বাবা তাহাতে মত দিলেন, সুতরাং মা কি করিবেন। বিবাহ দিয়া অবধি মা সেই বিষয় দুঃখ করেন, বলেন মেয়েটীকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার ভগিনীপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁহার সংসারের অনেক দাস দাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্ম করেন, দুবেলা দুপেট খাইতে পান, দিদি তা হাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার সরল

চিত্তে অন্য কোনও আশা নাই। আমাদের সংসারে গৃহে গৃহে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা তাপসী আছে, পূর্ব্বকালে মুনিঋষিদিগের মধ্যেও সেরূপ ছিল কিনা জানি না।"

কালীতারার অবস্থা চিন্তা করিয়া বিন্দু ধীরে ধীরে এক বিন্দু অশ্রুজল মোচন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন, 'বিন্দু দিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হইয়াছে। আবার কাল দেখা হবে। যতদিন আমি গ্রামে আছি তোমার কচি আঁবের অম্বল এক একবার আস্বাদন করিতে আসিব। আর যদি অনুগ্রহ করিয়া তোমরা কলিকাতায় যাও, তবেত আর আমার সুখের সীমাই নাই"।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন "তা আচ্ছা এস। কলিকাতায় যাওয়া না যাওয়া কাল স্থির করিব, কিন্তু যাওয়া হউক আর নাই হউক, কচি আঁবের অম্বল রাঁধিতে পারে এমন একজন রাঁধুনির বিষয় কাল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করিয়া পরামর্শ ঠিক করিব, সে বিষয় আর ভাবিতে হবে না"।

হাসিতে হাসিতে শরৎচন্দ্র, হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুধা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্ম্মল চন্দ্রালোক সুধার সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ওষ্ঠদ্বয়ে সুচিক্কণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল। বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল বৎসের কথা বা বাল্যকালে পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বাটী হইতে নির্গত হইয়া শরৎচন্দ্র সেই নির্ম্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন। "আমি বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনাঢ্যের পরিবার দেখিয়াছি কিন্তু অদ্য এই পল্লিগ্রামের সামান্য গৃহে যেরূপ সরলতা, অমায়িকতা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম্ম দেখিলাম সেরূপ কুত্রাপি দেখি নাই। জগদীশ্বর! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্ব্বদা নিরাপদে থাকে, সর্ব্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে। বাল্যকাল হইতে একাকী থাকিয়া ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এ জীবন শুষ্ক প্রায় হইয়াছে, আমার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি শুখাইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দুদিদির স্নেহে অদ্য আমার হৃদয় যেন

পুনরায় প্লাবিত হইল; জগদীশ্বর করুন যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া আমি পুনরায় মনুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি।" এই প্রকার নানা রূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী গেলেন।

কৃষ্ণচরিত্র।

—o—

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে দুর্য্যোধন, উপায়ণ প্রতিগ্রহে, ইত্যাদিরূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন!

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়ানই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন

বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধ চন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫।১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে, ও চাণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ও পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন, যে কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত।' কেন না, আমরা এই শিশুপাল বধপর্ব্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই, যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শাঙ্গ চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক আরম্ভ হইতে সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" তবে ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত রহিলেন কখন? হয়ত, দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা একথার আর বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা

দেখাইবার জন্যই আমি এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের ব্যাপারটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিকতত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি, যে জরাসন্ধ বধের পূর্ব্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধ বধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপাল বধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এ মতের প্রচারকর্ত্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন, জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপাল বধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে, যে শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা ব্যক্তব্য যে শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার সপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান

ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের একজন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল বধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংসার পূর্ব্বে বুঝিতে হয়, যে এই শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপাল বধের অঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনা গুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডবসভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয়, যে যেমন জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম দেখি। বরং জরাসন্ধ বধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র শিশুপাল বধে বেশী! অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে শিশুপাল বধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন

পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালা চন্দন দেওয়া হয়, কেননা কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশজই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্নপ্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়াই দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজাগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এইকথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিয়াছেন, "কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ প্রদান কর।"

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ বল, ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ দান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এইজন্যই অর্ঘ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল এককালীন ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ও পাণ্ডবদিগকে তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলেনা কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য * মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চ্চনা কেন? ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

হইয়া উঠিলেন। তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে "প্রিয়চিকীর্ষু" "অপ্রাপ্তলক্ষণ" ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্ম্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুকুর, দ্বারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শপুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, যে তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষ বচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহুত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্মের সেটা বড় ভাল লাগিল না—বুড়ারা একটু খিট্‌খিটে, একটু স্পষ্টবক্তা হয়। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন, যে কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চ্চনীয়। আমরা দুই রকম কথাই পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,

"এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব,

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে তাহা পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয়, প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

"সেই ভূতসুখাবহ জগদার্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা, এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।"

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

"কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই

একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্‌ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।”

প্রথমতঃ পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে, বল, পরাক্রম ও শৌর্য্যাদিতে সকল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু তদুচিত কৃষ্ণের কার্য্য আমরা মহাভারতে কোথায় দেখি? পাঠক মহাভারতে তাহা দেখিবেন না। মহাভারত কৃষ্ণের ইতিহাস নহে, পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। পাণ্ডবদিগের ইতিহাস কথনে, প্রসঙ্গতঃ যেখানে কৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই কেবল ভারতকার কৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ যেখানে পাণ্ডবদিগের সংশ্রবে থাকিয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন, কেবল সেই কার্য্যই লিখিত হইয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণের আনু- পূর্ব্বিক জীবনী ইহাতে নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র। এই শিশুপাল বধে, একবার মাত্র অস্ত্রধারী—তাও মুহূর্ত্ত জন্য। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখিত হয় নাই বলিয়া, পরবর্ত্তী লেখকেরা ভাগবতাদি পুরাণে ও হরিবংশে সে অভাব পূরণের চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদেরও ইচ্ছা আছে যে ক্রমশঃ সে সকল হইতেও কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিব, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি, নহিলে কৃষ্ণচরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন আসল বৃত্তান্ত সকল লোপ পাইয়াছিল— লেখকেরা উপন্যাসে ও রূপকের দ্বারাই অভাব পূরণ করিয়াছেন। সে সকলের ভিতর হইতে সত্যের উদ্ধার বড় কঠিন। মহাভারতই মৌলিক, এবং কতকটা ঐতিহাসিক। ইহাতে আর কিছু না হৌক, তাঁহার সম- সাময়িকেরা তাঁহাকে কিরূপ বিবেচনা করিতেন, তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি কিরূপ তাহার পরিচয় পাই। আর স্থানে স্থানে তাঁহার কৃত কার্য্যের ও কিছু কিছু প্রসঙ্গও আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে স্বয়ং অর্জ্জুন কৃষ্ণের যুদ্ধ সকলের একটা তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহার চুম্বক দিতেছি।

(১) ভোজ রাজগণকে জয় করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ।

(২) গান্ধার জয় ও রাজা সুদর্শনের বন্ধন মোচন।

(৩) পাণ্ড্যজয়।

(৪) কলিঙ্গজয়।

(৫) বারানশী জয়।

(৬) অন্যের অজেয় একলব্যের সংহার।

(৭) কংসনিপাত।

(৮) শাম্বজয়।

(৯) নরক বধ।

(৮) ও (৯) অনৈতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। আর সাতটি ঐতিহাসিক বোধ হয়। আমরা যখন গ্রন্থারম্ভের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন দেখাইব, যে এই কয়টিই ধর্ম্ম যুদ্ধ। ধর্ম্ম যুদ্ধ ভিন্ন কখন কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিতেন না। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলে কখনও গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ করিলে, অজেয় ছিলেন। ইহাই যোদ্ধার আদর্শ। যে যুদ্ধে একেবারে পরাঙ্মুখ, যে দুরাত্মার দমনার্থ ও যুদ্ধে অনিচ্ছুক, আপনার বা স্বজনের বা স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধেও অনিচ্ছুক, সে আদর্শ মনুষ্য নহে। এমন লোকের প্রশংসা করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক, আমি তাহাকে পাপাত্মা বলিব। যখন বিনা বলে ও বিনা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার পাপের দমন সম্ভব হইবে, একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দুইটা ধর্ম্ম কথা শুনিতে পাইলেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেণ্ট হেলেনায় বাস করিবে, একজন তৈমুরলঙ্গ একজন ব্রাহ্মণের পাকা দাড়ি দেখিলেই প্রণাম করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে, এমন সময় কখন পৃথিবীতে আসিবে কিনা, বলিতে পারিনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন আসে নাই, এবং ভবিষ্যতে আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ (১) যিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদ বেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ কি, তাহা বলিলাম। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারত-

তের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনিষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে. ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যথাকালে এ কথার সবিস্তারে বিচার করা যাইবে। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন—যথা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্য রূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

সীতারাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।* গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত,

* এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী স্বয়ং বাঁধা—বিরূপাই বা কে—আর কেই বা কে?

ধান্য বা হরিৎক্ষেত্র রঞ্জিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্তি-গিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর; ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি রাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবদের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পীতাম্বরী সাটী। তাহার উপর, মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র, তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে —সুকোমল গালিচার উপর কে যেন নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক —চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্প মাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সংমিলন স্বরূপ পুরুষ মূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবর-যৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী,
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণানিম্ননাভি—

এই সকল স্ত্রী মূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পানিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীর মধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুল গুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজ কাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে ভৈরবী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধরস্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে ভৈরবী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধরস্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে ভৈরবীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তোমার মঙ্গল? তোমার ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে?"

ভৈরবী। এ জন্মে হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী। পাপ!

ভৈরবী চুপ করিয়া, মুখ নত করিল।

স্বামী। তবে এক্ষণে কি করিবে?

ভৈরবী। যাহা করিতেছি, তাহাই করিব। আমার কোন দুঃখ নাই। যদি থাকে, তবে একটা দুঃখের ভার মরণ পর্য্যন্ত বহা যায় না?

স্বামী। একটা কেন, সহস্র দুঃখ ভার বহন করা যায়। যাহার সহস্র দুঃখ, সে সহস্র দুঃখেরই ভার মৃত্যু পর্য্যন্ত বহন করে। গর্দ্দভের পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিলে, সে কি ফেলিয়া দেয়? যাহারা বহন করে, তাহারা মনুষ্য বেশে গর্দ্দভ। যে দুঃখ মোচন করে, সেই মানুষ। তুমি আপনার দুঃখ মোচন করিতেছ না কেন?

ভৈরবী। তাহার উপায় জানি না। স্ত্রীলোক বলিয়া, আপনি যোগাভ্যাস নিষেধ করিয়াছেন।

স্বামী। যোগ কি? জ্ঞানই যোগ। জ্ঞানে কে অনধিকারী? বেদে ভিন্ন কি জ্ঞান নাই? জ্ঞানই আনন্দ। তোমার ত জ্ঞানের অভাব নাই। দুঃখ কেন?

ভৈরবী। আমি উপদেশ লইয়াছি কিন্তু আমার শিক্ষা হয় নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান নাই।

ভৈরবী। আমার কর্ম্ম হয় নাই।

স্বামী। এখন কোথা যাইতেছ?

ভৈরবী। পুরুষোত্তম দর্শনে।

স্বামী। কেন?

ভৈরবী। আর কোন কাজ নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর না কেন? তীর্থ দর্শন ত সকাম কর্ম্ম।

ভৈরবী। আমার ইহাতে কোন কামনা নাই। কেবল ভূত-তাড়িত হইয়া ফিরিতেছি।

স্বামী। ভাল, দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া দিব। এ স্ত্রী কে?

ভৈরবী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

ভৈরবী। প্রারব্ধ লইয়া গোলে পড়িয়াছি। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুরত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,

"তোমার কর্কট রাশি।"*

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামী বলিলেন,

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল, স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম, শক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশভাবে গ্রহগনের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন,

"তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভ গ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"†

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

---

* পরকনক শরীরো দেব নম্র প্রকাশ্যঃ
ভবতি বিপুলবক্ষ কর্কটো যস্য রাশিঃ

কোষ্ঠীপ্রদীপে।

এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

† জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িণী রাজ্ঞী ভবেদ্ভূপতেঃ।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভ গ্রহত্রয় পাপ গ্রহের ক্ষেত্রে ‡ পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী। আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন,

"তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামী সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তম দর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন ভৈরবী বলিল,

"পিতঃ, আমারও প্রতি ঐরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি কবে আসিব?"

স্বামী। দুইজনে এক সময়েই আসিও।

তখন গঙ্গাধরস্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ভৈরবীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

---

‡ মকরে

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার সেই যুগল ভৈরবীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চবড় দিবারে হউ!" কেহ বলিল, "টিকে ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হুউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য ভৈরবী বলিল,

"ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা—ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি।"

স্নেহ সম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন ভৈরবীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী ভৈরবীকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,—কেননা ভৈরবী শ্রীর পূজনীয়া। আজ ভৈরবী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে ভৈরবীও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

ভৈরবী বলিতে লাগিল—"আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমরা দুইজনেই সমান বয়স, বুঝি সমান দুঃখে এই পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকিব। আমরা দুইজনে ভগিনী।

শ্রী। আমার এমনই অদৃষ্ট যে যে আমার সংসর্গে আসে সেই দুঃখী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

ভৈরবী। সে দুঃখ একদিন তোমাকে বলিব। তোমারও দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

ভৈরবী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা

শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে কখন কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামী-সেবা—যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামির একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেননা তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামী বিরহ দুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু দিয়া ফোঁটা দুই চারি জল পড়িল। জয়ন্তী বলিল—

"তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভাল বাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্রে ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকুশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুণ এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন ভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীও কাঁদিল। এমন ভৈরবী কি ভৈরবী?

———

বেদের ঈশ্বরবাদ।

প্রবাদ আছে হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল শ্লোক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিযাছি, বেদে বলে. এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত; এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার—আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

"তিস্রো এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথকত্বাৎ যথা হোতা অধ্বর্য্যুব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।" ৭। ৫।

অর্থাৎ "নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেক গুলি নাম। অথবা তাঁহাদিগের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা, উদ্গাতা, এক জনেরই নাম হয়।

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে. তেত্রিশের স্থানে মোটে তিনজন দেখিতেছি—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না—জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, অন্তরিক্ষ সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন. এবং আকাশে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই—এক দেবতা, তাঁহার কর্ম্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না, যে ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন, যে এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কাল সাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভা সম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" (১০। ৮৮) অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তক; প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদয় হন।" পুনশ্চ "যদেনমদধুর্য্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে "এনং অগ্নিং সূর্য্যং আদিতেয়ং" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ" অর্থাৎ শাকপূণি (পূর্ব্বগামী নিরুক্তকার), বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থানে অগ্নি আছেন।" ভৌম, অন্তরিক্ষ, ও দিব্য, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্য স সুপর্ণ গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বন্।" ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল, বা দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, অগ্নি যম মাতরিশ্বন্।" পুনশ্চ, অথর্ব্ব বেদে, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রোভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতাভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রোভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং" সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

এইরূপে ঋষিরা বুঝিতে লাগিলেন, যে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ অন্তরিক্ষের দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা

পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একইনিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৫৫) এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম,তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মতঃ উহার ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দুধর্ম্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান, চাবি তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই, উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি তালার ভিতর বদ্ধ থাকে; যাঁহার হাতে চাবি তিনি কদাচ কখন সিন্ধুক খুলিয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বখ্‌শিষ করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের পুঁজি পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। এইজন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এতদিন চাবিতালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিনজনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।*

---

* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই রূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক দেবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে একজনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন—"মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানিভবন্তি।"*

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীনতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থলে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক। জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সুমীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠ পুস্তকের ॥৵৹ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেই রূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইহাঁর ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম **বিশ্বকর্ম্মা।** ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্ত্তার এই নাম—পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১০। ৮১। ২ বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (ঐ,৩) ইত্যাদি।

(২) তিনি **হিরণ্যগর্ভ।** এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসে ও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐ রূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশমমণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে জাত, সর্ব্বভূতের একমাত্র পতি, সর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি **প্রজাপতি।** তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা সবিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের একমাত্র চৈতন্য বিশিষ্ট সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া বুঝিলেন তখন তাহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার ব্রহ্মা শব্দ নাই।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ একখণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। প্রচারে কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থ সমালোচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ। এজন্য প্রচারে উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে প্রচারে এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। বেদে কি আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে—আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি—প্রচারে এত স্থান নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দ ও আমি ঋগ্বেদ সংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পর ভাগ, উপনিষদ, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনেয় সংহিতায় ও অথর্ব বেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষ সূক্ত বলে। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শত পথ ব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। অদ্যাপি বিষ্ণু পূজার পুরুষ সূক্তের প্রথম ঋক ব্যবহৃত হয়—

সহস্র শীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ

সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং

কথিত হইয়াছে যে এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ ফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য"—সমস্ত বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্ম্মা হিরণ্য গর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহুদেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব, যে সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেহপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধযান্বিতাঃ

তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং। গীতা ৯। ২

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয় হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝি —এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি সেই একজনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম।

---

* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

গঙ্গার স্তোত্র।

(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে।)

বন্দে গিরিবালে।
নগরাজ-কোল-শোভিনি,
কল কল কলভাষিনি,
সপ্তধার-হারধারিণি,
বিমলে।
বন্দে গিরিবালে॥
হরিদ্বার-দ্বারচারিণি,
জাহ্নবী-নামধারিণি,
গিরি নীলে-নীলবরণি,
মা মঙ্গলে।
বন্দে গিরিবালে॥
বন্দে গিরিবালে।
অবিরাম-গতি-গঙ্গে,
চির-নীর-হার-অঙ্গে,
দ্রুমরাজি চলে সঙ্গে,
তটভঙ্গি কত ভঙ্গে,
মাতঃ গঙ্গে।
তব তীরে কুশকাশ,
তব নীরে কত ভাষ,
কভু ধীরে মৃদু হাস,
কভু ভীষণ গতি ভঙ্গে।
মাতঃ গঙ্গে॥
মাতর্গঙ্গে; তব নীরকুশলে
জম্বুদ্বীপ খ্যাত মহীমণ্ডলে
নির্ম্মল সলিলে ভারতমেখলে
মা গঙ্গে।

পুণ্য-শরীরে তব নীরতীরে
যুগ যুগান্তে কত কত বীরে *
কত মহামতি তব তীর্থে ধীরে,
অস্থিভস্ম নিজ মিশায়েছে অঙ্গে
মাতর্গঙ্গে॥
ধন্য জীবন তব ভূতলচারিনি
যোজন যোজন বর্ত্ম বিহারিনি
কাল মাহাত্ম্যে মা শৃঙ্খলধারিণি
বদ্ধ সুড়ঙ্গে।
নৃত্য করিতে আগে সিংহের অঙ্গে,
কাল-প্রলয়ে মাতঃ সেহ আজি রঙ্গে
সুড়ঙ্গ † দ্বার ধরে বিকট বিভঙ্গে
তব কপালে।
বন্দে গিরিবালে।
মাতঃ শৈলজে তব স্রোত মালে
কে পারে ভুবনে রোধিতে স্ববলে,
ধূর্জ্জটি লজ্জিত বাঁধি জটজালে
বিপুলে।
বন্দে গিরিবালে।
সুন্দর হিমধাম হিমগিরি অঙ্গে,
পদতল-বাহিনি শ্বেত তরঙ্গে;
বেষ্টিত উভতট হিমকূট জালে
বন্দে তরঙ্গিনি গিরিরাজবালে।
বন্দে গিরিবালে॥

---

* মায়াপুর হইতে রুড়কি পর্য্যন্ত "গ্যাঞ্জেস কনালের" সুড়ঙ্গ।

† রুড়কির নিকটে "গ্যাঞ্জেস কেনালের" চারিধারে চারিটী ভীষণ মূর্ত্তি সিংহ স্থাপিত আছে।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ছাত্র। আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ঐ দুইটি কথার অর্থ কি একই রকম?

শিক্ষক। আজকাল ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুই কথাতেই অনেকে একইরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এই দুটি কথায় বড় প্রভেদ আছে, এবং এই প্রভেদটি সকলের জানা আবশ্যক। এই প্রভেদটি বুঝিলে সাংখ্যকার কপিলদেবকে আর কেহ নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বেদান্তশাস্ত্রের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথাটির 'একং' কথাটি যে অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ যে পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নিত্য পদার্থ নাই তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পদার্থটি কি ইহাই অন্বেষণ করা সকল দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জগতে নিত্য পদার্থ এক ব্যতীত আর দুই নাই ইহাই বেদান্তের মত এবং নিত্য পদার্থের নামই ব্রহ্ম। সাংখ্যকার যাঁহাকে পুরুষ বলেন তিনিই ব্রহ্ম। ইনি নির্গুণ; সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন কিন্তু ইঁহার আভা প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। হিন্দুদর্শনশাস্ত্র সকলের মতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই; ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি উভয়েই অনাদি; ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, আর প্রকৃতি অনিত্য পদার্থ, কেননা কালের বশে প্রকৃতির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের কখনও কোন পরিণাম নাই। আমি তোমাকে বিশ্বের সমষ্টি-শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সেই সমষ্টি শক্তিই ব্রহ্ম। এইবারে ঈশ্বর কথাটিতে দার্শনিকগণ কি অর্থ করেন তাহা বলি শুন। যোগী পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের নামই সেশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র; তিনি ঈশ্বর কথাটির এইরূপ অর্থ করেন।

> ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।
> স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥
> প্রণবস্তস্যবাচকঃ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়কর্তৃক যিনি পরামৃষ্ট হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

তিনি জগতের আদিগুরু, কাল কর্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব মন্ত্র সেই ঈশ্বরের বাচক।

এক্ষণে দেখ পাতঞ্জলির ঈশ্বর কথায় জগতের সৃষ্টিকর্তা বুঝায় না। যিনি অজ্ঞান জীবগণের গুরু স্বরূপ, যিনি জীবের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন সেই জগৎগুরুর নাম ঈশ্বর। হিন্দুদর্শনকারগণ বলেন যে অজ্ঞান হইতেই জীবের সৃষ্টি হয় এবং এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়; যাঁহার আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর হয় সেই সূর্য্যস্বরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

সাংখ্যকার কপিলদেবের সাংখ্যক শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে; কিন্তু কেন যে তাঁহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পাতঞ্জলি ঈশ্বর কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, সাংখ্যকারও ঈশ্বর কথার সেইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলেন যে সকল পুরুষ অজ্ঞানমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ছিলেন কিন্তু মুক্ত হইয়া যাঁহারা একাত্মা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে (তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাকে বলাই যুক্তিযুক্ত হয়) ঈশ্বর নাম দেওয়া যায়। ইনি মুক্তাবস্থা-প্রাপ্ত সুতরাং ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয় কর্তৃক অপরামৃষ্ট; সুতরাং পাতঞ্জলি যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন কপিলদেব ঈশ্বর কথাতে সেই অর্থই বুঝিতেন তথাপি তাঁহার শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য কেন বলা হইয়াছে তাহা বলি শুন।

পাতঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন-প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একটি অঙ্গ। কিন্তু কপিলদেব এই কথা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। কপিলদেব বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণের আভা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য মোক্ষের পথ কি তাহা বুঝিতে পারে, চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলে ঈশ্বরের আভা তাহাতে পতিত হইবেই হইবে, সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই মুক্তির পথ দেখিতে পাওয়া যায়; ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত

যে অন্য উপায়ে চিত্ত নির্ম্মল হয় না এ কথা তিনি বলেন না; যোগী পাতঞ্জলিও তাহা বলেন না বটে, তবে পাতঞ্জলির সাধন প্রণালীতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ প্রণবার্থ চিন্তা এবং প্রণব জপ একটি প্রধান অঙ্গ. কপিলের মতানুযায়ী ঈশ্বর প্রণিধানের বেশী দরকার নাই। এই জন্যই কপিলের শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত পক্ষে আসল কথায় সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন।

ঈশ্বর অর্থে জগৎগুরু, আদি গুরু। যখন দেখিবে যে মোক্ষ লাভের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে তখন জানিও যে তোমার চিত্তে ঈশ্বরের আভা পড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বেদান্তশাস্ত্রানুসারে সাধক শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধান এই ষট্ গুণে ভূষিত হইলে তবে তাঁহার মুমুক্ষত্ব জন্মে। যাঁহার এই মুমুক্ষত্ব জন্মে নাই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী নহেন।

যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় তাহার নাম যোগ। এই যোগ আবার প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক অব্যক্তের উপাসনা এবং অন্যটি ঈশ্বরোপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনারই প্রশংসা গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে। অধিকারী ভেদে এক প্রকার উপাসনা অন্য প্রকার উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে

ক্লেশোধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁহারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা অব্যক্তাসক্তচেতা হইলে অধিকতর কষ্ট পান, যাহা ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভিমানীগণের চিত্ত প্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনা দ্বারা তাহারা দুঃখই পাইয়া থাকে। দেখ আমরা এইরূপ দেহাভিমানী লোক সুতরাং আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুরূহ ব্যাপার সেই জন্য ঈশ্বর উপাসনাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত।

হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে জগৎগুরু ঈশ্বর অব্যক্তভাবে সদাই বিরাজমান আছেন কিন্তু অব্যক্তের আভা সাধারণের চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হয় না বলিয়া সময়ে সময়ে কোন দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ জনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস যে ধ্যানীবুদ্ধ সময়ে সময়ে কোন মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া জীবগণের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন। ঈশ্বর যখন এইরূপ কোন দেহাশ্রয়ী হন তখন তিনি ব্যক্তভাবে মনুষ্যজন সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলা যায়। এইরূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের সাহায্যে মোক্ষের পথ অনুসন্ধানের নাম ব্যক্ত উপাসনা।

একটি কথা তোমাকে এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর কোন দেহ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন বলিয়া সেই দেহকে যেন ঈশ্বর বলিয়া বুঝিও না। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইঁহারা ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরাবতার কিন্তু যদি কৃষ্ণ-উপাসক বা বুদ্ধ উপাসক হইতে চাও তবে তাঁহাদের দেহের রূপকেই যেন ঈশ্বর জ্ঞান করিও না! ঈশ্বর, দেবকীপুত্রের শরীরে অবতীর্ণ হইলেও দেবকীপুত্রের মনুষ্যরূপকে ঈশ্বরের রূপ মনে করিও না। দেবকী-পুত্রের বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও। এইটি শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করিতে শিখ তবেই ঈশ্বর তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিবেন, ব্রহ্ম কি পদার্থ তখন বুঝিতে পারিবে।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করা কথাটির অর্থ একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন।

স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি সতত স্মরণ রাখিও, তাহার পর যে অবতারের নামে তোমার সহজেই ভক্তি আসে, তাঁহাকেই গুরু জানিয়া, জ্ঞান উপার্জ্জ-নের চেষ্টা কর ক্রমে সেই গুরুকে বিশ্বরূপ জানিয়া বিশ্বকেই গুরু স্বরূপ

দেখিতে শিখ। যত দিন না গুরুকে বিশ্বব্যাপি বলিয়া অন্তরের প্রত্যয় জন্মিবে ততদিন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয় নাই জানিও।

যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার গুরু। জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; ফলে ফুলে, নদীতে সমুদ্রে, মনুষ্যদেহে মনুষ্যচিত্তে সর্ব্বত্রই আমার গুরু বিদ্যমান আছেন। গাছের ফলটি আমায় শিক্ষা দিয়া থাকে, ফুলটির নিকট হইতে ঢের শিখিতে পারি, একটি পাঁচ মাসের শিশুর নিকট হইতে কত জ্ঞান পাই, যে দিকে দেখি সেই দিকেই সকলে আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যয় চিত্তে জন্মিলে তবেই গুরুদেব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। জ্ঞান লাভের প্রকৃত ইচ্ছা যদি অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে কোন পদার্থই চিত্তের অবলম্বন হউক না তাহা হইতেই সত্য তথ্য কত জানিতে পারা যায়। যখন দুই বৎসরের একটি ছেলের দিকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে চাহিয়া দেখি, তখন সেই দুই বৎসরের ছেলেই আমার গুরু; কেননা তীব্র জ্ঞানলালসাবশতঃ সেই ছেলের দেহেই তখন ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সকলে তাহা দেখিতে পায় না। জ্ঞানলালসার তীব্র সংবেগ উপস্থিত হইলে আমাদের এমন একটি ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হয় যাহার সাহায্যে জগৎগুরু ঈশ্বরকে সর্ব্ব ভূতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই পদার্থকে যখন যে ভাবে দেখিবে তখন উহা সেই অনুযায়ী আকার ধারণ করে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যখন একটি সুপক্ক ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহা তোমার ক্ষুধা শান্তির উপযোগীতা আকার ধারণ করে; আবার যখন জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ঐ ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহাই জ্ঞান-দাতার আকার প্রাপ্ত হয়। জগতে শত্রু নাই, মিত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেহ নাই, কেবল গুরু আছেন এই প্রত্যয় দৃঢ় করিতে চেষ্টা কর তবেই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে শিখিবে। যদি প্রকৃত জ্ঞানলালসা জন্মিয়া থাকে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে তোমার পরম শত্রু যে তোমার শত্রুতা-চরণ করিতেছে, তাহার ভিতর হইতে একজন তোমাকে জ্ঞান দান করিতেছে।

দেখ, আমার গুরুর রূপ তোমাকে বলি শুন। অব্যক্ত ব্রহ্ম আমার গুরুর আত্মা, আদিত্যলীন ঋষিগণ তাঁহার চিত্ত, এই পৃথিবীতে যে সকল

মহাত্মারা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের গুহাভার বহন করিতেছেন তাঁহারা ই তাঁহার মুখ, বৃক্ষলতামনুষ্যসমাকীর্ণ ভূতল তাঁহার দেহ কর্ম্মীগণ তাঁহার হাত ইত্যাদি।

ছা। মহাশয় ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্যাপী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইঁহাদের ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

শি। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগতের হিতসাধন জন্য যে সকল জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্ঞানলাভেচ্ছায় তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দেয়। মানুষ মরে না এটা জানিয়া রাখিও। শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব স্থূল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা আমাদের ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতস্থ হইয়া আছেন। সাধারণ মানুষে, মানুষকে যত ভাল বাসিতে পারে, অন্য কোন পদার্থ কিম্বা অব্যক্ত পদার্থকে তত ভাল বাসিতে পারে না; সেই জন্যই ঈশ্বর সময়ে সময়ে মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া—মোহিনী শক্তি আশ্রয় করিয়া—সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া মনুষ্য বিশেষের প্রতি তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই উন্নত মনুষ্যের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ অমৃতময়ী বাক্য সকল বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন; অবতার বিশেষের প্রতি ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপাসকগণকে ঘৃণা করিও না, বরং অধিকারীভেদে এইরূপ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া জানিও। কেন না

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতেঃ।

কিন্তু একটি কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, যে অবতার বিশেষে মানুষের ভক্তি সহজেই উদয় হয়, তাঁহার মনুষ্য মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার, তিনি জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য অবতার বিশেষের শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। আসল কথা এই যে যাঁহার চিত্তে ঐশ্বরিক আলোকের আভা নির্ম্মলভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাঁহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারা যায়।

ছা। কোন ব্যক্তির চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মলতা পাইয়াছে এবং কোন ব্যক্তির তাহা হয় নাই ইহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

শি। ইহাত তোমায় একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যিনি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মলতা পাইয়াছে। যিনি

ক্লেশশূন্য, যাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম, যিনি সদানন্দ তাঁহারই চিত্ত নির্ম্মলভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিও।

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের প্রথমে নামে ভক্তি স্থাপন করিতে শিখা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবে নামে ভক্তি হইতে জ্ঞান লালসা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন জানিও যে ভক্তির পরিপক্কতা উপস্থিত হইয়াছে; জ্ঞানময়ী ভক্তিই প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি, এই জ্ঞান লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যখন ঈশ্বর তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুজনের সঙ্গ কামনা প্রবল হইবে, যখন সর্ব্বভূতেই গুরুর অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, তখন তোমার ভক্তিবীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে জানিও, ক্রমেই সেই অঙ্কুর হইতে জ্ঞানময় আনন্দময় বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপন্ন হইয়া, চারিদিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া গ্রীষ্মার্ত্তজনকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

ঈশ্বর প্রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জন্মিয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য একটি সুন্দর উপায় বলিতেছি শুন। দেখ যেরূপ ভালবাসাকে সাধারণতঃ প্রেম স্নেহ বা ভক্তি বলা যায়, ঈশ্বর প্রীতি সেরূপ ভালবাসা নহে। প্রীতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে যাহাকে অনুরাগ বলি, দ্বেষ তাহার আনুষঙ্গিক। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই রাগ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দ্বেষকে ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; দ্বেষ যেরূপ ভালবাসার আনুষঙ্গিক সেরূপ ভালবাসা যাহাতে অন্তরে না আসিতে পায় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাতঞ্জলির মতে ঈশ্বর প্রণিধানের আসল উদ্দেশ্যই তাই। যখন ঈশ্বর প্রীতি নিবন্ধন কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব আর থাকে না তখনই প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি জন্মিয়াছে বলা যায়। খ্রীষ্টিয়ান যদি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হন, নিরাকার উপাসক যদি সাকার উপাসকের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হন তবে তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রীতি জন্মায় নাই বলিতে হইবে। যাঁহার অন্তর একেবারে দ্বেষশূন্য হইয়াছে তাঁহাকেই প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত বলিয়া জানিও। যে অনুরাগ হইতে গোঁড়ামী জন্মে সে অনুরাগ ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, গোঁড়ামী জন্মিলেই নিজের মত ছাড়া অন্য মতের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। এই সব কথা বুঝিয়া ঈশ্বর প্রীতি কি পদার্থ তাহা শিখিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরে অনুরাগ এবং গোঁড়ামী ও দ্বেষ ভাবের উপর সমস্ত দ্বেষ রাখিয়া দিয়া, ঈশ্বর প্রীতি শিখিতে চেষ্টা কর।

---o---

সীতারাম।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না, কেন না তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্ত ভাগ হিন্দু সাম্রাজ্য যদি অধিকৃত করিত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিল পরিমিত অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্ত ভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী, পরিত্যক্তা, উদাসিনী। বোধ হয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, নয়ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এই সকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্যস্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোল-যোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন হয় না।

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে

চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তখন সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, "যে রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্য বশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না, তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।"

এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন, মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই, যে শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

কেহ কিছু জানিতে না পারুক, তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষীধর্ম্ম পালন করিয়া সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময়েই সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামির অনাস্থা ও অন্য মন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত; সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত "আর আমাকে ভাল বাসেন না কেন?" নন্দা ভাবিত, "তিনি ভাল বাসুন না বাসুন, ঠাকুর করুন আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।"

শেষে সীতারাম, ভার্য্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন, যে তিনি এপর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেন না দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ, রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ, দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর। সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি বলে ছলে, সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন। সুবেদার বলিতে পারেন, এ বেচারা নিরপরাধী, কিস্তি কিস্তি বিনা ওজর আপত্তি খাজানা দাখিল করে, বকেয়া বাকির ঝঞ্চট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন? তখন মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই, সুবেদারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য তোরাব খাঁ, তাঁহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ—অতি শঠ। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন। যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে, মুরশিদ বলিবেন, নিরপরাধীকে নষ্ট করিলে কেন? যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন, বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন? অতএব তোরাব যাহা হয় একটা করুক, তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাব ও কিছু করিলেন না।

কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে, দেশে সঙ্কুল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ মনুষ্যাধম মুরশিদ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ়

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা মূর্খতা নিবন্ধন সেরাজ উদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুরশিদ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজ উদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।

থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লেখে না। মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধুল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এই খানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে উদ্যোগ কর, বলিবা মাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না। কেন না মুরশিদ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল—যে সাধারণ 'শান্তি রক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। একজন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তি রক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন শিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিগে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে যখন শুনা যাইতেছে যে সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত শিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য শিপাহী সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই একদিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ, বা বেহার, বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কাল বিলম্ব হইল। ততদিন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম, সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে অসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা শিপাহী সংগ্রহ হইতেছে ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন। সীতারামকেও জানাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই সীতারাম দিল্লী যাওয়াব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

অসময় হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে ফৌজদারকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ইহা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে সুবাদার আছে; সুবাদার পরাভূত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে। এমন কোন ভরসা নাই, যে আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব। অতএব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ্য প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন, এক দিন বা এক পুরুষের কাজ নহে। মোগলের রাজ্য একদিনে বা এক পুরুষে স্থাপন হয় নাই। এই অবস্থাতে মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না, তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচ পত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে; কেন না এখন দিল্লীর আমীর ওমরাহ, কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক অনায়াসে এ কাজ সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদিই ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃন্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃন্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী। আর কেবল তাহার বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি

না। আমার এমন ভরসা আছে, যে যত দিন না তুমি ফিরিয়া আস, তত দিন আমি ফৌজদারকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি দুই চারি মাসের জন্য আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি অনেক কল কৌশল জানি।”

এই সকল বাক্যে সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

গমনকালে সীতারাম রাজ্য রক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময়, ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কান্নাকাটি একটু থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল, যে এসময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয়ত, তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয়ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয়ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে একরকম ভালই হইয়াছে। তবে কিনা, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল আর জন্মে দেখিবে।

কই মহম্মদপুরেওত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেওত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াওত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, 'রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন্!,

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শত্রু সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও। আয়, পাশা খেলিবি। তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর একজনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা, আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার একজন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি।"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবাল বৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমান ভয়ে ভীত, কেহই মুসলমানকে ভাল চক্ষে দেখে না—সকলই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে তোরাব খাঁ সম্বাদ পাইলেন যে সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময়ে মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সম্বাদও মহম্মদপুরে পৌছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিশীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুর বাড়ী, কেহ জামাই বাড়ী, কেহ বেহাই বাড়ী, বোনাই বাড়ী, সপরিবারে, ঘটি বাটি সিন্ধুক পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়ৎদার আড়ৎ বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম রায়, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন,

"এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহরত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকে যাইতে দিবে না, যে যাইবে তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানি সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে, কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান ঐ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সম্বাদ পাইবেন, কখন কোন পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে। তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিগে অন্তঃপুরে সম্বাদ পৌছিল, যে তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সম্বাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধূম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিগে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা, তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ

মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ।' তাঁরা যখন বলিতেছেন, ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা আর বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমত সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল "আমি যে হই" তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন করে না। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন, যে আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথা গুলা জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিল "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি তুমি স্ত্রীলোক এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ? আজ কাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে তাহা কি জান না?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে আমি কে?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে আপনি গঙ্গারাম রায় মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না আমিই জানিতাম না যে আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি? ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইবে? না আগুন খাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তার অপেক্ষাও কঠিন কাজ। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেই খানে এখনই যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক সেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া, বলিলেন,

"এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে কি না?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কেমন পাঁড়ে ঠাকুর দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়াছি। এ কে?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিলেন। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাড়ে। পুরুষ মানুষের যাইবার হুকুম নাই।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্? খেংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড় সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,

দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারির ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ; রজত পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

সংসার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর বন্ধুগণ।

পরদিন প্রত্যূষে বিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গন ঝাট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুখুরে বাসন মাজিতেছিলেন এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন সনাতনের স্ত্রী। বিন্দু বাল্যাবস্থায় তাহাকে কৈবর্ত্ত দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই। বলিলেন,

"কি কৈবর্ত্ত দিদি, এত সকালে কি মনে করে? তোর হাতে ও কি লো?"

সনাতনের পত্নী। "না কিছু নয় দিদি; মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধা দিদি চিনি পাতা দৈ বড় ভাল বাসে তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্য এনেছি। সুধা দিদি উঠেছে?"

বিন্দু। "না এখনও উঠে নাই। তা তোরা বোন্ গরিব লোক, রোজ রোজ দুদ দৈ দিস কেন বল দিকি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে ব'ন্?

স-প। "না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুদ বৈত নয়, তা দু এক দিন আন্নুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘর দোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিষ তোমরা খাবে না ত কে খাবে?"

বিন্দু। "তা দে ব'ন, এখন শিকেয় তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত্ত দিদি তুই বেশ দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভাল বাসে। ও কি লো? তোর চোকে জল কেন? তুই কাঁদ্‌চিস্ নাকি?"

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁ হুঁ হুঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অনুরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতন্বঙ্গী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলায় না! যাহা হউক কষ্টে চক্ষুর জল অপনীত হইল, কিন্তু সে ফোয়ারা একবার ছুটিলে থামে না, কৈবর্ত্ত রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁ হুঁ হুঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। "বলি ও কি লো? কাঁদচিস্ কেন লো? সনাতন ভাল আছে ত?"

স-প। "আছে বৈকি, সে মিন্‌সের আবার কবে কি হয়? হুঁ, হুঁ।"

বিন্দু। "তোর ছেলেটি ভাল আছে ত?"

স-প। "তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছা ভাল আছে।"

বিন্দু। "তবে সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌চিস কেন? কি হয়েছে কি?"

স-প। "এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিছনু গো তা সেখানে—উঁ হুঁ হুঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গাল দিয়েছে ?”

স-প। “না গাল দেবে কে গা দিদি ? কারউ কিছু খাই না কারউ কিছু ধারি যে গাল দেবে। তেমন ঘর করিনি গো দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিন্‌সে পোড়ামুখো হোক্, হতভাগা হোক্ গতর খেটে খায়, আমাকে খেতে পরতে দিতে পারে, আমরা গরিব গুরবো নোক কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি ?”

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামী-ভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিলেন, বলিলেন—

“তা তাইত ব’ন জিগ্‌গেস করচি, তবে তুই কাঁদচিস কেন ? সনাতন কিছু বলেছে নাকি ?”

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুটী ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে যে কথা গুলি উচ্চারিত হইল তাহার মধ্যে এই মাত্র বোধগম্য হইল—

“ডেক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, সে আবার বল্‌বে ! তার প্রাণের ভয় নেই ? কোন্ মুখে বল্‌বে ? তার ঘর কর্‌চে কে ? সংসার চালিয়ে নিচ্চে কে ? আমি না থাক্‌লে সে কোন্ চুলোয় যেত ? বল্‌বে ! প্রাণে ভয় নেই”—ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হাস্য সম্বরণ করিয়া একটু তীব্র স্বরে বলিলেন,

“তবে তুই সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেলচিস কেন বলতো ? তোর হয়েছে কি ?”

স-প। “না দিদি কিছু নয়, কিছু হয় নি, তবে ঘোষেদের বাড়ী আজ সকালে শুন্‌লুম, উঁ, হুঁ হুঁ।”

বিন্দু। “নে, তোর নেকরা করতে হয় কর ব’ন, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি, আমার বাসন কোসন সব মাজতে পড়ে রয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটী উঠ্‌লেই দুধ চাইবে।”

এইরূপ কথা হইতে হইতে সুধা প্রাতঃকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রঞ্জিত বদনে, চক্ষু দুটী মুছিতে মুছিতে শয়ন ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বলিলেন—

"এই যে সুধা উঠেছে, এত সকালে যে ?"

সুধা। "দিদি আজ খুব সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখিলাম, সেজন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

বিন্দু। কি স্বপ্ন ?"

সুধা "বোধ হোলো যেন আমরা ছেলেবেলার মত আবার শরৎ বাবুর বাড়ী পেয়ারা খেতে গিয়াছি। যেন তুমি পেড়ে পেড়ে খাচ্চ, আর শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়ারা পাড়িয়া দিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন, আমিও পড়ে গেলুম। উঃ এমনি লেগেছে।"

বিন্দু। "সে কি লো! স্বপ্নে পড়িয়া গেলে কি লাগে ?"

সুধা। "হেঁ দিদি, বোধ হল যেন বড় লেগেছে, শরৎ বাবু যেন গাছ-তলায় সেই গর্ত্তটাতে পড়ে গেলেন।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আহা! এমন দুরবস্থা! আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পায়ে বেথা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করিব এখন! পা টা ভেঙ্গে যায়নি ত ?"

সুধা। "না দিদি ভেঙ্গে যায়নি।"

বিন্দু। "তুমি কেমন করে জানলে।"

সুধা। "আবার যে তখনই উঠিয়া আবার আমাকে নিয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগ্‌লেন।"

বিন্দু উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "সাবাস ছেলে বাবু! আজ তাঁকে তাঁহার গুণের কথা বলিব এখন।"

হাস্য সম্বরণ করিয়া পরে বলিলেন, "সুধা, কৈবর্ত্তদিদি তোমার জন্য আজ চিনিপাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে এখন। দৈখানা শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে এসত ব'ন। আর যখন উঠেছ, ঘাটে খানকত বাসন আছে মেজে নিয়ে এসত ব'ন। আমি উনুন ধরাইগে, এখনই ছেলেরা উঠবে।"

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হাস্যবদনে ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্নাঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়

কৈবর্ত্তপত্নী আর একবার চক্ষুর জল অপনয়ন করিয়া একবার গলা সাড়া দিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"বলি দিদিঠাকরুণ, কথাটা কি সত্তি ?"

বিন্দু। "কি কথা লো ?"

স-প। "এ যা শুনলুম ?"

বিন্দু। "কি শুনলি রে ?"

স-প। "তবে বুঝি সত্তি। আহা এতদিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়"—এবার অবারিত ক্রন্দনের রোল উঠিল, কৈবর্ত্ত সুন্দরীর সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীর-খানি—যাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও সশঙ্কচিত্তে পুজা করিতেন,—সেই শরীরখানি ক্রন্দনের বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, ঈষৎ ভূমিকম্প তিনি বোধ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কৈবর্ত্ত সুন্দরীর তারস্বর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন নিদ্রা আর অসম্ভব। তিনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন,

"বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

বিন্দু। "ও কেউ নয়, কৈবর্ত্তদিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে তাই মনের দুঃখে কাঁদচে ?"

হেমচন্দ্র বলিলেন "কেও সনাতনের স্ত্রী, কেন কি হয়েছে গা, বাড়ীতে কোনও অমঙ্গল হয়নি ত, কোনও ব্যারাম সেরাম হয়নি ত ?"

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া, কাপড়খানি টানিয়া কষ্টে স্বষ্টে কোনও রকমে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া, টিপ্‌ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া, আবার গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া, আবার চক্ষুর জল মুছিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন,

"না গো কিছু অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুনিলাম তাহা দিদি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

বিন্দু। "আর সেই কথাটা কি আমি এক দণ্ড থেকে বার করতে পারলুম না! তুমি পার ত কর।"

হেম। "না মেয়ে মানুষদের কথা মেয়ে মানুষেই বুঝে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। "ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনিয়েছি তাই ঠিক!"

বিন্দু। "বলি তোকে আজ কিছু পেয়েছে নাকি, তুই অমন করচিস কেন, আবার কান্না, কেন কি শুনেছিস বল না।"

স-প। "ঐ যে শরৎ বাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুনমু।"

বিন্দু। "কি শুনলি।"

স প। "তবে বলি দিদি ঠাকরুন, গরিবের কথায় রাগ করো না,। সত্যি মিথ্যে জানি নি, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর চাকর মিন্‌সে, আমাকে বল্লে, মিন্‌সের মুখে আগুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করচে, দিদি-ঠাকরুণ একবার হাত দিয়ে দেখ।"

বিন্দু। "আমার দেখবার সময় নেই আমি কাজে যাই" বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত্তবধূ বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল, "না দিদি রাগ করিও না, তোমাদের জন্য মনটা কেমন করে তাই এনু, না হলে কি অন্যের জন্যে আসতুম, তা নয়, আহা সুধাদিদিকে এক দিন না দেখলে আমার মনটা কেমন করে। (বিন্দুর পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ।) না না বলছিনু কি, বলি ঐ ঘোষেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিন্‌সে বল্লে কি,—তার মুখে আগুন, তার বেটার মুখে আগুন, তার বৌয়ের মুখে আগুন, তার বাড়ীতে যেন ঘুঘু চরে। (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন।) না না বলছিনু কি, সেই মিন্‌সে বল্লে কি, উঃ এমন কথা কি মুখে আনে গা, এও কি হয় গা, তোমাদের শরীরে মায়া দয়া ও ত আছে। (বিন্দুর রান্নাঘরের ভিতর গমন, সনাতন পত্নীর পশ্চাদ্গমন ও দ্বারদেশে উপবেশন।) না না বলেছিনু কি, সেই হতভাগা চাকর মিনসে বল্লে কি না, দিদিঠাকরুণ তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কলকেতার

চলে যাচ্চ? আহা দিদিঠাকরুণ তোমাকে ছেলেবেলা মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না? সুধাদিদি আমাকে এত ভাল বাসে, সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গা?"—রোদন।

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"হে লা কৈবর্ত্তদিদি এই কথা বল্‌তে এই এতক্ষণ থেকে এমন করছিলি? তা কাঁদিস কেন বল, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয় নাই, কেবল শরৎ বাবু কথায় কথায় কাল বলেছিলেন মাত্র। তা আমাদের কি যাওয়া হবে? সেখানে বিস্তর খরচ।"

স-প। "ছি! দিদি সেখানেও যায়। শুনেছি কলকেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত বিচার নেই, হিঁদু মুচুনমানে বিচার নেই—সে দেশেও যায়। তোমাদের সোণার সংসার এখানে বসে রাজ্জি কর। শরৎ বাবুর কি বল না, ওঁর মাগ নেই ছেলে নেই, উনি কালেজে পড়েন, দিদিঠাকরুণ! কালেজের ছেলে সব কর্‌তে পারে। শুনেছি নাকি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ওমা! তারা ত জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা সাগরের গপ্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়। শুনেছি নাকি নঙ্কায় যেতে হয়"।

বিন্দু। "হেঁ লো কত সাগর পার হয়ে তবে বিলেত যায়। শুনেছি লঙ্কা পেরিয়েও অনেকদূর যায়।"

স প। "ও বাবা, সে গঙ্গাসাগরের যে ঢেউ শুনেছি তাতে কি আর মানুষ বাঁচে? তা নঙ্কা থেকে কি আর মানুষ ফিরে আসে তারা রাক্কস হয়ে আসে, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কায নেই, কলকেতা গিয়েও কাজ নেই—তোমরা ঘরের নক্ষী ঘরে থাক। তবে এখন আমি আসি দিদি।"

বিন্দু দুধ জ্বাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এস ব'ন।"

স-প। আর দৈখানি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো। আর সুধাদিদি কি বলে বলো।"

বিন্দু। "বলবো দিদি, বলবো।"

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কলকেতায় যাবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো করে থেক।"

বিন্দু। "তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নাই, যদি যাওয়া হয় তবে কয়েক মাসের জন্য, আবার ধান কাটার সময় আসিব। আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া জমি ঘর ছাড়িয়া, কোথায় গিয়া থাকিব?"

কৈবর্ত্ত-বধূ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল কি অদ্য প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে ছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের অধিকাংশ সুখ দুঃখের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র, প্রথম সূর্য্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গনে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল!

সেই দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধূ বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা জমি ছিল, বাড়িতে অনেক গুলি গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ বেচিয়া সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধূকে লইয়া সে জমা জমি দেখিতে পারিল না, অন্য কাহাকে কোরফা জমা দিল, যাহা খাজনা পাইল সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটী আছে মাত্র, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া উদর পূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ সর্ব্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যারামের সময় যথা সাধ্য সংসারের কায করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফসল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু ধান্য পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন মিস্রি, কখন দুই একটী সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব

লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদ আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্বাস বাক্যতে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভাল বাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্না কাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, এবং তাহার পুত্রবধূকে একখানি পুরাতন সাড়ী দিয়া ঘরে পাঠাইলেন।

হরিমতি প্রস্থান করিলে তাঁতিদের একটী বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি বৌ দেখিতে কাল, তাহার স্বামী তাকে ভাল বাসিত না, এবং অতিশয় কাহিল, কায কর্ম্ম করিতে পারিত না, সে জন্য শাশুড়ীর নিকট সর্ব্বদাই গালি খাইত। গত শীতকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্য তাহার শাশুড়ী প্রহার করিয়া ছিল। তাঁতি বৌ কাহার কাছে যাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে তাঁতি বৌকে ঔষধি কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেরোসিনের তেল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি বৌকে রোদে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি বৌ গৃহ কার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভাল বাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি বৌ না যাইতে যাইতে বাউরী পাড়া হইতে হীরা বাউরিনী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পালকী বয়, বেশ রোজকার করে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করিত। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন; সেই অবধি হেম বাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জেঠামহাশয়ের ভয়ে বাউরীর অত্যাচার কিছু কমিল, হীরা ও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটীকে নূতন একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে আনিয়া বলিল "মাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্ব্বাদে হাতে ২।৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ঘরের চালে খড় পড়েনি এবার চাল নূতন করে ছাইয়াছি, আর বাছার জন্যে কাটওয়া থেকে এই নূতন কাপড় কিনেছি।" বিন্দু শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার পর গ্রামের শশি ঠাকুরুণ, বামা সদ্‌গোপনী, শ্যামা আগুরিনী, মহামায়া গোবানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদের বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেরই বিন্দু অপেক্ষা দুপয়সা অধিক আয় আছে, ভরসা করি আমরা যখন একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, আমাদের জন্যও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব তখন যেন দুই একটি পরোপকারের পরিচয় দিয়া যাইতে পারিব, কেবল ঈর্ষা, পরনিন্দা, এবং পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা "বড় লোক হইয়াছি" এই আখ্যানটি রাখিয়া যাইব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাল্যসহচরীগণ।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জেঠাইমার বাড়ীতে গেলেন, এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়াছেন কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিন পর তাঁহাদিগের পরস্পরে দেখা হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকালের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ দুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল যাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শান্ত শুষ্ক বদনে ও নয়নদ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে,

শীর্ণ হস্তে দুইগাছি ফাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটী মাদুলি। তাঁহার বস্ত্র খানি সামান্য, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটী খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, শ্বশুর বাড়ীর কার্য কর্ম্ম করিত, দুইবেলা দুইপেট খাইত, কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকিত।

বিন্দু বলিলেন, "কালী, আজ কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হইল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?"

কালী। "বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে, বে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্দ্ধমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?"

উমা। "কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমি ত প্রতিবার পূজার সময় আসি"।

কালী। "তা তোমাদের কি বল বন, তোমাদের ঢের লোকজন আছে, কায কর্ম্মের ঝন্‌ঝট নেই, পাল্কী করে চলে এলেই হল। আমাদের ত তা নয়, বিস্তর সংসার, অনেক কায কর্ম্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকর দাসী রাখা প্রথা নেই। সুতরাং আমরা কেউ আসিলে কায চল্‌বে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাযগুলি কত্তে বলে এসেছি। তা দু পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?"

বিন্দু। "তোমাদের জমিদারির শুনেছি অনেক আয়, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী ঘোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর দাসী রাখেন না কেন?"

কালী। "না দিদি আয় জেয়দা নাই, খরচ শুনেছি বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েছে শুনেছি,—তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ও সব কথা ঠিক জানিনি। আমাদের একখানা বাগান বাড়ী আছে, বাবু সেইখানেই থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কায কর্ম্মের কি জানবেন্? আমার শাশুড়ীরাই কায কর্ম্ম দেখেন শুনেন। ঝি রাখ্‌বেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি কিছু ছুঁতে আছে? সুতরাং বৌয়েদেরই সব কত্তে হয়।"

বিন্দু। "তা তোমাদের ধার টার হয়েছে বন, তা খরচ একটু কমাও

না কেন? শুনেছি তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা টানা দেন, অনেক গাড়ী ঘোড়া রাখেন,—তা এ সব গুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আয় তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?”

কালী। “ওমা তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিষয় কর্ম্ম বুঝেন, আমি বৌ মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তাঁকে এ কথা বলবো গা? তবে কখন কখন যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন, আমার খুড়-শাশুড়ীরা তাঁকে ঐরকম কথা দুই একবার বলেছিলেন শুনিছি।”

বিন্দু। “তা তিনি কি বলেন?”

কালী। “বলেন আমাদের ভারি বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্য্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদি বড়মানুষ বংশ বলিয়া তেমনি মর্য্যাদা, তা সাহেবদের খানা টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি সাহেবরাও তাঁকে বড় ভাল বাসেন, এই যে কত “কমিটী” বলে না কি বলে, বর্দ্ধমানে যত আছে, বাবু সবেতেই আছেন। আর এই রোগা শরীর তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী দুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব মহলে নাকি তাঁর ভারি মান।”

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামী-গৌরব বর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ভ্রূকুটী করিলেন।

বিন্দু। “আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?”

কালী। “আমার শাশুড়ী ত নেই, সুতরাং আমার তিন জন খুড়শাশুড়ী-রাই গিন্নী। বড় যে সে ভাল মানুষ, প্রায় কোনও কথায় থাকে না, মেজই কিছু রাগী, সকলেই তাকে ভয় করে, বৌরা ত দেখলে কাঁপে। আহা সে দিন আমার খুড়তুতো ছোট জা রান্নাঘর থেকে কড়া করে দুদ আনতে পড়ে গিয়েছিল, গরম-দুদে তার গায়ের ছাল চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার যত কষ্ট না হয়েছিল শাশুড়ির ভয়ে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজ খুড়শাশুড়ি ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনলে কে দুদ অপচয় হ’য়েছে—অমনি মুড়ো খেঙরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আহা এমনি বকুনি বকলে, বাপ মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হল। আহা কচি মেয়ে দশ বছর মাত্র বয়েস, ভয়ে তিন দিন ভাল করে ভাত খেতে পারে নি।”

উমা। "তা তোমাকেও অমনি করে বকে?"

কালী। "তা বক্‌বে না, দোষ করলেই, বক্‌বে, তা না হলে কি সংসার চলে?"

উমা। "তোমাকে যখন বকে তুমি কি কর?"

কালী। "চুপ করে কাঁদি, আর কি করবো বল?"

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা আমার গায়ে সহ্য হয় না।"

কালী। "তা হেঁ বিন্দুদিদি শ্বশুর বাড়ীতে কেউ গাল দিলে আর কি করবে বল? একটী কথার জবাব দিলে আর পাঁচটী কথা শুন্‌তে হয়। তা কায কি বাবু, শাশুড়ীই হউক আর ননদই হউক, কেউ দুট কথা বলে, চুপ করে থাকি, আবার তখনই ভুলে যাই। কথাত আর গায়ে ফোটে না, কি বল বিন্দু দিদি?"

বিন্দু। "তা বেস কর বন্, কথা বরদাস্ত কত্তে পারলেই ভাল, তবে সকলের কি আর বরদাস্ত হয়, তা নয়। আচ্ছা, তোমার ছোট খুড়্‌শাশুড়ীও শুনিছি নাকি রাগী?"

কালী। "হ্যাঁ রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে ত আর পারে না, রাগ ক'রে দু একটা কথা বলে আপনার ঘরের ভিতর খিল দিয়া থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনিয়ে দেয়। আবার মেজোর কিছু টাকা আছে কি না, সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়, ছেলেদের শিকিয়ে দেয় ছোটর ঘরে বোসে খেগে যা। তারা ছোটর ঘরে বোসে খায়, ছোটর ছেলেরা খেতে পায় না, ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দ্দমা তয়ের করেছে। ছোট কত ঝগড়া করলে, আমার ছোট দেওর আপনি বাবুর কাছে নালিশ করতে গেলেন, বাবুও নিজে এক দিন বাড়ী আসিয়া তাঁর মেজ খুড়ীকে বুঝাইতে গেলেন, তা সে কথা কি সে শুনে? মেজোর বকুনি শুনে বাবু ফের গাড়ী করে বাগানে পালিয়া গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে মজুরদের দিয়ে সেই নর্দ্দামাটী করালেন তবে সে দিন রাত্রিতে জল গ্রহণ করলেন।"

উমা। "সবাস মেয়ে যা হউক।"

কালী। "বলবো কি উমা, বাড়ীতে যে ঝগড়া কোঁদল হয় তাতে ভূত ছেড়ে পালায়। তবে আমাদের সয়ে গিয়েছে, গায়ে লাগে না। আর আমি কারউ কথায় নেই, যে যা বলে চুপ করে থাকি, আবার ভুলে যাই, আমার কি বল?"

বিন্দু। "কালী, তোমার খুড়্শাশুড়ীরা ত সব বিধবা। তাদের বয়েস কত হয়েছে?"

কালী। "বয়েস বড় বেয়াদা নয়, বাবুর বয়স আর আমার বড় খুড়-শাশুড়ীর বয়স এক, মেজ আর ছোট বাবুর চেয়ে বয়সে ৫। ৭ বছরের ছোট। আমার শ্বশুর বাপের বড় ছেলে ছিলেন, তিনি আজ যদি থাকতেন তাঁর ৭০ বৎসর বয়স হত। তা তিনি হবার পর প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর আর কেউ হয় নাই, তার পর তাঁর তিনটী ভাই হয়। তাই আমার শাশুড়ীর যখন প্রায় ৩০ বৎসর বয়স, তখন আমার খুড়শাশুড়িরা ছোট ছোট বৌ ছিল, নতুন বে হয়েছে। তারই দুই এক বছর পর বাবুর প্রথম বে হয়।"

উমা। আর কালীদিদি, তোমার পিশ্শাশুড়ীও ঐ বাড়ীতেই থাকে না?"

কালী। হাঁ থাকে বৈকি, দুই পিশ্শাশুড়ী, আর একজন মাশ্শাশুড়ী আছেন; তাঁরা তিনজনই বিধবা, তাঁদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীশাশুড়ীও আছেন, তিনি সধবা, কিন্তু তাঁর স্বামী পূব দেশে পদ্মাপারে চাকরী কত্তে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, সুতরাং মামী দুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে ছেলেদের বে হয়, আজ তিন চার বছর হল।"

উমা। "সে ছেলে দুটী কেমন, লেখাপড়া শিখেছে?"

কালী। "ছোট ছেলেটী ভাল, ইস্কুলে লেখাপড়া করে, বড়টা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাবু সাহেবদের বোলে তাকে কি কায করে দিয়াছিলেন, তা সে আবার কতকগুলা টাকা নিয়ে পালায়। সবাই বল্লে ছেলেটাকে সাহেবরা জেলে দেবে, কিন্তু বাবু সাহেবদের অনেক বলে কয়ে ঘর থেকে লোকসান পুরণ করিয়া ছেলেটাকে রক্ষা করেন। ছেলেটা

বাড়ী থাকে না, রোজ মদ খায়, শুনেছি নাকি গাঁজাও খেতে শিখেছে, যখন বাড়ী আসে পয়সার জন্য বৌকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়. বৌয়ের কান্না শুনে আমাদেরও কান্না পায়। তা বৌ পয়সা কোথা থেকে পাবে দুই একখানা গয়না টয়না বাঁধা রেখে দেয়, তা না হলে কি তার প্রাণ থাক্‌তো?"

উমা। "উঃ তবে তোমাদের মস্ত সংসার।"

কালী। "তাইত বল্‌ছিলুম উমা তোমরা বড় মানুষের ঘরের বৌ, তিনটী জা তিনটী ঘরে থাক, শাশুড়ী রান্না বান্না দেখেন, তোমরা কাযের ঝন্‌ঝট্‌ কি বুঝ্‌বে বল? তোমার দেওর দুজন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকেতায় গিয়েছেন?"

উমা। "হেঁ তিনি এক বৎসর হইতে কলকেতায় আছেন, আমাকেও কলকেতায় নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও বলেছেন এই জষ্টি কি আষাঢ় মাসে পাঠিয়ে দিবেন"।

কালী। "হেঁ শরৎ বল্‌ছিল তোমার স্বামী নাকি কোন্‌ বড় রাস্তার উপর মস্ত বাড়ী নিয়াছেন, অনেক টাকা খরচ করিয়া সাজাইয়াছেন; তাঁর নাকি সুন্দর সাদা ঘোড়ার এক জুড়ি আর কালা ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন গাড়ী ঘোড়া রাজা রাজড়াদেরও নাই। আবার নাকি কলকেতার বাইরে বড় বাগান কিনিবার কথা চলিতেছে, সেই বাগানও নাকি ইন্দ্রপুরী, তেমন ফল, তেমন ফুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্ব্বেলের মেজেওলা ঘর কলকেতায়ও কম আছে। উমা তুমি বড় সুখে থাকিবে"।

উমার বিম্ববিনিন্দিত সুন্দর সূক্ষ্ম ওষ্ঠে একটু হাস্য কণা দেখা গেল, উজ্জ্বল নয়ন দ্বয়ে যেন একটু ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কালীদিদি, যদি সাদা জুড়ী আর কাল জুড়ী আর মার্ব্বেলের ঘর হইলে সুখ হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু কপালের কথা কে বলিতে পারে?" সূক্ষ্মদর্শী বিন্দু দেখিলেন উমা ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পর উমা আবার বলিলেন "বিন্দুদিদি! আমাদের ছেলে বেলা এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল মনে পড়ে, সে আমাদের হাত দেখিয়াছিল মনে পড়ে"?

বিন্দু। "কৈ মনে পড়ে না"?

উমা। "সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে বড় তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে"!

কালী। "কৈ না, আমারও মনে নাই"।

উমা। "তবে বুঝি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল তাই আমার মনে আছে। ঠিক বার বৎসর হইল, এই বৈশাখ মাসে এক দিন এমনি সন্ধ্যার সময় এই খানে খেলা কর্‌ছিলুম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলটার ভিতর হইতে বাহির হয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগলুম, কিন্তু সন্ন্যাসীটা কাছে আসিয়া বলিল, "ভয় নেই তোমরা পয়সা নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখ্‌ব"। আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পয়সা পেয়েছিলুম ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলুম। তখন সন্ন্যাসী খুসি হয়ে হাত দেখিয়া বল্লে 'মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেবোনা"। তখন কালী ও হাত দেখাইবার জন্য বাড়ী থেকে একটা পয়সা এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটী নিয়ে বল্লে "তোমার ধন টন হবে না, ভাল বংশের বৌ হবে"।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন "আর জটাধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করিলেন"?

উমা। "তাই বলছি। তোমার মা ঘাটে গিয়াছিল, এবং তাঁর কাছে পয়সা টয়সা বড় থাকিত না, সুতরাং তুমি শুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী রেগে গিয়ে বলিল 'মা তুমি আর কেন ওদের সঙ্গে আস্‌চ, তোমার ধন ও নেই, বংশ ও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে, আর কি"!

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিল ত। সন্ন্যাসীর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"!

উমা। "বিন্দু দিদি এখন তাই বল্‌ছ, তখন তা বলোনি, তখন তুমি কাঁদ্‌তে লাগিলে। তোমার মা পুখুর হইতে জল আনিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। তখন আঁচল দিয়ে তোমার চোখের জল

মুছিয়া বলিলেন "তা হোক বাছা, বেঁচে থাক্ যে যা হউক, চির-এইস্ত্রী হয়ে থাকিস, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস। বাছা ধন কুলে সুখ হয় না, ধন কুলে তোর কায নেই।" বিন্দু দিদির সেই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হইলেই যদি সুখ হইত তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকিত না"।

বিন্দু। ও কি ও উমা, তুমি ছেলেবেলা কার একটা কথা মনে করে চখের জল ফেলছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাববে, তবে আমরা কি করব"।

উমা। "না দিদি আমার কষ্ট কিছুই নাই, আমার কষ্ট আছে বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি না। কিন্তু জানিনি কেন এই কলিকাতায় যাব বলিয়া কয়েক দিন থেকে মনে অনেক সময় অনেক রূপ ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবান্‌ই জানেন। তা বিন্দু দিদি, তুমিও কলকেতায় যাচ্চ, আর কালীদিদি বর্দ্ধমানে আছেন সেও কলকেতা থেকে শুনেছি ৩।৪ ঘণ্টার পথ; আমরা ছেলে বেলা যেমন তিন বনের মত ছিলুম যেন চির কাল সেইরূপ থাকি, আপদ বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভগ্নীর মত জ্ঞান করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করি"।

উমার সহসা মনের বিকার দেখিয়া বিন্দু ও কালীর মনও একটু বিচলিত হইল, তাঁহারা আঁচল দিয়া উমার চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পর হেমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রার পুর্ব্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল আত্মীয়া কুটুম্বিনী ও

বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তালপুকুরে সেদিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যুষে বিন্দু আর একবার জেঠাইমার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিন্দুর জেঠাইমা বিন্দুকে সত্যই স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিলেন, বলিলেন,

"বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের মত, আমার উমাও যে বিন্দু সুধাও সে, আহা তোদের হাতে করে মানুষ করেছি, তোদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে। তা যা বাছা যা, ভগবান্ করুন, হেমের কলকেতায় একটী চাকুরি হউক, তোরা বেঁচেবর্ত্তে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়বে। বাছা উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাকেও নাকি কলকেতায় নিয়ে যাবে, এই জষ্টিমাসে নিয়ে যাবে বলে আমার জামাই পেড়াপিড়ি কচ্ছে। সে নাকি শুনলুম কলকেতায় নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে, গাড়ী ঘোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শরৎ সে দিন বলেছিল তেমন গাড়ী ঘোড়া নাকি সহরে নেই। তা ধনপুরের জমিদারের ঝাড় হবে না কেন বল? অমন টাকা, অমন বড়মানুষি চালচোল ত আর কোথাও নেই। ঐ ও মাসে আমি একবার বেনের বাড়ী গিয়েছিলুম, বুঝলে কিনা, তা এই নীচে থেকে আর তেতোলা পর্য্যন্ত সব বেলওয়ারীর ঝাড় টাঙ্গিয়েছে। আর লোক, জন, জিনিস পত্র সে আর কি বলব। সে দিন প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে খাইয়াছিল, বুঝলে কি না, তা সবাইকে রূপর থাল, রূপর রেকাবী, রূপর গেলাস, রূপর বাটী দিয়েছিল! আর আমার বেনের কথাবাত্রাই বা কেমন। তারা ভারি বড় মানুষ, তাদের রীতিই আলাদা। এই আমার জামাইও শুনেছি নতুন বাড়ী করে খুব সাজিয়েছে, ঝাড়, লণ্ঠন, দেলগিরি, গালচে, মকমলের চাদর, বুঝলে কিনা, আর কত সোণা, রূপ, সাদা পাথরের সামগ্রী তার গোণাগুন্তি করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখবে বাছা, আমি চখে দেখিনি, তবে কলকেতা থেকে একজন লোক এসেছিল সেই বল্লে যে * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক, আমার উমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, দুটি বনের মত থেকো। আহা বাছা তোদের নিয়েই আমার ঘরকন্না,

তোদের না দেখে কেমন করে থাকবো। (রোদন) তা যা বাছা, বাছা উমাও শীগ্‌গির যাবে, তার সঙ্গে দেখা করিস, না হয় তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন কত রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়, শুনিছি সে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর দরজা, বুঝলে কি না * *, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার শরতের মার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাইয়া অবধি তাহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকিতেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটী ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বামনী রাখিবার কথায় শরতের মাতা কোনও প্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটী প্রশস্ত, বাহির বাটীতে একটী পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেই খানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতরও দুই তিনটী পাকা ঘর ছিল আর একটী খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটী মধ্যমাকৃতি পুখুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর আর শরীরের যত্ন লইতেন না, সুতরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে কি গ্রীষ্মে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, এবং একখানি নামাবলি ভিন্ন অন্য উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আহ্নিক করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে, ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল এবং মাথার চুল অনেকগুলি শুক্ল হইয়াছিল, এবং অকালে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত দিন দেব আরাধনায় ও পরমাত্মিক চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, এবং কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান্ ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র ও বিন্দু ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, “যাও বাছা, ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হউক, এইটী চক্ষে দেখিয়া যাই, আমার এ বয়সে আর কোনও

বাছা নাই। দেখিস বাছা শরৎ, এদের খাওয়া দাওয়ায় কোনও কষ্ট না হয়, বিন্দুর দুটী ছেলের যেন কোনও কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।”

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধব্য যাতনা জানিতেন, এই জ্ঞানশূন্যা অল্পবয়স্কা বালিকাকে ভগবান্ কেন সে যন্ত্রণা দিলেন?

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতায় যাইয়া অতি সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় লইলেন। শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “মা, তোমার কথা গুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হইব সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।”

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্য হৃদয়ে সেই পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন সনাতন কৈবর্ত্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে আপন জমিখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ সনাতন সজল নয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনি পাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক বারণ করিল, কিন্তু কৈবর্ত্ত পত্নী তাহা শুনিল না, বলিল গাড়ীতে যদি জায়গা না হয় আমি হাতে করে বর্দ্ধমানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত দিয়া আসিব। সুতরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে নিয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া যাইতেই পছন্দ করিলেন। গরুর গাড়ী বড় আস্তে আস্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটী দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন, এবং তথায় রাঁধা বাড়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে কাছে বড় সুন্দর খাজা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎ

বাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা দিয়া সুধা শেষবার তালপুকুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইলেন।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটী অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠরী লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বণিকসম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অল্পব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবলশরীর বহুশ্রমী কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকুরির জন্য কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী পুত্র বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন; বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্ব্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মথুরা বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটীর পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাহাদিগের সম্মুখে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকুরি করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেহ বা মুমূর্ষু আত্মীয় বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য, কেহ ধন মান, পদ বা যশঃ লিপ্সায়, কেহ বা জীবনের শায়াহ্নে কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম্মদেবীর একটী প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির আগমন পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল। শরৎ একখানি গাড়ী করিলেন, এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবক্ষে গৃহতুল্য অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অপর পার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চিনাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল, তথায় শরতের কিছু কাপড় চোপড় কিনিতে ছিল তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল। বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুখুর হইতে বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা তিনতল দোকানে পথ প্রায় অধিকার করিয়াছে। কত দেশের কত প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, বিলাতি থান, দেশী কাপড়, বারাণসী সাটী, বম্বের কাপড়, মশলী-পত্তনের ছিট, ফ্রান্সের সাটীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা স্থানের গালিচা চাদর ছিট, পরদা ও সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে, খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা, সারি সারি খাবারের দোকানে এখনও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে. পুস্তকের দোকানে পুস্তক শ্রেণী। শিল, যাহা একখানা কিনিলে গৃহস্থের তিনপুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখিলেন, লোহার কড়া বেড়ী ঝাঁঝরি প্রভৃতি দ্রব্যতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কোথাও চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছে। কাঁচের দোকানে ঝাড়, লণ্ঠন, পাত্র, গেলাস, খেলানা, লেম্প প্রভৃতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কাষ্ঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ দ্রব্যাদি পালিস করি-তেছে, ছবির দোকানে কড়িকাট ও দেয়াল ছবিপূর্ণ, বাক্সের দোকানে কাঠের বাক্স, টিনের বাক্স, চামড়ার বাক্স, লোহার বাক্স, কত প্রকার দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য দেখিলেন তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন না। লোক জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী চলিতে পারে না, মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারি দিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ,

খরিদারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চিৎকার ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একি বিশাল মনুষ্য সমুদ্র! এত লোক কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়। অদ্য তালপুখুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্য-সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহানগরীর কোনও নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চিনাবাজার হইতে বাহির হইয়া লালদিঘির নিকট গিয়া পড়িল, তথায় যাইবার সময় তিনি প্রাসাদ তুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সকল দোকান কাপড়-ওয়ালার দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা এক্ষণে ভারত-সমাজের নিম্নস্তর, জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের প্রধান হেতু!

বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী-তুল্য চৌরঙ্গিতে দীপালোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, এক্ষণ মর্ত্ত্যে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা বরুশ, ফেটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডন গার্ডেনে সমাগত হইতেছে। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান-ক্ষমতার অধীন হইয়া নর নারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে! ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুখুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট সুপ্ত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শরৎ বড় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটী ধারণ করিয়া নিস্তব্ধে পথ ও হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তব্ধ তালপুখুর ত্যাগ করিয়া তিনি অদ্য এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সদাচঞ্চল মনুষ্য সমুদ্রের কোনও নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।
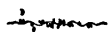
কলিকাতার বড় বাজার।

বিন্দু। 'ও সুধা, সুধা, একবার এদিকে এসত বন

সুধা। "কি দিদি, আমাকে ডাক্‌ছ?

বিন্দু। "হে বন, ঐ কাপড় কখানা কেচে রেখেছি, ছাতের উপর শুকুতে দাও ত। আমি কুয়ো থেকে দু কলসী জল তুলে শিগ্‌গির নেয়ে নি; রোদ উঠেছে, এখনি গয়লানী দুদ আনবে, উনুন ধরাতে হবে। কলকেতার কুয়োর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়াগেঁয়ে পুখুর ভাল, বেশ নেবে স্নান করা যায়। আর কুয়োর জলে কেমন একটা গন্ধ।"

সুধা হাসিয়া বলিল "তোমার বুঝি কলকেতার সবই খারাব লাগে? কেন কল্‌কেতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি খাবার জন্যে এক কলসী করে আনে, সে যেন কাগের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।"

বিন্দু। "নে বন, তোর কলকেতার সুখ্যেত আর শুনতে পারি নি।"

সুধা। "কেন দিদি, তুমি মন্দ কি দেখ্‌লে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া, লোক, জন, এমন কি আমাদের তাল-পুখুরে আছে? এমন দোতলা বাড়ী কি আমাদের তালপুখুরে আছে?"

বিন্দু। "তা না থাকুক বন, আমাদের তালপুখুরের সোণার বাড়ী। চার দিকে নড়বার চড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটা নাউ গাছ আছে, দুটা আঁব গাছ আছে, এখানে কি আছে বল তো? গাড়ী ঘোড়া যাদের আছে তাদের আছে, আর দোতলা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ায় লোকের বাড়ী দেখা করতে যাবার যো নেই, পাল্কী না হলে বাড়ীর বাইরে যাবার যো নেই,—ও মা এ কি গো? যেন পিঁজ-রের ভিতর পাখী রেখেছে!"

সুধা। “কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী করে কত বেড়িয়ে এলুম, চিড়িয়াখানার বাগ সিংগি দেখে এলুম, গাড়ী করে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।”

বিন্দু। “না বাবু, আমার গাড়ী করে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমামাদের তালপুখুর সোণার তালপুখুর, সকালবেলা পুখুরের ঘাটে নেয়ে আসতুম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিনতুম, সবার বাড়ী যেতুম, সবাই কত আমাদের ভাল বাসত। এখানে কে কাকে চেনে বল?”

সুধা। “তা দিদি এক দিনেই কি চিনবে. থাকতে ২ সকলকে চিনবে। ঐ সে দিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের খেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের কাল কত খাবার দাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।”

বিন্দু। “তা আলাপ হবে বৈকি বন, যত দিন থাকব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড় লোক, আমরা গরিব মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কলকেতায় যখন এসেছি তখন দুজন চার জনের সঙ্গে কি চেনা শুনা হবে না, তা হবে বৈকি।”

সুধা। “আর শরৎ বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন,—দিদি, সে গল্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।”

বিন্দু। “আহা শরতের মত কি ছেলে আজ কাল আর দেখা যায়? তার একজামিনের জন্যে সমস্ত দিন পড়াশুনা করতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি জিগ্‌গেস করতে আসেন, পাছে কলকেতায় এসে আমাদের মন কেমন করে তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলুম তত দিন ত তাঁর পড়াশুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁর টাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নাই, আর শরীরে কত মায়া দয়া। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?”

সুধা। "দিদি, ঐ বুঝি গয়লানী আসচে!"

বিন্দু। "কি লো, আজ একটু ভাল দুদ এনেছিস, না কালকের মত জল দেওয়া দুদ এনেছিস? তোদের কলকেতায় বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের দুদের ও অভাব নেই, রংটা রাখতে পরলেই হল।"

গোয়ালিনী। "না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুদ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? তোমরা ত খেলেই ভাল মন্দ বুঝতে পারবে।"

বিন্দু। "দেখিছি বাছা দেখিছি; আহা তালপুখুরে আমরা তিন পো, একসের করে দুদ পেতুম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠতে পারত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে দুদ দিস তা খেয়ে ছেলেদের পেট ভরে না। আর কড়ায় যখন দুদ ঢালি, সে দুদ ত নয় যেন জল ঢালছি।"

গো। "তা পড়াগাঁয়ে যেমন দুদ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে। সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুদ দেয় ভাল। আমাদের বাঁদা গরু কি তেমন দুদ দেয়?"

বিন্দু। "আর কাল যে একটু দৈ আনতে বলেছিলুম, তা এনেছিস?"

গো। "হেঁ এই যে এনেছি।"

বিন্দু। "ও মা! ঐ চার পয়সার দৈ?"

গো। তা, হেঁ গা, চার পয়সার দৈ আর কত হবে গা। ঐ তোমার ঝিকে বল না বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে তবে দাম দিও না। হে মা, তোমাদের পিত্তেশে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব গা?"

বিন্দু। "ওলো সুধা, এই দেখ লো, তোর সোণার কলকেতার চার পয়সার দৈ দেখ! একটু জল মেখে খাস বন, তা না হলে ভাতে মাখতে কুলোবে না! কে ও ঝি এসেছিস।"

ঝি। "কেন গা?"

বিন্দু। "বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস ত। আজ বাবু দশটার সময় বেরবেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার করে আসিস ত। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস তার ঠিক নেই। হেঁ লা বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না?"

ঝি। "তা পাওয়া যাবেনা কেন মা, তবে যে দর সে কি ছোঁয়া যায়? বড় বড় কৈ এক একটা দুপয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়"।

বিন্দু। "বলিস কিরে? কলকেতায় লোক কি খায় দায় না, কেবল গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়ায়"?

ঝি। "তা খাবে না কেন মা, যে যেমন খরচ করে সে তেমনি খায়। আমাদের দিন চার পয়সার মাছ আসে তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায়"?

বিন্দু। "আচ্ছা মাগুর মাছ"?

ঝি। "ওমা মাগুর মাছের কথাটি কইও না, একটি বড় মাগুর মাছের দাম চার পয়সা, ছ পয়সা, আট পয়সা। বলব কি মা, কলকেতায় বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগাঁয়ে ঘর করেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কলকেতায় কি তেমনি পাই? কলকেতায় কি আমাদের মত গরিব লোকের থাকবার যো আছে মা,—এই তোমরা দুবেলা দুপেট খেতে দিচ্ছ তাই তোমাদের হিল্লতে আছি, নৈলে কলকেতায় কি আমরা থাকতে পারি"?

বিন্দু। "তা নে বাছা, যা ভাল পাস নিয়াসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে ভাল দেখে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস একটু অম্বল রেঁদে দিব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি তাই ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্, সাগ যদি ভাল পাওয়া যায়ত এক পয়সার আনিস ত, নটে সাগ হয়, কি পালম সাগ হয়, না হয় নাউ সাগ হয় ত আরও ভাল। আহা তালপুকুরে আমাদের নাউ সাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ সাগ হত তা খেয়ে উঠতে পারতুম না। আলুগুন বড় মাগ্‌গি, আলু জেয়দা আনিস নি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি ঝিঙ্গে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারি যা দেখবি নিয়ে আসিস। আর থোড় পাসত নিয়ে আসিসত, একটু ছেঁচকি করে দিব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস, একটু ঘন্ট রেঁদে দিব। হা কপাল! থোড়, মোচা আবার পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়!"

স্নান সমাপন করিয়া গয়লানীকে বিদায় করিয়া ঝিকে পয়সা দিয়া বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং উনান জালাইয়া দুদ জাল দিয়া উপরে

লইয়া গেলেন। ছেলে দুটী উঠিয়াছে, তাহাদের দুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাদুর তুলিলেন এবং ঘর পরিষ্কার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারি আনিল, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটীকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধন ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটী দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধন কার্য্য দুই ভগিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। সুধা নুতন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হইয়াছেন, বড় আহ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে নুন তেল মসলা বাহির করিলেন, চাল ধুয়ে দিলেন, তরকারি কুটিলেন, মাছ কুটিলেন, এবং আবশ্যকীয় বাটনা বাটিয়া দিলেন। বিন্দু শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে হেমচন্দ্র কয়েক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাটীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোনও প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অনুসন্ধান করিয়া মাসে ১১টাকা ভাড়ার একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎ বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের সঙ্গে আলাপ ছিল, হেমচন্দ্র ও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, কেহ বড় হৌসের বড় বাবু, কাহার ও বনিয়াদি বিষয় আছে, কাহারও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সদ্বংশজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিলেন, কেহ বা ঝাড় লাণ্ঠান-পরিশোভিত জনাকীর্ণ বৈটক্‌খানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটী সগর্ব্ব কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন, এবং নিজ বড়মানুষি প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মানুসারে হেমচন্দ্রর "একোয়েণ্টান্‌স ফরম" করিতে "ভেরি হাপি" হইলেন। কোন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত বড় লোকের কার্পেট মণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাৎ-

মৃত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্য কোন বড় লোক, তিনিও বিষয় কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ী করিয়া বাহির হইবার সময় ব্রুহমের জানলার ভিতর হইতে সহাস্য মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সানুগ্রহ বচন জানাইলেন যে হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া, তিনি (উপরিউক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন, অদ্য তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) বড় "বিজি," কিন্তু তিনি "হোপ" করেন শীঘ্র এক দিন বিশেষ আলাপ সালাপ হইবে। আর যদি হেম বাবু তাঁহার (উপরি উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন তবে শনিবার অপরাহ্নে আসিতে পারেন, সেখানে বড় "পার্টি" হইবে, তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) হেম বাবুকে "রিসিভ" করিতে বড় "হ্যাপি" হইবেন। ঘর ঘর শব্দে ব্রুহম বাহির হইয়া গেল, অশ্ব ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত কর্দ্দম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক ফোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃত বচনে বিশেষ অপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরের ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন কলিকাতার বড় বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন বড় বাজার হইতেও বড় একটী কলিকাতার বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদমজাৎ আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন সম্মানামৃত সেরকরা, মনকরা, বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ ভারি খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেন পার্টী দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহবা পরের ধনে হস্ত প্রসারণ করিয়া, সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন, ও বড় সুখে, নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, স্বর্ণ বর্ণ সুধার সহিত সে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে

সে অমৃত প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে! কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর শব্দে সেই অমৃত নিস্সৃত হইতেছে; কখন অসলারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে। আর কখনও বা অবারিত বেগে কর্ত্তৃপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাবতীয় বড় লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারি ভারি দেশের মহামান্যগণ পরম সুখে অহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক্" করা, "হর্মেটিকেলীসীল" করা বাক্সে বাক্সে সে মাল আমদানি করা হইতেছে, দুই এক খানি ফাঁপা বা গিল্টী করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রিত করিয়া বিলাতি মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানি করিতেছেন। এ বাজারে সে মালের দর কত! "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পত্র!" "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!" এই গৌরব ধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথাও "দেশহিতৈষিতা," "সমাজ সংস্কার," প্রভৃতি বিলাতি মাল বিলাতিদরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌনসিল হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা, বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন রাজমিস্তিরি অনবরত মেরামত করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্যরূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতাগণ বড় বড় জয় ঢাক বাজাইয়া চিৎকার করিতেছে "আমাদের এ খাঁটী দেশী মাল, ইহার নাম "সমাজ সংরক্ষণ," ইহাতে বিলাতি মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ।" হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন মালটা ষোল আনা বিলাতি, বিলাতি পাত্রে বিক্রিত, বিলাতি মালমসলায় প্রস্তুত, কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভেজে নেওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখিন, তাঁহার বোধ হইল ঘিটাও ভাল

খাঁটি দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা, ও দুর্গন্ধ! সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী" মাল বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া সেই মাল বিক্রিত হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে!

তাহার পর সাধুত্বের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার,—হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্ব শাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়; এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশি নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটী জালা ফাসিয়া গেল, পথ ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল. পিপিলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! কলিকাতার কি মাহাত্ম্য,—এমন জিনিসই নাই যাহা খরিদ বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদমজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন বোর্ড" সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড় বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাটতি, চতুরতায় বিশেষ মুনফা, চতুরতায় জগৎ সংসার ধাঁদা লাগিয়া রহিয়াছে!

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটি মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটি দেশ হিতৈষিতা, একটু খাটি পরোপকারিতা, বা একটু খাঁটি পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড় বাজারে সে মালের আমদানি

রফ্‌তানি বড় অল্প, সুসভ্য মহা সম্ভ্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছেলে মুখ বুড়ো কথা

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, অকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতায় কোন কার্য্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয়মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন; তথাপি যখন কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন তখন কর্ম্ম পাইবার জন্য যত্নের ক্রুটী করিলেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনও উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে. এই অনন্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী!

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত সহিষ্ণু বিন্দু স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, দুখানি আক্, দুটী পানফল, চারটী মুগের ডাল, এক গেলাস মিশ্রির পানা সযত্নে আনিয়া দিতেন, প্রফুল্ল চিত্তে মিষ্ট বাক্য দ্বারা হেমচন্দ্রের শ্রান্তি দূর করিতেন। পল্লিগ্রামেও যেরূপ ভবানীপুরেও সেইরূপ, স্বামী-সেবাই বিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম, ছেলে দুটীকে মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। সেই কার্য্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুইটীকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন, কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচিরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনস্রোত দেখিতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক ম্লান।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়ন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন! হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন তাহাই বলিতেন, শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প নানা কথা, সংসারের সুখ দুঃখের কথা, জগতে ধন ও দারিদ্রের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাঁহার নবীন বয়সের উৎসাহ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই কথায় দেদীপ্যমান হইত, জগতের প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প করিতে করিতে শরৎ চন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইত, জগতের প্রতারণা মিথ্যাচরণ বা অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্জ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহের সহিত সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বালা সুহৃদের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন সে কথা সর্ব্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার "বড় বাজারের" মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "শরৎ, দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মনুষ্য হৃদয়ের প্রধান গুণ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সদ্‌গুণ গুলির নামে তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণা কার্য্য হয় তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লিগ্রামে প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!"

শরৎ। "আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড়

প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সদ্‌গুণ কলিকাতায় পান নাই ; প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা, সত্যাচরণ, বিদ্যানুরাগ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ মনুষ্য হৃদয়কে উন্নত করে, সে গুলি কি আপনি দেখেন নাই”?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশানুরাগ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়দিগের হিত সাধন জন্য অনন্ত চেষ্টা, অনন্ত উদ্যম, জীবন ব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লিগ্রামে কখনও দেখি নাই ; পুস্তকে ভিন্ন অন্য স্থানে লক্ষিত করিনাই। বিদ্যানুরাগও সেইরূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত, মধ্য বয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনন্ত অবারিত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবন পণ করিয়া সৎকার্য্যের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লিগ্রামে কোথায় দেখিব ? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ আমি কলিকাতায় শত শত সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটী সদ্‌গুণ আছে, সেইখানে তাহার একশত প্রকার মিথ্যা অনুকরণ আছে,—যদি দশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী থাকেন, সহস্রজন দেশ হিতৈষিতার নাম লইয়া চিৎকার ও ভণ্ডামি করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজ সংরক্ষণে যত্নশীল, শতজন সেই সদ্‌গুণের নামে শতপ্রকার প্রতারণার দ্বারা পয়সা রোজগার করিতেছে। এইটী প্রকৃত দোষের কথা।”

শরৎ। “সে দোষ তাহাদের না আমাদের ? বিন্দুদাদ, তোমার এ মাদুরে ছারপোকা আছে ?”

বিন্দু। “সে কি শরৎবাবু কামড়াচ্চে নাকি ?”

শরৎ। “না কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করিতেছি আছে কি না।”

বিন্দু। “না শরৎবাবু আমার বাড়ীতে অমন জিনিসটী নেই। আমি নিজের হাতে প্রত্যহ বিছানা মাদুর রোদে দি, জিনিস পত্র ঝাড়ঝোড় করি। নোংরা আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি।”

শরৎ। “সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে

গিয়াছিলুম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়াছিল, তা তাদের মাদুরে এমন ছারপোকা যে বসা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি ?”

বিন্দ। “কারণ আর কি, নোংরা, অপরিষ্কার। জিনিস পত্র নোংরা রাখিলেই ঐগুলো জন্মে।”

শরৎ। “বিন্দুদিদি, আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখিলেই তাহাতে প্রতারণার কীটগুলা জন্মায়। আমরা যদি পরনিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমানীর মূর্খতায় মুগ্ধ হইয়া হাঁ করিয়া থাকি, সেই মূর্খতাই বিদ্যারূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিদ্যমান দেশ-হিতৈষিতায় যদি আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ দেশ হিতৈষিতার ছড়াছড়ি হইবে। চিনেবাজারে যেরূপ কাপড় যখন লোকের পছন্দ হয়, সেইরূপ কাপড়ের সেই সময়ে অধিক মূল্য হয়, অধিক আমদানি হয়। আমাদেরও যেরূপ সদ্গুণে পছন্দ ও রুচি সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটী তাহাদের দোষ না আমাদের দোষ ?”

বিন্দ। “আচ্ছা সে কথা বুঝিলাম। কিন্তু মাদুরে ছারপোকা হইলে মাদুর রোদে দিতে পারি, মসারি, বা বিছানায় কীট থাকিলে তাহা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হইলে তাহার কি উপায় ? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায় না রোদে দেওয়া যায় ?”

শরৎ। “বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলো সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রিগুলি একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষায় সে ফল না ফলে তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওষ্ঠস্থ দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা মুগ্ধ না হই তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয় ? পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খতা দেখিলে যদি আমরা সাহস্কে তথা হইতে প্রস্থান করি তবে সে অদ্ভুত সামগ্রী কত দিন বিরাজ করে ? এ সমস্ত মেকি সামগ্রি যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয় সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।”

হেম। “শরৎ তোমার এ কথাটী আমি স্বীকার করিতে পারি না।

শুনিয়াছি ইউরোপে শিক্ষার অনেক বিস্তার হইয়াছে, শুনিয়াছি তথায় যে পিতা পুত্র কন্যাকে পাঠশালায় প্রেরণ না করে তাহার আইন অনুসারে দণ্ড হয়। কিন্তু তথায় কি বাহ্যাড়ম্বর বা প্রতারণা অল্প?"

শরৎ। "হেমবাবু, আমাদের দেশ অপেক্ষা তথায় অনেক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক শ্রেণী, অনেক সম্প্রদায় প্রকৃত শিক্ষা পায় নাই, সুতরাং সামাজিক প্রতারণার এখনও প্রাদুর্ভাব আছে। তথাপি তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায় যে গুণে মুগ্ধ হয়েন, যে লোককে প্রকৃত সম্মান করেন, সেই গুণের উৎকর্ষ, সেই লোকের মাহাত্ম্য একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। বিন্দুদিদি, আমি একটী গল্প বলি শুন।

ইংলণ্ডে একজন লোক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার কাল হইয়াছে। যশই বিদ্যালাভের প্রধান উত্তেজক, কিন্তু এই মহামতির যশের প্রতি এরূপ অনাস্থা ছিল, কেবল বিদ্যালাভের জন্যই এতদূর অনুরাগ ছিল, যে তিনি প্রায় বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রকৃতির জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে বিস্ময়কর নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলি মুদ্রিত করেন নাই, মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। জগৎ তাঁহার নাম শুনে নাই, তাঁহার আবিষ্কার জানিত না। তখনও তিনি অনন্ত পরিশ্রম, অনন্ত উৎসাহের সহিত আরও অনুসন্ধান, আরও বিদ্যাহরণ করিতেছিলেন, যশস্বী হইবেন এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই! কথাটী শুনিলে কাল্পনিক বোধ হয়, উপন্যাসযোগ্য বোধ হয়; জগতে প্রকৃত ঐরূপ লোক আছে জানিলে দেবতা বলিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা কি করি, এক ছত্র পদ্য, বা এক অধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইবার জন্য ভেরী বাজাইতে আরম্ভ করি, অন্নের জন্য একটী দেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়া ভারত উদ্ধার করিতেছি বলিয়া ঢাক বাজাই। এ কথাগুলি আমি কাহাকেও বলি না, অন্যে বলিলে আমার চক্ষে জল আসে, কিন্তু এ চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমাদের সমাজে কোথায় পাইব?"

বিন্দু। "তা সে পণ্ডিতের আবিষ্কার শেষে লোকে জানিল কিরূপে?"

শরৎ। "শুনিয়াছি তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার আবিষ্কার জানিতে পারিয়া সেগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য অনেক জেদ করিলেন। তিনি অনেক প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, প্রকাশ করিবার যোগ্য হয় নাই, বলিয়া অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে সেগুলি প্রকাশ করিলেন।"

বিন্দু। "তখন সকলে বোধ হয় তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিল?"

শরৎ। "না দিদি, এক দিনে নহে। প্রথমে লোকে তাঁহাকে যেরূপ গালিবর্ষণ করিয়াছিল সেরূপ বোধ হয় শত বৎসরের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যে মনুষ্য কেবল বিদ্যালোচনায় জীবন পণ করেন তাঁহার পক্ষে গালিই পুষ্পাঞ্জলি! ক্রমে লোকে তাঁহার আবিষ্কারের মাহাত্ম্য দেখিতে পাইলেন, সম্প্রতি সেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মরিয়া গিয়াছেন,—অদ্য সভ্য জগৎ ডারউইনকে এ শতাব্দীর মধ্যে অদ্বিতীয় বিজ্ঞানাবিষ্কারী বলিয়া মানে।"

হেম। "কিন্তু ইউরোপে সকলেই কি ডারউইন?"

শরৎ। "বিদ্যায় ডারউইন অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার যে নিষ্কাম কর্ত্তব্য সাধনাভিলাষ ছিল, তাহা ইউরোপীয় সমাজে অনেকটা লক্ষিত হয়,—ইউরোপের উন্নতির তাহাই মূল কারণ। যে মহাধীশক্তিসম্পন্ন বিস্মার্ক এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মান সাম্রাজ্য নিজ হস্তে গঠিলেন, যে অদ্বিতীয় দেশানুরাগী গারিবল্ডী অসি হস্তে ইতালী স্বাধীন করিয়া পর দেশের উপকারের জন্য আপনি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া সেই রাজ্য অন্যকে দিলেন, ইংলণ্ডে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিখ্যাত,—সকলের জীবনচরিত্রে আমি সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন অনেকটা দেখিতে পাই। সামান্য লোকেও এই শিক্ষাটী শিখিলেই দেশের উন্নতি হয়, যে দেশের মিস্ত্রিরা কর্ত্তব্যানুরোধে মনিব না থাকিলেও একটু ভাল করিয়া কাজ করে, মুটে মজুরদেরও শিক্ষাগুণে একটু কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে, সেই দেশেরই ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিন্দুদিদি, ইউরোপে জর্ম্মান ও ফরাসী বলিয়া দুইটী পরাক্রান্ত জাতি আছে, পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা জর্ম্মানদিগকে বার বার যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি জর্ম্মানগণ ফরাসী

দিগকে বড় হারাইয়া দিয়াছে। উভয় জাতিই সমান সাহসী, কিন্তু আমি একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকে পড়িয়াছি যে জর্ম্মানদিগের বিজয়ের প্রধান কারণ এই যে তথাকার অতি সামান্য সৈন্যগণ ও আধুনিক শিক্ষাবলে কর্ত্তব্যসাধনে সমধিক রত, প্রত্যেক সামান্য সিপাহি কর্ত্তব্যানুরোধে নিজ নিজ স্থানে কলের ন্যায় নিজ নিজ কর্ম্ম করে। যুদ্ধে যেরূপ সমাজেও সেইরূপ, কর্ত্তব্যসাধনই জয়ের হেতু। উপন্যাসে দেখিতে পাই এই কর্ত্তব্যসাধনের একটী সুন্দর প্রাচীন ফরাসী নাম "Devoir'," ইংরাজেরা উহাকে এক্ষণে "Duty" কহে, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধনের যতদূর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কোনও দেশে লক্ষিত হয় নাই। সংসারে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে এই ধর্ম্মটী অবলম্বন করিতে পারি, কেবল কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি কার্য্য করিতে শিখি, নিজের বাঞ্ছা, নিজের অভিলাষ যদি একটু দমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে হৃদয় স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদিগের উন্নতির পথ দিন দিন পরিষ্কার হইবে।"

হেম। "শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষাগুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে এরূপ আমার আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য-হৃদয়ে যতদিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্ম্মাচরণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে। তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধন বাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয় তাহা আমাদেরও বোধ হয়"।

বিন্দু। "তা আজ কাল তোমাদের কালেজে যে লেখাপড়া হয় তাহাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, কলেজের শিক্ষাকে অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষায় আমরা মহৎ জাতিদিগের, মহৎ লোক-দিগের জীবনচরিত ও কার্য্য-কলাপ অবগত হইতেছি, ও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মাবলী শিখিতেছি তাহা কি মন্দ শিক্ষা? যাঁহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না,—সে তাঁহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা প্রকৃত উন্নতি ইচ্ছার কথা

বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল অদ্য তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষাগুণে এই সদ্গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দিতেও আমরা বোধ হয় ইউরোপীয়জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না সন্দেহ; কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে জগদীশ্বরের কৃপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ, চেষ্টা, ও অধ্যবসায়ই এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি এক পা দুই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন বাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন "আমি কলেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ন্যায় প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে, শরতের ন্যায় উন্নতহৃদয় উন্নতচিত্ত, আনন্দনীয় উদ্যম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি।"

দেবীবাবু বলিলেন, "হুঁ ছেলেটী ভাল, গুণবান বটে, বেঁচে থাকুক, বাপের নাম রাখবে। আর লেখাপড়াও শিখ্‌বে বটে, কিন্তু ছেলে মানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায় তাই ভাবি।"

কৃষ্ণচরিত্র।

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমর-সাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক, এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

"রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপাল বধের ইহাই যথার্থ কারণ; শিশুপালকে বধ না করিলে, তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালি গালাজ করিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রচারের প্রথম খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই সময়ে উক্ত হয়; কিন্তু এইস্থানে

পাঠক ঐ খণ্ডের ৪১৫।৪১৬ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করুন। এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী। কোন্ সিদ্ধান্তটি সত্য তাহা মীমাংসা করা কঠিন। পূর্ব্বে বাল্যলীলার কিম্বদন্তী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে, ইহা আমাদিগের বোধ হইয়াছে। দুইটি বিরোধী কথা যখন মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার একটা প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব। যখন দুইটি কথার মধ্যে একটি অনৈসর্গিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় পূর্ণ, আর একটি স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত, তখন যেটি স্বাভাবিক ও স্বম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত সেইটিই বিশ্বাসযোগ্য। পাঠক যদি এ মীমাংসার যাথার্থ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণের নন্দালয়ে রাস বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। *

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন। "দুরাত্মা" "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার ও তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাস-যোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার পিতামাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু

* তিরস্করণ কালে শিশুপাল কৃষ্ণকে কংসের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে কৃষ্ণ মথুরায় প্রতিপালিত, নন্দালয়ে নয়।

করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।”

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়, কেন না উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন” কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসী মা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কানায় কানাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুর বধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ

ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র রূপ রত্ন ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকত কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাতসাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, ততদিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোক ক্ষয় হয় বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যতদিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শপুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগ পর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা

ক্ষরিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

তারপর ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজাগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ কণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না। এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপাল কৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে, যে তিনি পিতৃস্বসার অনুরোধেই তাঁহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিকও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃস্বস্পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সুসঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্য শরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল। চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না, যে তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের

সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র স্মরণ বৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ যুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে অর্জ্জুন শিশুপাল বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজ প্রমুখ নরেন্দ্র বর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।" ২২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষ যুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচর বর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে একগ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই, একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি

কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধে উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি 'কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর' বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞ রক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

বেদ।

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ২১ শ্লোক।

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন অন্যান্য লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে এবং এই শ্রেষ্ঠ লোকেরা যাহা প্রমাণ করেন অন্যান্য লোকে তাহারাই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

সমাজের ভাবসকল কিরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সত্যতা বেশ বুঝা যায়। আমরা সাধারণ লোকে যে শ্রেষ্ঠ লোকের মনোভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি তাহা কোন কোন সময় জ্ঞাতসারে হই এবং অনেক সময় অজ্ঞাত সারে সেই সেই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি।

ভারতের আর্য্যসমাজ এক কালে ঋষিগণকে মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত এবং জ্ঞাত সারে এবং অজ্ঞাত সারে সেই সেই ঋষিগণের প্রমাণের অনুবর্ত্তী ছিল; কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই ঋষিগণকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া আর বুঝি না; হারবর্টস্পেন্সর্ ডারউইন, ম্যাক্সমূলর, টিণ্ডল ইঁহারাই আজকাল আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য তাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে তাঁহারা যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি।

ঋষিগণ বেদকে মহাবাক্য বলিয়া বুঝিতেন, ভারতের প্রাচীন সমাজ ঋষিগণকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতেন, সেই জন্যই বেদ এতকাল ভারতে আদরণীয় হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজকাল ঋষিগণের মাহাত্ম্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঋষিচিত্তের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আর আমাদের নাই; এখন যাঁহাদের চিত্তের উৎকর্ষ আমরা ধারণা করিতে পারি তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিগণের কথা মনে লাগে না সেইজন্য এই সকল পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ করিতেছেন আমরাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি।

আমরা হার্ব্বার্ট স্পেন্সর, ডারউইন, কোমৎ ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির চিত্তের অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিচিত্ত অবস্থা যে এইরূপ অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থা তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ঋষিগণ বেদকে যে ভাবে দেখিতেন আমরা বেদকে সে ভাবে দেখিতে ভুলিয়া গিয়া, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে দেখেন আমরাও বেদকে সেইভাবে দেখিতে শিখিতেছি।

বেদ সত্যমূলক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, বেদভিত্তি অবলম্বনেই হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে—এইরূপ কথা চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; এই কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা যদি কেহ পক্ষপাতশূন্য হইয়া অনুসন্ধান করিতে চান তবে বেদপ্রণেতা ঋষিগণ এবং যে সকল ঋষিরা বেদভিত্তি অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম গড়িয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত কতদূর উন্নত ছিল তাহার

আলোচনা প্রথম করা কর্ত্তব্য। কেননা যদি ঋষিদিগের কোন মাহাত্ম্য থাকে তবেই বেদের মাহাত্ম্য আছে। ঋষিদিগকে আধ্যাত্মিক রহস্যবিদ্ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকিলে বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিব; তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ জ্ঞান থাকিলে সেরূপ অর্থ না বুঝাই সম্ভব।

মনে কর আজকালকার একজন ভক্ত শাক্ত যিনি বিজ্ঞানের কোন ধার ধারেন না, তিনি একটি কথা বলিলেন যে,—যে শক্তি জন্য বৃক্ষস্থ ফল ভূতলে পতিত হয় সেই শক্তি বশতই গ্রহাদি জ্যোতিষ্ক সকল আকাশপথে ঘুরিতেছে; ভক্ত শাক্তের এই কথাতে তিনি যে তাঁহার ইষ্টদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন ইহাই বুঝিব. শক্তি অর্থে এখানে তাঁহার ইষ্টদেবতা এই অর্থই মনে আসিবে। কিন্তু ঐ কথাগুলিই আবার যদি নিউটনের কথা বলিয়া অর্থ করিতে যাই তবে ঐ বাক্যটি যে এক গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা এইরূপ অর্থই বুঝিব; নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation) সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্য ঐ কয়টি কথায় লিখিত রাখিয়াছেন ইহাই বুঝিব। সেইরূপ বেদবাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে গেলে ঋষিরা কিরূপ চিত্তের লোক ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ঋষি-চিত্তের অবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা আমরা এক্ষণে অনুভব করিতেও সক্ষম নহি, ঋষিগণ যোগাবস্থায়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতেন সেই সকল সত্য বিষয়ক তথ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতেও অসমর্থ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন আর প্রাচীন ঋষিগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে জগৎতত্ত্ব এবং পুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, দীপের আলোকের সহিত সূর্য্যের আলোকের যত প্রভেদ ইহাদের ভিতরও সেইরূপ প্রভেদ।

চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে এবং উহাদের একাগ্রতা যত বেশী হইবে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইতে থাকে। একথা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতগণ চিত্তের যে অবস্থার উপর দাঁড়াইয়া

সত্য অনুসন্ধান করিতেছেন পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রমতে উহা চিত্তের নির্ম্মল অবস্থা নহে। সম্পূর্ণ সমলচিত্ত ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল করিবার জন্য যত্ন ও অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত প্রথমেই যে অবস্থায় উপনীত হয় সেই সবিতর্ক যোগাবস্থা * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিত্তের অবস্থা। এই সবিতর্ক অবস্থা অপেক্ষা ঋষিচিত্তের পূর্ণ নির্ম্মলাবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সম্যক আলোচনা করুন। বেদ যে মহাত্মা ঋষিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম অবস্থার ফল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে যাহারা অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি পদার্থের আরাধনা করিত তাহারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; আমরা যাহাকে অগ্নি বা যাহাকে বায়ু বা যাহাকে সূর্য্য বলি সেই অগ্নি, সেই বায়ু, এবং সেই সূর্য্য যে বেদের দেবতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আমরা আজকাল দেখিতে পাই যে, অসভ্যেরা অগ্নি আদির ভয়ে ভীত, তাহারাই অগ্নি আদির উপাসক; কিন্তু যাহারা সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহারা আর কেহই অগ্নি বা বায়ু বা কোন জড়ের উপাসক নহেন; প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ যে অগ্নির উপাসনা করিতেন অগ্নিভীতিই তাহার কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা অন্য কোন কারণ ত দেখা যায় না—ইত্যাদি।

কিন্তু অগ্নি সূর্য্যাদি সম্বন্ধীয় মন্ত্র সকলের প্রকৃত অর্থ যোগশাস্ত্রের সাহায্য বিনা কখনই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। এবং যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেই বৈদিক ঋষিগণের অগ্নি উপাসনা বা সূর্য্যোপাসনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক ঋষিগণ ভয়ে বা উল্লাসে অগ্নি আদির স্তব করিতেন না তাঁহারা কেন যে অগ্নি বায়ুর উপাসনা করিতেন, পাতঞ্জল শাস্ত্র হইতে তাহার কারণ পাওয়া যায়।

---

* শব্দার্থ জ্ঞান বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা॥ সমাধিপাদ ৪২ সূত্র। বাক্যের সাহায্য ভিন্ন চিন্তা করা যায় কি না এই সম্বন্ধে ইউরোপে এখনও মতভেদ আছে। কিন্তু যোগীরা ইহা বুঝিতেন যে নির্বিতর্ক অবস্থাগ্রস্ত চিত্ত বাক্যের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করিতে সক্ষম। এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা।

পাতঞ্জলি বলেন যে সত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চিত্ত নির্ম্মল করা প্রয়োজন।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহিতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু
তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ। সমাধিপাদ ৪১।

চিত্তের পূর্ব্ব সংস্কার সকল ক্ষীণ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে, নির্ম্মল মণিতে কোন দ্রব্য যেমন যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই নির্ম্মল চিত্তের গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। গ্রহিতা তৎস্থ গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে তন্ময়ত্ব এবং গ্রাহ্যে সমাপত্তি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর যে বিষয় অবলম্বনে চিন্তা করুক না তাহাতেই তাহার একাগ্রতা জন্মে, ইন্দ্রিয় সকল তন্ময় হয় এবং সেই বিষয় সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য যথাবৎ প্রতীয়মান হয়।

মনে কর সূর্য্য সম্বন্ধীয় সত্য একজন অনুসন্ধান করিতে চান, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত সাধারণ লোকের চিত্তের ন্যায় সমল, সূর্য্য সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য বিষয়ক প্রত্যয় তাঁহার চিত্তে যথাবৎ প্রতিফলিত হইবে না, কিন্তু যোগীর নির্ম্মল চিত্তে সেই সত্য বিষয়ক প্রত্যয় যথাবৎ জন্মিয়া থাকে। বেদে বাহ্যজগতীয় পদার্থ সকল যোগীর নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেরূপ প্রত্যয় জন্মায়, তাহারই বাচকমাত্র।

এই মন্ত্র সকলই বেদের দেবতা; বৈদিক দেবতার আরাধনা আর বেদ মন্ত্রের আরাধনা এই দুইটিই এক কথা। চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য যোগ শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে এই দেখা যায় যে সাধকের পক্ষে প্রথমতঃ বাহ্য স্থূল পদার্থে চিত্ত সংযম করিতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বনে চিত্ত সংযম করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বেদের অগ্নির আরাধনা অর্থ অগ্নি সম্বন্ধে চিত্ত সংযম করা, সূর্য্য আরাধনার অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করা। যাঁহারা চিত্ত সংযম করিতে শিখেন নাই তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না। চিত্ত সংযম কথাটির অর্থ পরিষ্কার করা চাই।

দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা ॥ যোগশাস্ত্র বিভূতিপাদ ১

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥২

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪

কোন বিশেষ অবলম্বনে চিত্ত বদ্ধ হইলে চিত্তের সেই অবস্থায় নাম ধারণা।১

অর্থাৎ চিন্তাকালে যে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছি, সেই বিষয়ক প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন ভাব চিত্তে যখন আসিতে পায় না চিত্তের সেই অবস্থার নাম ধারণা।

তাহার পর ধারণা কালীন প্রত্যয় সকলের একতানতা বুঝিবার ক্ষমতা যখন জন্মে সেই অবস্থার নাম ধ্যান।২

এই ধ্যান এবং ধারণার সময় বাক্য আদির সাহায্যে, দ্রব্যের রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল আশ্রয় করিয়া চিন্তাস্রোত চলিতে থাকে কিন্তু সমাধি অবস্থায় চিত্তের অবস্থা ভিন্নরূপ।

ধ্যেয় বিষয় স্বরূপ শূন্যাবস্থায় যখন কেবল অর্থমাত্র রূপে চিত্তে প্রকাশ পায় চিত্তের সেই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা।৪

স্বরূপশূন্যাবস্থা এবং অর্থমাত্ররূপ এই কথা দুইটির অর্থ একটু পরিষ্কার করা চাই। ভৌতিক পদার্থ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া যে রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই তাহাদের স্বরূপ কিন্তু পদার্থের অর্থমাত্ররূপ আমাদের চিত্তের বিষয়, ইন্দ্রিয় সকলের নহে। ইংরাজীতে যাহাকে concrete idea বলিতে পারা যায় তাহাই দ্রব্যের স্বরূপ এবং যাহাকে abstract idea বলিতে পারা যায় তাহাই দ্রব্যের অর্থমাত্ররূপ। চিত্ত যেরূপ উন্নতাবস্থা পাইলে ধ্যেয় বিষয় সম্বন্ধীয় abstract idea লইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাই সমাধি অবস্থা।

যে অবস্থায় ধারণা ধ্যান এবং সমাধির একত্র যোগ হয় তাহার নাম সংযম অবস্থা। সমাধি অবস্থায় দ্রব্যের অর্থ মাত্ররূপ বিষয়ক যে প্রত্যয় জন্মে তাহার সহিত ধ্যানাবস্থা এবং ধারণাবস্থার জ্ঞানের একতানতা এই সংযম অবস্থা জন্মে।

ঋষিরা সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি পদার্থে চিত্তসংযম করিয়া উক্ত পদার্থ সকলের অর্থমাত্ররূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া তজ্জনিত চিত্তের প্রত্যয় সকল আলোচনা করিয়া যে সকল বাক্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বেদবাক্য। আমরা যাহাকে অগ্নি বলি, বেদের অগ্নিদেবতার লক্ষ্য তাহাই বটে কিন্তু

প্রভেদ এই যে ঋষিদের সূর্য্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান একরূপ নহে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া সূর্য্য বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় যেরূপ ঋষিদের কাছে, তাহা সত্যমূলক নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষজনিত প্রত্যয় ঋষিদের কাছে চিত্তের মলাস্বরূপ; যোগী এই সকল মলা পরিষ্কার করিয়া তবে যোগাবস্থায় উপনীত হন, এবং তখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ বিষয়ক সত্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

বৈদিক ঋষিরা ধীশক্তিলাভের জন্য সূর্য্যারাধনা করিতেন; যোগশাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন তাঁহাদের জড়ারাধনার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাতঞ্জলি বলেন যে সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করিলে ভুবন জ্ঞান জন্মায়।

ভুবন জ্ঞানম্ সূর্য্যে সংযমাৎ।

এই কথাটি যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রের "ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; অন্যে উহাতে একটু কবিত্ব বই আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্মিন্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমীর কাছে তাহা দিবা; এবং সর্ব্বভূতে যাহাকে জাগ্রতাবস্থা বলে মুনিগণ তাহাকে রাত্রি স্বরূপ দেখেন।

সাধারণ লোকে যে জ্ঞান লইয়া জাগ্রত থাকেন সংযমীর কাছে তাহা ভ্রমজ্ঞান, সাধারণের কাছে যে সত্যজ্ঞান প্রকাশ পায় না সংযমীর নিকট সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর্য্যঋষিগণ যে জ্ঞান অবলম্বনে জাগরিত থাকিতেন পশ্চাত্যগণ সেইখানে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পান না সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংযমী ঋষিগণকে যে চিনিতে পারেন নাই ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। চিত্তের সংযমাবস্থা কাহাকে বলে ইহা যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধারণা করিতে পারিবেন তখনই তাঁহারা ঋষি বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

চিত্ত সংযম অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য কতদূর উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন

জ্ঞান কতদূর সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হয়, পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা যিনি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন ঋষি নামে আর তাঁহার অশ্রদ্ধা কখনই সম্ভবিবে না। ভারতে ঋষিগণই সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বরূপ মান্য পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ঋষি মহাত্মা আজকালকার লোকে ভুলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই ঋষিদিগের আসনে আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে বসাইলে ভারতের অবনতি ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

বেদমন্ত্র এবং মন্ত্রগত দেবতা সম্বন্ধে চিত্ত সংযম দ্বারা বেদের অর্থ বুঝিতে হয়। বেদের অগ্নি দেবতা বলিলে অগ্নি কথাটিতে যে অর্থ মাত্র রূপ (abstract idea) নিহিত আছে তাহাই অন্তরে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অগ্নি বিষয়ে চিত্ত সমাহিত লইলে অগ্নি যেমন স্বরূপ শূন্যাবস্থায় অর্থ মাত্ররূপ চিত্তে প্রকাশিত হইবে তখন অগ্নি সাক্ষাৎকার হইয়াছে জানিও, ইহার পূর্ব্বে বেদের অগ্নি কথায় কি ভাব নিহিত আছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সমাহিত অবস্থায় চিত্তপটে অগ্নির অর্থ যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হইলে পর চিত্তের বুধ্যমান শক্তির সাহায্যে উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবে। অর্থাৎ সেই abstract ideaর সহিত কোন কোন concrete ideaর একতানতা আছে তাহাই বিচার করিবে, পরে সেই জ্ঞান বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে, কিরূপ ছন্দে অগ্নির পরিণাম ক্রম-চক্র শৃংঙ্খলাবদ্ধ এই সকল আলোচনা করিতে শিখিলে তবে বেদ মন্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা দ্বারা বেদের মন্ত্রার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে বেদের অগ্নি দেবতায় যে concrete idea বুঝায় তাহার লক্ষ্য যে কেবল মাত্র কাঠের আগুণ, তাহা নহে। জঠরাগ্নি কামাগ্নি জ্ঞানাগ্নি ইহারাও বেদের অগ্নি কথাটির লক্ষ্য।

কর্ম্ম করিতে গেলেই অগ্নির সহায়তা প্রয়োজন বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। কর্ম্ম কথাটিতে শারীরিক মানসিক ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝায়। এই কর্ম্ম কথাটির অর্থের সহিত অগ্নি কথাটির অর্থের একতানতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আমাদের শারীরিক তাপাগ্নি, মনের কামাগ্নি ইহারাও অগ্নি কথার লক্ষ্য। যে শক্তির সাহায্যে

কর্ম্ম করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "Heat is transformed into work" কিন্তু তাঁহারা এই Work কথাটিতে স্থূল পদার্থের গতি ভিন্ন অন্য অর্থযোজন করেন নাই; কিন্তু বেদে যখন অগ্নিকে কর্ম্মের মূল বলিয়া বুঝিতেন তখন কর্ম কথাটিতে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝিতেন। যে শক্তি কর্ম্মে পরিণত করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। যে অগ্নি শক্তি সকলের গাড়ী চালায় তাহাও অগ্নি, যে শক্তি শারীরিক কর্ম্মে পরিণত হয় তাহা ও অগ্নি এবং যে শক্তি মানসিক চিন্তা আদি কর্ম্মে পরিণত হয় তাহাও অগ্নি। ইহাই বেদের অগ্নির অর্থমাত্রভাব (abstract idea)

বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি মন্ত্র আছে তাহার এক একটি মন্ত্র, অগ্নি সম্বন্ধীয় এক একটি concrete ideaর অভিব্যঞ্জক; কিরূপ অগ্নি কোন মন্ত্রের লক্ষ্য তাহা যিনি বুঝিতে চান তিনি সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ কর্ম্মে সেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেই সমস্ত কথা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে শিখিবার কিছুই পান নাই কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বুঝিতে না পারিলে মন্ত্র ভাগও বুঝিতে কেহ সক্ষম হইবেন না।

বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার মহত্বের পরিচয়। বেদ মন্ত্র সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যেরূপ সাজান হইয়াছে, যেরূপ অধ্যায়, খণ্ড, প্রপাঠক এবং দশতি, ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহারও একটা কারণ আছে। কোন গ্রন্থ ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে সেই গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে যে সকল কথা বলা আছে সেই সকলের মধ্যে কিরূপ ক্রমানুযায়ী সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বেদমন্ত্র সকলে একটির পর অন্যটি যেরূপ সাজান হইয়াছে সেইরূপ সাজানর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যোগ অবলম্বন ভিন্ন পাশ্চাত্যগণ যে, অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; সে জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে ঋষিরা যেরূপ চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিতেন সেই প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন বেদের প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। মনে কর, আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতবেত্তা পণ্ডিতগণ যখন এই কথা বলেন যে দুইটি বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল চারিটি বিন্দু,* তখন তাঁহাদের একেবারে পাগল না বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে প্রথমে তাঁহাদের কথার অর্থটি বুঝিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক দুইটী বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল কখনই দুইটি বিন্দু অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, অথচ কনিক সেক্সনের (Conic Section) চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে "দুইটি বৃত্ত চারিটি বিন্দুতে কাটিয়া থাকে" এ কথার যে একটা অর্থ আছে, ইহা বুঝিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই সমস্ত কারণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে যিনি বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ইচ্ছুক তিনি প্রথমে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখুন; পাতঞ্জলি যাহাকে চিত্তসংযম বলিয়াছেন সেই চিত্তসংযম করিতে শিখুন, তবেই তিনি ঋষিবাক্য সমূহের প্রকৃত অর্থের আভাস পাইবেন।

হিন্দু।

একটি ঘরের কথা।

মুকুন্দ ঘোষ খুব বড় ঘরের ছেলে। বহুপূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা খুব মান্য গন্য ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী ছিল। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত পুরুষ

---

* Two circles cut each other at four points, two of which are imaginary (Analytical Conic Section.)

বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তালুক মুলুক যাহা ছিল সব গিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌বাগিচা নাখেরাজ জোত জমাও বিক্রয় হইয়াছে। ভদ্রাসন টুকুও কয়েক বৎসর নাই। মুকুন্দরা একখানি ছোট খড়ো ঘরে থাকে। সে ঘরের চালেও আবার খড় নাই। চালখানা স্থানে স্থানে শুকনা পাতা ঢাকা। মুকুন্দর মা ভাই বোন প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি পরিবার। তাহাদের দুবেলা অন্ন জুটে না। প্রায়ই ভিক্ষার উপর নির্ভর। কাহারো পরিধানের রীতিমত বস্ত্র নাই, সকলেই ছেঁড়া নেকড়া কোন রকমে গুছাইয়া পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে। ১০।১২ বৎসরের ভাই দুটো ত ন্যাংটোই বেড়াইয়া বেড়ায়। মাসে দুই চারি আনা পয়সা হইলে তাহারা গ্রামস্থ পাঠশালায় দুই অক্ষর শিখিতে পারে, তাহাও জুটে না, দিবারাত্রি হো হো করিয়াই বেড়ায়। মুকুন্দর এক বৎসরের একটি ছোট ভাই দুধ খেতে পায় না। যৎসামান্য স্তন্যপান করিয়া পেটের জ্বালায় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটায়। এইত গেল মুকুন্দের ঘরের অবস্থা, কিন্তু মুকুন্দ কলিকাতায় উন্নতি-বিধায়িনী সভার সভ্য হইয়া কেবল বড় বড় বক্তৃতা করে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালি মেম্বর হওয়াও কি ঠিক্ সেইরূপ নয়? বাঙ্গালি জাতি অতি অধম, অতি দরিদ্র, অতি অসার। বঙ্গালির ঘরে অন্ন নাই। যা এক আধ মুঠা অন্ন আছে তাহা কেবল পরে অনুগ্রহ করিয়া লয় না বলিয়া আছে, নতুবা তাহাও থাকিবার কথা নয়। বাঙ্গালির পরিধানের বস্ত্র নাই। যতক্ষণ না পরে একখানি বস্ত্র আনিয়া দিবে ততক্ষণ লজ্জা রক্ষা হওয়া ভার। একদিন বাঙ্গালি সমস্ত জগতকে কাপড় পরাইয়াছে। আজ বাঙ্গালি এতটুকু সূতার জন্যও পরের মুখাপেক্ষী। বাঙ্গালির বিদ্যা নাই, বাঙ্গালি মূর্খ। বাঙ্গালির সাহিত্য সবে সুরু হইয়াছে। সে সাহিত্যের শক্তি নাই, বিস্তার নাই, প্রকৃত সারবত্তা নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, তেজ নাই, প্রতাপ নাই, মহিমা নাই। বাঙ্গালির দেহ দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। বাঙ্গালির শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয় বাঙ্গালির তাহা নাই; যাহা থাকিলে জাতি জাতি হয়, বাঙ্গালি জাতির তাহা নাই। তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়?

বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি মানুষ নয় ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিলে বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি জাতি জাতি নয় বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়? গরিবের ছেলে মুকুন্দের উন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্য হওয়াও যা বাঙ্গালির ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়াও কি তাই নয়? যবে এত কাজ থাকিতে, আপনাকে মানুষ করিবার এত বাকি থাকিতে, আপনাদিগকে জাতি করিয়া তুলিবার এত বাকি থাকিতে, ব্রিটীশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া কেন? মানুষকে মানুষ করিতে কত শক্তি, কত সামর্থ্য, কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত একাগ্রতা, কত স্থিরলক্ষ্য লাগে বল দেখি? এত শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও মানুষকে মানুষ করিতে কত পুরুষ লাগে বল দেখি? আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কি এতই বাহুল্য হইয়াছে যে আমাদের ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজের জন্য এত উদ্বৃত্ত থাকে? তবে কেন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বল দেখি? ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতেও কিছু শক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু যখন আমরা এখনও মানুষই হই নাই, জাতিই হই নাই, তখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ? আমরা মানুষ হই নাই, ইহা না বুঝিবার দরুনই আমরা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে চাই। আমাদের ঘরের অবস্থা কি শোচনীয়, আমাদের মানুষ হইতে কতই বাকি, ইহাও আমরা বুঝি নাই—ইহা কি বিষম কথা! বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে যাওয়াতেই ত এই বিষম কথাটা এত বিকট ভাবে মনে উদয় হইল।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ইংরাজ জাতির জাতিত্বের অভিব্যক্তি। যে সকল শক্তির গুণে ইংরাজ ইংরাজ, যে সকল শক্তি সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সহস্র রকমে ইংরাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আজিকার ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট সেই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি বা অধিষ্ঠানস্থল। সে শক্তি বাঙ্গালিতে নাই, বাঙ্গালি সে শক্তিতে গঠিত হয় নাই। তবে ব্রিটিশ

পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালির স্থান কোথায়? বাঙ্গালিতে যে প্রকার শক্তি এবং যে সামান্য একটু শক্তি আছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টস্থিত শক্তির সহিত মিশ্ খাইবেই বা কেমন করিয়া, পারিয়া উঠিবেই বা কেমন করিয়া? কোরিন্থিয় প্রণালীতে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাতে গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত যে স্তম্ভ তাহা কেমন করিয়া খাটিবে? ইংরাজের শক্তিতে ইংরাজের পার্লেমেণ্ট গঠিত। অতএব সে পার্লেমেণ্ট ইংরাজকেই বুঝে, ইংরাজের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাই মিটাইতে পারে। ভারতকে সে পার্লেমেণ্ট বুঝে না, বুঝিতে পারেনা এবং পারিবে ও না। সে পার্লেমেণ্ট কেমন করিয়া ভারতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে? সেই জন্যইত ব্রাইট ফসেটের ন্যায় সে পার্লেমেণ্টের মহা প্রতাপশালী ইংরাজ সভ্যেরাও ভারতের জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না? তবে ক্ষুদ্র বাঙ্গালি সে পার্লেমেণ্টে গিয়া ভারতের জন্য কি করিবে? বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ধাত্ বুঝেনা বলিয়া সে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা বাঙ্গালির অসারতার প্রমাণ মাত্র!

বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিয়া ভারতের কিছু কাজ করিতে পারুক আর নাই পারুক, ভারতের এবং সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি করিবে ও নাম উজ্জ্বল করিবে ইহা ও কি কথা? বাঙ্গালি বিজিত, ইংরাজ বিজেতা। বিজেতার পার্লেমেণ্টে বসিয়া বাঙ্গালি যদি এমন মনে করেন যে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল তবে ত তিনি তাঁহার বিজিত বা পরাধীন অবস্থাকেই শ্রেয় বা সম্মানসূচক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিজেতার গোলামি করিয়াই বা সম্মানিত মনে করিবেন না কেন? বিজেতা ভাল হইলে তাঁহার অধীনে থাকায় লাভও আছে এবং কিছু সুখও আছে এবং সেই জন্য বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিজেতা যতই ভাল হউন, বিজিত অবস্থাকে সম্মানের অবস্থা মনে করিলে বিজিতেরা কখনই মানুষ হইতে পারিবে না, জাতি ও হইতে পারিবে না।

আর একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি হইবে না, ইংরাজেরই মান বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালি যদি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে

পারে তবে জর্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাধীন এবং সুসভ্য জাতীয় লোকে তাহাকে প্রকৃত পক্ষে সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিবে না বরং ঘৃণা করিবে এরূপ সম্ভব। আর পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বিশেষ সম্মানের কথাই বা কিসে তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে গেলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না। সামান্য একটু বুদ্ধি এবং একটু বাক্‌শক্তি থাকিলেই পার্লেমেণ্টে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেরূপ একটু ক্ষমতা থাকিলে মানুষ যে বিশেষ সম্মানার্হ হয় তা নয়। তবে বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের কাছে কিসে যে সম্মানার্হ হইবে বুঝিতে পারি না। ফলতঃ বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বাড়িবে না, ইংরাজেরই মান বাড়িবে। বিজিতকে আপনার সর্ব্বোচ্চ অসীম-মহিমা-মণ্ডিত স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন শাসন সমিতিতে বসিতে দিলে প্রকৃত মানুষের কাছে ইংরাজেরই মান বাড়িবে, বাঙ্গালির মান বাড়িবে না। তবে সে সমিতিতে বসিবার জন্য বাঙ্গালি এত ব্যাকুল কেন? বাঙ্গালির দুর্বুদ্ধি কি ঘুচিবে না? বাঙ্গালির সুদিনের সূত্রপাত কি হইবে না?

শ্রীসঃ—

একটি পরের কথা।

পরের কথা কহিতে নাই। তবে পরকে লইয়া ঘর করিতে হইতেছে, তাই পরের কথা না কহিলেও চলে না। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ কেন যুদ্ধ করিলেন এ পর্য্যন্ত ভাল বুঝা গেল না। কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ বড় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ হইল, কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ্যের ধন রাশির জন্য যুদ্ধ হইল। কোন্‌টা ঠিক কথা তাহা এখন বলা যায় না এবং

বলা ও উচিত নয়। কোন্ কথাটা ঠিক যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা তাহা এক রকম স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আমরা বলিব না। ধনলোভ যদি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হয়, ইংরাজ তাহা মানিবেন না। মানিলে বিশেষ হানি কিছু নাই, বরং কিছু লাভ আছে। ধনলোভে পরের রাজ্য লইলাম, এ কথাটা বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই যদি ঠিক হয় তবে স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিলে ইংরাজের উপর বাস্তবিক তত অভক্তি হয় না। বরং সে কথাটা ছাপাইয়া, ব্রহ্মবাসীদিগের উপকার কি এমনি কোন একটা লম্বা চৌড়া কারণ নির্দ্দেশ করিলে ইংরাজের উপর বেশি অভক্তি হয়। কিন্তু ধনলোভ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হইলেও ইংরাজ তাহা মানিবেন না। ব্রহ্মরাজের অত্যাচারই যুদ্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। ষ্টেট্‌সমান সংবাদপত্রের সুযোগ্য এবং সরলমতি সম্পাদক মহাশয় ও সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও সেই কারণটিকে প্রকৃত কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া দুই একটি কথা বলিব।

ব্রহ্মরাজ থিব যে অত্যাচারী ছিল তাহার প্রমাণ কই? তাহার অত্যাচার যদি প্রমাণীকৃত হয় তবে সে কি জন্য অত্যাচার করিয়াছিল তাহা ত বুঝিয়া দেখা চাই। অত্যাচার করিয়া থাকিলেই যে থিব রাজচ্যুত হইবে এমন ত কথা নাই। যাহাদিগকে থিব মারিয়া ফেলিয়াছিল তাহারা যদি থিবর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, থিবকে এবং তাহার পরিবারকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তবে তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকিলেও থিব ব্রাহ্মরাজ্যের রাজনীতি অনুসারে অন্যায় কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে। এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে থিবকে রাজ্যচ্যুত করিবার বিশিষ্ট কারণও জন্মে নাই। এ রকম কথা ও ত লোকে বলিতে পারে। এ কথার উত্তর কি?

বিশিষ্ট কারণেই হউক অথবা বিনা কারণেই হউক থিব যদি লোক হত্যা করিয়া থাকে, ইংরাজের তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ কি? থিব আপনার রাজ্যে আপনার প্রজাকে মারিয়াছে, ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? কাহাকে একটা অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে পাঁচজনে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহা নিবারণার্থ পাঁচ কথা কয় বটে; কিন্তু সে

যদি তাহাদের কথা না শুনে তবে তাহারা নাচার, তাহাদের আর কথা কহিবার অধিকার থাকে না। বিশেষ সে ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র সমাজস্থ হয় তবে ত কাহারো কোন কথা চলে না। শ্যাম রামকে মারিতেছে। হরি শ্যামকে নিষেধ করিল। শ্যাম নিষেধ বাক্য শুনিল না। হরি শ্যামকে মারিবে না কি? শ্যামের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায় রামের হাতে। রাম কেন শ্যামকে মারিয়া হউক কি অন্য যে প্রকারে হউক নিরস্ত করুক না। থিব স্বাধীন রাজা ছিল। সে অত্যাচার করিয়া থাকিলে ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? সে অত্যাচার নিবারণের উপায় তাহার প্রজাদের হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা ত কিছু করে নাই—আপনারা ও কিছু করে নাই এবং ইংরাজকে কি অপর কাহাকেও কিছু করিতে বলে নাই। তবে ইংরাজ কথা কন ই বা কেন, আর থিবকে মারেন ই বা কেন? যদিও ইংরাজ দয়াধিক্য বশতঃ কথা কন, তাঁহার কথা থিব না শুনিলে, থিবকে তিনি কোন্ স্বত্বে রাজ্যচ্যুত করেন? ষ্টেট্স্‌মান সম্পাদক মহাশয় একটা international police-এর কথা কহিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, কোন রাজা যদি তাঁহার প্রজার উপর বেশী অত্যাচার করেন অথবা প্রজাকে মারিয়া ফেলেন, তবে অন্য রাজার তাঁহার সেই অত্যাচার নিবারণ করিবার অধিকার আছে, এবং সেই জন্য অন্য রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে পারে। এ নিয়মটা কোথাও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রচলিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপে কেবল তুর্কের সম্বন্ধে চলে, আর কাহারো সম্বন্ধে চলে না। এসিয়াতে এ নিয়ম কখনই চলে নাই, এবং চলিতে পারে এসিয়ার এখনও সে রকম অবস্থা হয় নাই। ইংরাজ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, ইংরাজ এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে; ব্রহ্মদেশবাসী তেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নয়, ব্রহ্মদেশবাসী এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে না। অতএব international police-এর নিয়ম এসিয়াতে কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। যে নিয়ম international হইবে, তাহা সকল জাতির বুঝিয়া স্বীকার করা চাই, নহিলে সে নিয়ম কেমন করিয়া *international* হইবে? আর একটা কথা এই। মনে কর এসিয়াতে international police-এর নিয়মটা

যুক্তিযুক্তরূপেই হউক আর অযৌক্তিকরূপেই হউক খাটান গেল। তার পর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন বড় রাজার যদি একজন ছোট রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকে তবে একজন ছোট রাজারও একজন বড় রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজের অত্যাচার বা অন্যায় বৃহৎ ইংরাজ-রাজ নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজ যদি বৃহৎ ইংরাজ-রাজের অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিতে চাহেন তাহাতে বৃহৎ ইংরাজরাজ কি কোন কথা কহিবেন না? এই যে ইংরাজরাজ্যে প্রতি-বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক মরিয়া যাইতেছে, ইংরাজরাজ তাহা নিবারণের বিশেষ কিছু উপায় করিতেছেন না। ইহাও ত একরকম প্রজা মারা বটে! এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজে যে কত লোক মরিল; সেও ত ইংরাজরাজের দোষে এবং সেও ত এক রকম প্রজা মারা বটে। সে রকম মারা যে একেবারে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলার অপেক্ষা ভয়ানক মারা। কিন্তু ব্রহ্মরাজ কি অপর কোন ক্ষুদ্র রাজা যদি সেই জন্য ইংরাজকে কোন কথা বলিতেন বা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেন তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ কি বড় সন্তুষ্ট হইতেন, না তাহাকে ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া আপনার শাসন-প্রণালী সংশোধন করিতেন? কখনই নয়। তবে কেন এই লম্বাচৌড়া international police-এর দোহাই দিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধের পোষকতা কর? আরো এক কথা। বড় রাজা ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজা বড় রাজাকে দমন করিতে পারে না। তবে বড় রাজা এবং ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে কেমন করিয়া international police-এর নিয়ম খাটিতে পারে? যে নিয়ম সকলের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, সে নিয়ম সকলের প্রতি কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। ফল কথা, international police-এর কোন অর্থ নাই। ও কথাটা না তোলাই ভাল।

শেষ বলিবে যে অত্যাচার বা অন্যায় দেখিলে যাহার তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। মানিলাম, তাহাই ঠিক। কিন্তু অত্যাচার, অন্যায় ও নৃশংসতা ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ভয়ানক

মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার অবিচার হইয়া থাকে, দয়ালু ইংরাজ ত সেখানে গিয়া অত্যাচার নিবারণ করিয়া সুশাসন স্থাপন করেন না। তাহা করিবার ত ইংরাজের ক্ষমতা আছে। তবে কি দয়া ধর্ম্মের কথাটাও মিথ্যা?

এই সকল কারণে বাঙ্গালি ব্রহ্মযুদ্ধের বিরোধী। বাঙ্গালিকে বুঝাইয়া দেও যে ব্রহ্মযুদ্ধটা ন্যায় যুদ্ধ হইয়াছে, সে অবশ্যই ভুল স্বীকার করিবে।

শ্রীসঃ—

NEW YEARS DAY.

DRAMATIS PERSONAE.

রাম বাবু
শ্যাম বাবু
রাম বাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর প্রবেশ।

(রাম বাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যাম বাবু। গুড্ মর্ণিং রাম বাবু—হা ডু ডু?

রাম বাবু। গুড্ মর্ণিং শ্যাম বাবু—হা ডু ডু?

[উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দ্দন]

শ্যাম বাবু। I wish you a happy new year, and many many returns of the same.

রাম বাবু। The same to you.

[শ্যাম বাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রাম বাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রাম বাবুর স্ত্রী। 'ও কে এসেছিল ?'

রাম বাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যাম বাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রাম বাবু। সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে ঝেঁক্‌রে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে ঝেঁকরে দিলে ? তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। তাই হাতাহাতি ! কি পাপ ! ওকে বলে Shaking hands ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে ! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের পরিবার নই ! তা, তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে; তা কি ধর্‌তে আছে ?

স্ত্রী। আহা তাইত ! ছ'ড়ে গেছে যে ? অধঃপেতে ডাকরা মিন্‌সে ! সকাল বেলা মর্‌তে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি কর্‌তে এয়েছেন ! আবার নাকি হুটোহুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

রাম। সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে সেও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু !" তুমিও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু !" তা, হাঁ ডু ডু ডু খেল্‌বার কি আর তোমাদের বয়স আছে ?

রাম। আঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল ! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye do ? উচ্চারণ করিতে হয়, "হা ডু ডু !"

স্ত্রী। তার অর্থ কি ?

রাম। তার মানে, "তুমি কেমন আছ ?"

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তুমি কেমন আছ," তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে !

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীত।

স্ত্রী। পাল্‌টে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেনরে ছুঁচো?" সেও কি তোমাকে পালটে বল্‌বে, "লেখাপড়া করিসনে কেনরে ছুঁচো?" এইটা সভ্য রীতি?

রাম। তা নয় গো, তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়া পালটে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দুবেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচবার তোমার কাছে খবর নিতে হয় তুমি কেমন আছ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে!

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্‌তে পারি। বুঝিয়ে দাও না? আচ্ছা শ্যাম বাবু এলো আর কি কিচির মিচির ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল; যদি হাঁডু ডু ডু খেলার কথা বল্‌তে আসেনি, তবে কি কর্‌তে এয়েছিল?

রাম। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এয়েছিল।

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশুর শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা শ্রাবণ থেকে?

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বৎসর ব'লে এত গুলা মদের বোতল আনিয়েছ কেন?

রাম বাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম,

তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ কর্‌তে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ কর্‌ব, যে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্ব্বোধ!

স্ত্রী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে?

স্ত্রী। এত কপি সালগম গাজর বেদানা পেস্তা আঙ্গুর ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বল্‌বে।

রাম। কি কথা বলিবে?

স্ত্রী। বল্‌বে এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে।

[ইতি প্রহার ভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]

সংসার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর ভারি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌর বর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এবং অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে একটী "হৌসে" কর্ম্ম লইয়াছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হৌসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত যাইবার সময় হৌসের পুরাতন ভৃত্যের পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সৌভাগ্য যখন একবার উদয় হয় তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চার বৎসর হৌসের অনেক লাভ হওয়ায় সাহেবগণ বড়ই তুষ্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকেই হৌসের বড় বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ দু পয়সা আয় হইল, এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন, এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। বৈঠকখানায় দেবী বাবু প্রত্যহ ৮ টার সময় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবীবাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাটীতে বহু সমারোহে পূজা হইত, এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল,

প্রত্যহ তাহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান ধর্ম্ম করিত। দুই একজন করিয়া দেবীবাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি কুটুম্বিনীগণ সেই বিস্তীর্ণ বাটীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্ব্বদা তথায় আসিত, সুতরাং বাহির বাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাকীর্ণ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিলেন, এবং দেবীবাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈটকখানায় লইয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা আছে, দুই তিনটী মোটা মোটা গিদ্দে, এবং একটী কুলুঙ্গিতে দুইটী শামাদান। ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবিতে পরিপূর্ণ। কোথাও হিন্দু দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে জর্ম্মনি দেশস্থ অতি অল্প মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে ছবির কোন রমণী চুল বাঁধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্দ্ধেক আবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেজীওর একখানি "মেগ্‌ডেলীন", টিসীয়নের "ভিনস্" ও লেণ্ডসিয়রের এক জোড়া হরিণ ও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকৃষ্ট যে ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নিলামে যাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং দেবী বাবু বা দেবী বাবুর সরকারের রুচি সম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিও গ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈটকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেম সর্ব্বদাই দেবী বাবুর সহিত আলাপ করিতে যাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করিয়াও বলিতেন। দেবী বাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন হেম বাবুর মত লোকের অবশ্যই একটী চাকুরি হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেম বাবুকে লইয়া যাইবেন, হেম বাবুর ন্যায় লোকের জন্য তিনি এই টুকু করিবেন না তবে কাহার জন্য করিবেন?—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয় হেমচন্দ্র একটু আশ্বস্ত হইলেন; দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রধান গুণ এইটী

যে তাহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাস. বাক্য দিতে ক্রুটী করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবী বাবু ক্রুটী করিলেন না। তিনি দুই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী হেম বাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন। বিন্দু কায কর্ম্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু দেবী বাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না, সুতরাং এক দিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া সুধাকে ও দুইটী ছেলেকে লইয়া পালকী করিয়া দেবী বাবুর বাড়ী গেলেন। দেবী বাবু তখন আপিশে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তব্ধ; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন সে অন্দর মহল লোকাকীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ ঝাট দিতেছে কেহ ঘর নিকাইতেছে. কেহ কাপড় শুখাইতে দিতেছে, কেহ এখনও মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়া, মা ঠাকরুণের কথাই গায়ে সয় না,—কোনও আশ্রিতা আত্মীয়া কিছু বলিয়াছে তাহা সহিবে কেন—দশ গুণ শুনাইয়া দিতেছে, ভদ্র রমণী সে বাক্যলহরী রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইলেন। পাতকো তলায় ঝি বৌয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরীগণ তথায় অবর্ত্তমানা প্রিয় বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়ে দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "হেঁলা ও বাড়ীর ন বৌয়ের জাঁক দেখিছিস, সে দিন যগ্‌গিতে এসেছিল তা গয়নার জাঁকে আর ভুঁয়ে পা পড়ে না, হেঁ গা তা তার স্বামীর বড় চাকুরি হয়েছে হই-ইচে, তা এত জাঁক কিসের লা।" কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "তা হোক বন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার শাশুড়ী কি হারামজাদা। মা গো মা, অমন বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসে বলে সে বুড়ী যেন দু চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। ঢের ঢের দেখেছি, অমনটী আর দেখিনি।" অন্য সুন্দরী গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন "ও সব সোমান গো, সব সোমান, শাশুড়ী আবার কোন্ কালে মায়ের মত হয়, দু বেলা

বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যায়।” “ওলো চুপ কর লো চুপ কর, এখনি নাইতে আসবে, তোর কথা শুনতে পেলে গায়ের চামড়া রাখবে না। তবু বন আমাদের বাড়ী হাজার গুণে ভাল, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শাশুড়ী মাগীর কথা শুনেছিস, সে দিন বউকে কাঠের চালার বাড়ী ঠেঙ্গিয়েছিল।” “তা সে শাশুড়ীও যেমন বৌও তেমন, সে নাকি শাশুড়ীর উপর রাগ করে হাতের নো খুলে ফেলেছিল, তাহাতেই ত শাশুড়ী মেরেছিল।” “তা রাগ করবে না, গায়ের জ্বালায় করে, স্বামীটাও হয়েছে নক্ষীছাড়া, তার মা ও তেমনি, তা বৌয়ের দোষ কি?” ইত্যাদি।

রান্নাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়াগণ বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ দুটো কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ ছেলে কোলে করে কেবল একটু ঝিমোতে ছিলেন। বামীর মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন “হে লা ও পালকী করে কারা আজ এলো? ঐ যে হন্ হন্ করে শিড়ি দে উঠে গিন্নীর কাছে গেল।” শ্যামীর মা, “তা জানিস নি ওরা যে এক ঘর কায়েত কোন পাড়া গাঁ থেকে এসেছে, এই ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেখলি, তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিষে চাকরি করবে, ওর বন ছোটটা বিধবা হয়েছে। গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।” “না জানি কেমন তর কায়েত, গায়ে দুখানা গয়না নেই, নোকের বাড়ী আসবে তা পায়ে মল নেই, খালি গায়ে ভদ্র নোকের বাড়ী আসতে নজ্জা করে না?” “তা বোন, ওরা পাড়া গাঁথেকে এসেছে, আমাদের কলকেতার চালচোল এখনও শেখেনি।” “তা শিখবে কবে? দু ছেলের মা হয়েও শিখলে না ত শিখবে কবে?” “তা গরিবের ঘরে সকলেরই কি গয়না থাকে?” “তবে এমন গরিবকে ডাকা কেন? আমাদের গিন্নীর ও যেমন আক্কেল, তিনি যদি ভদ্র ইতর চিনবেন তবে আমাদেরই এমন কষ্ট কেন বল? এই ছিলুম আমার মাসতুত বনের বাড়ী, তা সে আমার কত যত্ন করত, দুবেলা দুদ বরাদ্দ ছিল। তারা লোক চিনত। গিন্নী যদি লোক চিনবে তবে আমার এমন দুরবস্থা? তা গিন্নীরই দোষ কি বল? যেমন বাপ মায়ের মেয়ে তেমনি স্বভাব চরিত্র,—টাকা হলে জাত ত আর ঘোচে না।” এইরূপে বৃদ্ধা আপন

গৌরব নাশের আক্ষেপ ও আশ্রয়দাত্রী ও তাঁহার পিতা মাতার অনেক সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল দেওয়া বারাণ্ডা দিয়া গিন্নীর শোবার ঘরে গেলেন। গিন্নী তেল মাখছিলেন একজন আশ্রিতা আত্মীয়া তাঁহার চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করে তেল মালিস করিয়া দিতেছেন। তাঁহার বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড় মানুষ গিন্নীদের একটা কিছু থাকেই.), তা কবিরাজ বলিয়াছে রোজ স্নানের আগে এক ঘণ্টা করিয়া বেশ করে তেল মালিস করিতে। গিন্নী দেবী বাবুর ন্যায় বলিষ্ঠ নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ, চেহারা খানা একটু রুক্ষ, মেজাজটা একটু খিট্‌খিটে. সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়া, দাসী, বৌ, ঝি, সকলেই সে মেজাজের গুণ প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা অনুভব করিত, শুনিয়াছি দেবী বাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আস্বাদন পাইতেন দেবী বাবু স্বয়ং বিষয় করিয়াছেন. তাঁহার আচরণটী পূর্ব্ববৎ নম্র ছিল, কিন্তু নূতন বড় মানুষের মহিষীব ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধন দর্প দেবী বাবুব গৃহিণীতেই একমাত্র আধার পাইয়া দ্বিগুণ ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল ?

গিন্নী। "কে গা তোমরা ?"

বিন্দু। "আমরা তালপুখুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কলকেতা এসেছি। আপনি আসতে বলেছিলেন, কাযের গতিকে এত দিন আসতে পারিনি, তা আজ মনে করলুম দেখা করে আসি।"

গিন্নী। "হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বস বন। তখনকার কালে নূতন নোক এলেই পাড়ার লোকেদের সঙ্গে দেখা করা রীতি ছিল, তা এখন বাছা সে রীতি উঠে গিয়েছে, এখন নোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল তোমরা এসেছ, ভাল। তালপুখুর কোথায় গা ? সেখানে ভদ্র নোকের বাস আছে ?"

বিন্দু। "আছে বৈকি, সেখানে তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রনোক আছে, আর অনেক ইতর নোকের ঘর আছে। ঐ বর্দ্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটওয়া থেকে ৭। ৮ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুখুর গ্রাম।"

গিন্নী। "হাঁ২ কাটওয়া শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের ঝিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে।" অল্প হাস্য সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গৃহিণী বলিলেন "ঐটি বুঝি তোমার বন? আহা এই কচি বয়সে বিধবা হয়েছে! তা ভগবানের ইচ্ছা, সকলের কপালে কি সুখ থাকে তা নয়, সকলের টাকা হয় তা নয়, বিধাতা কাউকে বড় করেন কাউকে ছোট করেন।"

প্রথম সংখ্যক আশ্রিতা, যিনি চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন "তা নয় ত কি, এই ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের বাবুর যেমন টাকা কড়ি, ঘর সংসার, তেমন কি সকলের কপালে ঘটে? তা নয়, ও যার যেমন কপালের লিখন।"

দ্বিতীয় সংখ্যক আশ্রিতা অনেকক্ষণ ক্রমাগত তেল মালিশ করিতে করিতে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারও একটী কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন "কেবল টাকা কড়ি কেন বল বন, যেমন মান, তেমনি যশ, তেমনি লেখা পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। লক্ষ্মী সরস্বতী যেন ঐ খাটের খুরোয় বাঁধা আছে।"

ঈষৎ হাস্যের আলোক গিন্নীর রুক্ষ বদনে লক্ষিত হইল, কথাটী তাঁহার মনের মত হয়েছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন "আহা তুমি কতক্ষণ মালিশ করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে। আর সব গেল কোথা, কাযের সময় যদি একজন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে তা কায করবে কেমন করে?"

তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল; দাসীতে২ এই কথা কানা কানি হইতে হইতে তারের খবরের ন্যায় পাতকোতলায় পহুঁছিল। সহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল, বৌয়ে বৌয়ে ঝিয়ে ঝিয়ে কানা কানি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে গিয়া পহুঁছিল। তথায় যে উনানে কাটি দিতেছিল সে স্তম্ভিত হইল, যে ঝিমাইতেছিল সে সহসা জাগরিত হইল, ও শ্যামীর মা ও বামীর মা গিন্নীর সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে করিতে সহসা হৃদ্‌কম্প বোধ করিল। তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া সভয়ে গিন্নীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বামীর মা। "হে গা আজ বুকটা কেমন আছে গা? আমি এই রান্নাঘরে উনুনে কাট দিচ্ছিলুম তাই আস্তে পারি নি, তা একবার দি না বুকটা মালিস করে।"

গিন্নী। "এই যে এসেছ, তবু ভাল। তোমাদের আর বার হয় না, নোকটা মবে গেল কি বেঁচে আছে একবার খোঁজ খবরও কি নিতে নেই। উঃ যে বেথা, একি আর কমে, পোড়ামুখো কবরেজ এই এক মাস ধরে দেখছে তা ও ত কিছু কত্তে পাল্লে না। তা কবরেজেরই বা দোষ কি, বাড়ীর নোক একটু সেবা টেবা করে, একটু দেখে শুনে তবে ত ভাল হয়। তা কি কেউ করবে? বলে কার দায়ে কে ঠেকে?"

বামীর মা ও শ্যামীর মা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া মালিশ আরম্ভ করিল, গিন্নী পা দুটী ছড়াইয়া মুখে তেল মাখিতে মাখিতে আবার বিন্দুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। "তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে, অমন কাহিল কেন গা?"

বিন্দু। "ওরা হয়ে অবধি কাহিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, আর ছোটটীর আবার একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন সেরেছে।"

গৃহ। "তাইত, হাড় গুণো যেন জির জির করছে! তা বাছা একটু জেয়দা করে দুদ খাওয়াতে পার না, তা হলে ছেলে দুটী একটু মোটা হয়। এই আমার ছেলেদের দিন এক সের করে দুদ বরাদ্দ, সকালে আধ সের বিকেলে আধ সের। তা না হলে কি ছেলে মানুষ হয়?"

বিন্দু। "দুদ খায়, গয়লানীর যে দুদ, আদ্দেক জল, তাতে আর কি হবে বল?"

গৃ। "ও মা ছি! তোমরা গয়ালনীর দুদ খাওয়াও, আমাদের বাড়ীতে গয়লানী পা দেবার যো নেই। আমাদের বাড়ীর গরু আছে, ঐ সে দিন ৮০ টাকা দিয়ে বাবু আপিষের কোন সাহেবের গরু কিনে এনেছেন, ৫ সের করে দুদ দেয়। তা ছাড়া দুটা দিশি গরু আছে, তাহারও ৩।৪ সের দুদ হয়। বাড়ীর গরুর দুদ না খেয়ে কি ছেলে মানুষ হয়, গয়লানীর আবার দুদ, সে পচা পুখুরের পানা বৈত নয়, সে নদ্দমার জল বৈত নয়।"

বিন্দু একটু ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন "তা সকলের ত সমান

অবস্থা নয়, ভগবান্ আপনার মত ঐশ্বর্য্য ক জনকে দিয়াছেন? আমরা গরু কোথা পাব বল? যা পাই তাইতে ছেলে মানুষ কত্তে হয়।"

একটু হৃষ্ট হইয়া গৃহিণী বলিলেন,

"তা ত বটেই। তা কি করবে বাছা, যেমন করে পার ছেলে দুটীকে মানুষ কর। তা যখন যা দরকার হবে আমার কাছে এস. আমার বাড়ীতে দুধের অভাব নেই, যখন চাইবে তখনই পাবে।"

বামীর মা। "তা বই কি, এ সংসারে কি কিছুর অভাব আছে? দুধ দৈয়ের ছড়াছড়ি আমরা খেয়ে উঠ্‌তে পরি নি, দাসী চাকরে খেয়ে উঠতে পারে না। তোমার যখন যা দরকার হবে, বাছা গিন্নীর কাছে এসে বোলো, গিন্নীর দয়ার শরীর।"

শ্যামীর মা। "হাঁ তা ভগবানের ইচ্ছায় যেমন ঐশ্বর্য্য তেমনি দান ধর্ম্ম। গিন্নীর হিল্লতে পাড়ার পাঁচ জন খেয়ে বত্তাচ্ছে।"

গৃ। "তোমার স্বামীর একটী চাকরী টাকরী হল? বাবুর কাছে এসেছিল না।"

বিন্দু। "হেঁ এসেছিলেন তা এখনও কিছু হয় নাই, বাবু বলেছেন একটা কিছু করে দিবেন। তা আপনারা মনোযোগ করিলে চাকরী পেতে কতক্ষণ?"

গৃ। "হাঁ তা বাবুর সাহেব মহলে ভারি মান, তাঁর কথা কি সাহেবরা কাট্‌তে পারে? ঐ সে দিন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর ছোঁড়াটাকে একটা সরকারী করে দিয়েছেন, বামুনের ছেলেটা হেঁটে হেঁটে মরতো, খেতে পেত না, তাই বল্লুম ছেলেটার কিছু একটা করে দাও। বাবু তখনই সাহেবদের বলে একটা চাকুরি করে দিলেন। আর ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর ছোগরাটা, সে এখানেই থাকে, বাজার টাজার করে; তার মা তিন মাস ধরে আমার দোরে হাঁটাহাঁটি করলে; তার বৌ একদিন আমার কাছে কেঁদে পড়ল, যে সংসারে চাল ডাল নেই, খেতে পায় না। তা কি করি, তারও একটা চাকরি করে দিলুম। তবে কি জান বাছা, এখন সব ঐ রকম হয়েছে, পয়সা ত কারও নাই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে, আমি আর ব্যারাম শরীর নিয়ে পেরে

উঠি নি। এ যেন কালিঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে। তা বলো. তোমার স্বামীকে বাবুর কাছে আসতে, দেখা যাবে কি হয়।”

দেড় ঘণ্টার পর গৃহিণীর তৈলমার্জ্জন কার্য্য সমাপ্ত হইল, তিনি স্নানের জন্য উঠিলেন।

বিন্দু সর্ব্বদাই ধীর স্বভাব, সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে এখনও শিখেন নাই, এই প্রথম শিক্ষাটা তাঁহার একটু তিক্ত বোধ হইল। ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া ভগিনী ও সন্তান দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীন বাবু।

কলিকাতায় আসিবার পর কয়েক সপ্তাহ সুধা বড় আহ্লাদে ছিল। যাহা দেখিত সমস্তই নূতন, যেখানে যাইত নূতন২ দৃশ্য দেখিত, বাড়ীতে যে কায করিতে হইত তাহাও অনেকটা নূতন প্রণালীতে, সুতরাং সুধার সকলই বড় ভাল লাগিত। কিন্তু কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল পল্লীগ্রামের গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, বিন্দুদের ক্ষুদ্র বাটীতে বড় বাতাস আসিত না, কোঠা ঘরগুলি অতিশয় উত্তপ্ত হইত। সে কষ্টতেও সুধা কষ্ট বোধ করিত না, কিন্তু তাহার শরীর একটু অবসন্ন ও ক্ষীণ হইল, প্রফুল্ল চক্ষু দুটী একটু ম্লান হইল, বালিকার সুগোল বাহু দুটী একটু দুর্ব্বল হইল। তথাপি বালিকা সমস্ত দিন গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত অথবা বাল্যোচিত চাপল্যের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, সুতরাং হেম ও বিন্দু সুধার শরীরের পরিবর্ত্তন বড় লক্ষ্য করিলেন না।

বর্ষার প্রারম্ভে, কলিকাতার বর্ষার বায়ুতে সুধার জ্বর হইল। একদিন

শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইল, বৈকালে বালিকা কোনও কায কর্ম্ম করিতে পারিল না, শয়ন ঘরে একটী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু সে ঘরে আসিয়া দেখিল বালিকা তখনও শুইয়া রহিয়াছে। লিলেন,

"এ কি সুধা, এ অবেলায় শুইয়া কেন? অবেলায় ঘুমালে অসুক করবে, এস ছাতে যাই।"

সুধা। "না দিদি, আমি আজ ছাতে যাব না।"

বিন্দু। "কেন আজ অসুক কচ্চে নাকি? তোমার মুখ খানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে যে।"

সুধা। "দিদি আমার গা কেমন কচ্চে, আর একটু মাথা ধরেছে।"

বিন্দু সুধার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা অতিশয় উত্তপ্ত, কপাল গরম হইয়াছে। বলিলেন "সুধা তোমার জ্বরের মত হইয়াছে যে। তা মেজেয় শুয়ে কেন, উঠে বিছানায় শোও, আমি বিছানা করে দিচ্চি।"

সুধা। "না দিদি এ অসুখ কিছু নয়, এখনই ভাল হয়ে যাবে, আমি এখানে বেশ আছি, আর উঠতে ইচ্ছে কচ্চে না।"

বিন্দু। "না ব'ন্ উঠে শোও, তোমার জ্বরের মতন করেছে, মাথা ধরেছে, মাটিতে কি শোয়?"

বিন্দু বিছানা করিয়া দিলেন, ভগিনীকে তুলে বিছানায় শোয়াইলেন, এবং আপনি পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে হেম ও শরৎ আসিলেন, অনেকক্ষণ উভয়ে বিছানার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তখন বিন্দু হেমের জন্য ভাত বাড়িতে গেলেন। শরৎকেও ভাত খাইতে বলিলেন, শরৎ বলিলেন বাড়িতে গিয়া খাইবেন।

ভাত বাড়া হইল, হেম ভাত খাইতে গেলেন, শরৎ একাকী সেই ক্লান্তা বালিকার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালিকার শরীর তখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়াছে, বালিকা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, কেবল জল চাহিতেছে, আর অতিশয় শিরোবেদনার জন্য এক একবার কাঁদিতেছে। শরৎ সযত্নে চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন,

মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু জল দিয়া আপন বস্ত্র দিয়া ওষ্ঠ দুটী মুছাইয়া দিলেন।

হেম শীঘ্র খাইয়া আসিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া শরৎকে বাটী যাইতে বলিলেন। শরৎ দেখিলেন সুধার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি সে দিন রাত্রি তথায় থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

বিন্দু ও খাইয়া আসিলেন, শরৎ বলিলেন,

"বিন্দু দিদি, আজ আমি এখানে থাকিব, তোমদের হাঁড়ীতে যদি চাট্টী ভাত থাকে আমার জন্য রাখিয়া দাও।"

বিন্দু। "ভাত আছে, আজ সুধার জন্য চাল দিয়ে ছিলুম, তা সুধা ত খেলে না, ভাত আছে। কিন্তু তুমি কেন রাত জাগবে, আমরা দুই জনে আছি সুধাকে দেখব এখন, তুমি বাড়ী যাও, রাত দুপুর হয়েছে।"

শরৎ। "না বিন্দু দিদি, তোমার ছোট ছেলেটির অসুখ করেছে তাকেও তোমাকে দেখতে হবে, আর হেম বাবু আজ অনেক হেঁটেছেন, রাত্রিতে একটু না ঘুমালে অসুখ করবে। তা আমরা দুই জনে থাকলে পালা করে জাগতে পারব।"

বিন্দু। "তবে তুমি ভাত খেয়ে এস, তোমার জন্য ভাত বেড়ে দি?"

শরৎ। ভাত বেড়ে এই ঘরের এক কোনে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও, আমি একটু পরে খাব।"

বিন্দু। "সে কি? ভাত কড়কড়ে হয়ে যাবে যে। অনেক রাত হয়েছে, কখন খাবে?"

শরৎ। "খাব এখন বিন্দু দিদি, আমি ঠাণ্ডা ভাতই ভাল বাসি; তুমি ভাত রেখে দাও।"

বিন্দু রান্নাঘরে গেলেন, ভাত ব্যঞ্জনাদি থালা করিয়া সাজাইয়া আনিয়া সেই ঘরের এক কোনে রাখিয়া ঢাকা দিলেন। তাঁহার ছেলে দুটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের শোয়াইলেন। অন্য দিন সুধা বিন্দুর সঙ্গে ও শিশু দুটীর সঙ্গে এক খাটে শুইতেন, আজ তাহা হইল না। আজ হেম বাবুর নিকট শিশু দুটীকে শোয়াইয়া বিন্দু ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন,

বিন্দুর মাথার কাছে তখনও শরৎ বসিয়া নিঃশব্দে রোগীর সুশ্রূষা করিতেছিলেন।

শরৎ। "হেম বাবু আপনি এখন একটু ঘুমুন, আবার ও রাত্রিতে আমি আপনাকে উঠাইয়া দিয়া আমি একটু শুইব। সুধার গা অতিশয় তপ্ত হইয়াছে বড় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একজন বসিয়া থাকা ভাল। বিন্দু দিদি একা পারবেন না।"

হেমচন্দ্র শয়ন করিলেন। বিন্দু ও শরৎ রোগীর শয্যায় একবার বসিয়া একবার বালিসে একটু ঠেসান দিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রোগীর আজ নিদ্রা নাই, অতিশয় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শিরোবেদনায় অধীর হইয়া দিদির গলায় হাত জড়াইয়া এক একবার কাঁদিতেছে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বার বার জল চাহিতেছে। শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে জল দিতে লাগিলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বিন্দু অতিশয় জেদ করাতে শরৎ উঠিয়া গিয়া ভাত খাইলেন। তখন সুধার রোগের একটু উপশম হইয়াছে, শরীরের উত্তাপ ঈষৎ কমিতেছে, যাতনার একটু লাঘব হওয়ায় বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিন্দু বলিলেন "শরৎ বাবু, তুমি এখন বাড়ী যাও, সুধা একটু ঘুমাইয়াছে, তুমি শোওগে, সমস্ত রাত্রি জাগিও না, অসুখ করিবে।"

শরৎ। 'বিন্দু দিদি তোমার কি সমস্ত রাত্রি জাগা ভাল, তুমি সমস্ত দিন সংসারের কায করিয়াছ, আবার কাল সমস্ত দিন কায করিতে হবে। আমার কি, আমি না হয় কাল কলেজে নাই গেলুম।"

বিন্দু। "না শরৎ বাবু, আমাদের রাত্রি জাগা অভ্যাস আছে, ছেলের ব্যারাম হয়, কিছু হয়, সর্ব্বদাই আমরা রাত্রি জাগিতে পারি, আমাদের কিছু হয় না। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সমস্ত রাত জাগা সয় না, আমার কথা রাখ, বাড়ী যাও। আবার কাল সকালে না হয় এসে দেখে যেও।"

সুধা তখন নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রার নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসে বালিকার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। শরৎ একটু নিরুদ্বেগ হইলেন; বিন্দুর নিকট

বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন; নিঃশব্দে নৈশ পথ দিয়া আপন বাটীতে যাইয়া প্রাতে ৪ঘটিকার সময় শয্যায় শয়ন করিলেন।

ছয়টার সময় উঠিয়া শরৎ চন্দ্র তাঁহার পরিচিত নবীন চন্দ্র নামক একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ভবানীপুরেই তাঁহার বাটী, ভবানীপুর অঞ্চলে একটু পসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, মনোযোগী, বুদ্ধিমান্ ও কৃতবিদ্য, কিন্তু ডাক্তারির পসার একদিনে হয় না, কেবল গুণেও হয় না, সুতরাং নবীন বাবুর এখনও কিছু পসার হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র নাথ ভবানীপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ উকিল, এবং চন্দ্র বাবুর সহায়তায় নবীন একটী ঔষধালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ অল্প, লোকসানেরই সম্ভাবনাই অধিক। এ জগতে সকলেই আপন আপন চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন যুবকের অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য, চারি দিকেই পথ অবরুদ্ধ, সকল পথই জনাকীর্ণ। তথাপি নবীন বাবু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, পরিশ্রম ও যত্ন ও গুণদ্বারা ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া ধীর চিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। দুই একটী বাড়ীতে তাঁহার বড় যশ হইয়াছিল, যাহাদিগের বাড়ীতে তাঁহাকে দুই চারিবার ডাকা হইয়াছিল তাহারা অন্য চিকিৎসক আনাইত না।

সাতটার সময় শরৎ নবীন বাবুকে লইয়া হেমবাবুর বাড়ী পঁহুছিলেন। নবীন বাবু অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া সুধাকে দেখিলেন। জ্বর তখন কমিয়াছে কিন্তু তাপযন্ত্রে তখনও ১০১দাগ দেখা গেল; নাড়ী তখনও ১২০। অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিলেন? রাত্রি অপেক্ষা অনেক জ্বর কমিয়াছে, আজ উপবাস করিলে জ্বর ছাড়িয়া যাবে বোধ হয়?"

নবীন। "বোধ হয় না। আমি রিমিটান্ট জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি। এখন একটু কমিয়াছে কিন্তু এখনও বেশ জ্বর আছে, দিনের বেলা আবার বাড়াই সম্ভব।"

হেম একটু ভীত হইলেন। সেই সময়ে ভবানীপুরে অনেক

রিমিট্যাণ্ট জ্বর হইতেছিল, অনেকের সেই জ্বরে মৃত্যু হইতেছিল। বলিলেন "তবে কি কয়েক দিন ভুগিবে ?"

নবীন। "এখনও ঠিক বলিতে পারি না, আর একবার আসিয়া দেখিলে বলিব। বোধ হইতেছে রিমিটাণ্ট জ্বর, তাহা হইলে ভুগিতে হবে বৈকি। কিন্তু আপনারা কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

এই বলিয়া একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন "এই ঔষধটী দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন, বৈকাল পর্য্যন্ত খাওয়াইবেন, বৈকালে আমি আবার আসিব। আর রোগীর মাথা বড় গরম হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত দিন মাথায় বরফ দিবেন, তৃষ্ণা পাইলেই বরফ খাইতে দিবেন, কিম্বা দুই একখানি আকের কুচি দিবেন। আর এরাকুট কিম্বা নেস্‌লের দুগ্ধ খুব খাওয়াইবেন, দিনে তিন চারি বার খাওয়াইবেন। এ পীড়ায় খাদ্যই ঔষধ।"

শরতের সহিত বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া নবীন বলিলেন "শরৎ তোমাকে একটী কায করিতে হইবে।"

শরৎ। "বলুন।"

নবীন। "হেম বাবুকে অবকাশ অনুসারে জানাইবেন এ চিকিৎসার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব না।"

শরৎ। "কেন ?"

নবীন। "তোমার সহিত আমার অনেক দিন হইতে বন্ধুত্ব. তোমাদের গ্রামের লোকের নিকট আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। হেম বাবুর অধিক টাকা কড়ি নাই, তাঁহার নিকট আমি অর্থ লইব না।"

শরৎ। "হেমবাবু দরিদ্র বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানি,—আপনি বিনা বেতনে চিকিৎসা করা অপেক্ষা আপনি অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি সত্য সত্যই তুষ্ট হইবেন।"

নবীন। "না শরৎ, আমার কথাটী রাখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা করিও। এ ব্যারাম সহসা ভাল হইবে আমি প্রত্যাশা করি না, আমাকে অনেক দিন আসিতে হইবে, সর্ব্বদা আসিতে হইবে। আমি যদি বিনা অর্থে

আসিতে পারি তবে যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখনই নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিব।”

শরৎ। “নবীনবাবু আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিব। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, অর্থেরও আবশ্যক আছে, বিনা পারিতোষিকে সকল রোগীকে দেখিলে আপনার ব্যবসা চলিবে কিরূপে ?”

নবীন। “না শরৎ, আমার সময়ের বড় মূল্য নাই, তুমি জান আমার এখনও অধিক পসার নাই, বাড়ীতেই বসিয়া থাকি। আর আমার পসার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হয় তাহা আমি জানি না, কিন্তু এই একটী রোগের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বন্ধুর জন্য একটী বন্ধুর কায কর, আমার এই কথাটী রাখিও।”

শরৎ সম্মত হইলেন, নবীন চলিয়া গেলেন। শরৎ তখন ঔষধ, পথ্য বরফ, আক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। সেদিন রোগীর শয্যার নিকট থাকিতে অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু হেম সে কথা শুনিলেন না, শরৎকে জোর করিয়া কলেজে পাঠাইলেন।

অপরাহ্ণে শরৎ নবীনবাবুর সহিত আবার আসিলেন। নবীনবাবু রোগীকে দেখিয়াই বুঝিলেন তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, এ স্পষ্ট রিমিটাণ্ট জ্বর। রোগীর চক্ষু দুটী আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে, রোগীর মাথায় সমস্ত দিন বরফ দেওয়াতেও উত্তাপ কমে নাই, সুধার স্বাভাবিক গৌর-বর্ণ মুখখানি জ্বরের আভায় রঞ্জিত, এবং সুধা সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিয়াছে, এপাশ ওপাশ করিয়াছে, কখনও শুইয়াছে, কখনও কায়না করিয়া দিদির গলা ধরিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু সভয়ে দেখিলেন নাড়ী প্রায় ১৫০, তাপযন্ত্র দিয়া দেখিলেন তাপ ১০৫ ডিগ্রি !

ঔষধ ঘন ঘন খাওয়াইতে বারণ করিলেন, আর একটী ঔষধ লিখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে সেটী দিনের মধ্যে তিন বার, এবং রাত্রিতে যখন আপনাআপনি ঘুম ভাঙ্গিবে তখন একবার খাওয়াইলেই হইবে। খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, শরৎকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন “এ রোগের খাদ্যই ঔষধ, সর্ব্বদা খাদ্য দিবে, যথেষ্ট খাওয়াইতে ত্রুটী হইলে রোগী বাঁচিবে না।”

কয়েক দিন পর্য্যন্ত সুধা সেই ভয়ঙ্কর জ্বরে যাতনা পাইতে লাগিল। শরৎ তখন হেমের কথা আর মানিলেন না, পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিবা রাত্রি হেমের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন, ঔষধ আনিয়া দিতেন, নিজ হস্তে সাবু বা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বিন্দু সংসার-কার্য্যবশতঃ কখন কখন রোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিলে শরৎ তথায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন, হেমচন্দ্র শ্রান্তি ও চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইলে শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই রোগীর সেবা করিতেন। জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে বালিকা ছট্‌ফট্ করিলে শরৎ আপনার শ্রান্তি ও নিদ্রা ও আহার ভুলিয়া গিয়া নানারূপ কথা কহিয়া, নানারূপ গল্প করিয়া, নানা প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়া সুধাকে শান্ত করিতেন, জ্বরের অসহ্য যাতনায়ও সুধা সেই কথা শুনিয়া একটু শান্তি লাভ করিত। কখনও বালিকার ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নিদ্রিত করিতেন, কখন তাহার অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল রক্তশূন্য গৌরবর্ণ বাহুলতা বা অঙ্গুলি গুলি হস্তে ধারণ করিয়া রোগীকে তুষ্ট করিতেন; মাথা উষ্ণ হইলে শরৎ সমস্ত দিন বরফ ধরিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অর্দ্ধস্ফুট শব্দগুলি শরতের কর্ণে অগ্রে প্রবেশ করিত, বালিকা শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে সেই শরতের হস্ত হইতে একবিন্দু জল বা দুইখানি আকের কুচি পাইত, নিদ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই শরতের হস্ত হইতে উত্তপ্ত পথ্য পাইত।

১০।১২ দিবসে সুধা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিত না, চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না, মুখখানি অতিশয় শীর্ণ, কিন্তু তখনও জ্বরের হ্রাস নাই। প্রাতঃকালে ১০২ দাগের বড় কম হয় না, প্রত্যহ বৈকালে ১০৫ দাগ পর্য্যন্ত উঠে। নবীন একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন "শরৎ, চতুর্দ্দশ দিবসে এ রোগের আরোগ্য হওয়া সম্ভব, যদি না হয় তবে সুধার জীবনের একটু সংশয় আছে। সুধা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আর অধিক দিন এ পীড়া সহ্য করিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না।"

ত্রয়োদশ দিবসে নবীন সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর রোগ লক্ষ্য করিলেন। বৈকালে জর একটু কম হইল, কিন্তু সে অতি সামান্য উন্নতি, তাহা হইতে কিছু ভরসা করা যায় না। শরৎকে বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে তুমি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিও, কল্য ভোরের সময় তাপমান

যন্ত্রে শরীরের কত উত্তাপ লক্ষ্য করিও। যদি ৯৮ হয়, যদি ৯৯ হয়, যদি ১০০ দাগের কম হয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ গ্রেন কুইনাইন দিও, ৮টার মধ্যেই আমি আসিব। যদি কাল বা পরশ্ব এ জ্বরেই উপশম না হয়, সুধার জীবনের সংশয় আছে।”

শরৎ এ কথা বিন্দুকে বলিলেন না, হেমকেও বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে খাইয়া আসিলেন এবং সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন;—সে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি সেই স্থান হইতে উঠিলেন না;—এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রায় চক্ষু মুদিত করিলেন না।

উষার প্রথম আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দিয়া অল্প অল্প দেখা গেল। তখন সে ঘর নিঃশব্দ। হেমচন্দ্র ঘুমাইয়াছেন, বিন্দু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ছেলে দুটীর পাশে শুইয়া পড়িয়াছেন,—ছেলে দুটী নিদ্রিত। সুধা প্রথম রাত্রিতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণ প্রায় প্রদীপের স্তিমিত আলোক রোগীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের উপর পরিয়াছে।

শরৎ ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে সেই অতি শীর্ণ বাহুটী আপন হস্তে ধারণ করিলেন,—নাড়ী এত চঞ্চল, তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। তখন তাপযন্ত্র লইলেন, ধীরে ধীরে তাপযন্ত্র বসাইলেন,—নিঃশব্দে ঘড়ির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় উদ্বেগে জোরে আঘাত করিতেছিল।

টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ির শব্দ হইতে লাগিল, এক মিনিট, দুই মিনিট, চারি মিনিট, পাঁচ মিনিট হইল; শরৎ তাপযন্ত্র তুলিয়া লইলেন। প্রদীপের নিকটে গেলেন, তাঁহার হৃদয় আরও বেগে আঘাত করিতেছে, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

প্রদীপের স্তীমিত আলোকে প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না। হস্ত দ্বারা ললাট হইতে গুচ্ছ২ কেশ সরাইলেন; ললাটের স্বেদ অপনয়ন করিলেন, নিদ্রাশূন্য চক্ষুদ্বয় একবার, দুইবার মুছিলেন, পুনরায় তাপ যন্ত্রেরদিকে দেখিলেন।

শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রদীপের আলোকে ঠিক বিশ্বাস হয় না,

বোধ হয় তাঁহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। ভরসায় ভর দিয়া গবাক্ষের নিকটে যাইলেন.—দিবালোকে তাপ যন্ত্র আবার দেখিলেন। জ্বর কল্য প্রাতঃকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাপ যন্ত্র ১০ ডিগ্রি দেখাইতেছে! ললাটে করাঘাত করিয়া শরৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

শব্দে বিন্দু উঠিলেন। ভগিনীর নিকট গিয়া দেখিলেন, সুধা নিদ্রা যাইতেছে; গবাক্ষের কাছে আসিয়া দিখিলেন শরৎ বাবু ভূমিতে শুইয়া আছেন। বলিলেন "আহা শরৎ বাবু রাত্রি জেগে ক্লান্ত হইয়াছেন, মাটিতে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আহা আমাদের জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন।" শরৎ উত্তর করিলেন, না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, কেন বিন্দুকে সে ব্যথা দিবেন?

আর এক সপ্তাহ জ্বর রহিল। তখন সুধা এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ ফিরিতে পারিত না, মাথা তুলিয়া জল খাইতে পারিত না, কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখন এক আধটী কথা কহিত, খেংরা কাঠির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি একটু একটু নাড়িত। সুধার মুখের দিকে চাওয়া যাইত না, অথবা নৈরাশ্যে জ্ঞান হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পুত্তলির ন্যায় বসিয়া শরৎ সেই মুখের দিকে সমস্ত রাত্রি চাহিয়া থাকিত গরিবের ঘরের মেয়েটী শৈশবে অন্ন বস্ত্রের কষ্টেও মাতৃস্নেহে জীবনধারণ করিয়াছিল, অকালে বিধবা হইয়াও ভগিনীর স্নেহে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পটী কয়েক দিন পল্লিগ্রামে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অদ্য সে পুষ্প বুঝি আবার মুদিত হইয়া নম্রশির নত করিল। দরিদ্র বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাস বুঝি সাঙ্গ হইল।

বিংশ দিবস হইতে নবীনও দিবারাত্রি হেমের বাটীতে রহিলেন। শরৎকে গোপনে বলিলেন "শরৎ তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি এই জ্বর না ছাড়ে তবে ঐ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় শরীরকে জীবিত রাখা মনুষ্য-সাধ্য নহে। আর দুই তিন দিন আমি দেখিব, তাহার পর আমাকে বিদায় দাও। আবার যাহা সাধ্য করিলাম, জীবন দেওয়া না দেওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

দ্বাবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় জ্বর একটু হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু ভরসা করা যায় না। রাত্রিতে দুই জনই শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহি-

লেন,—সে দিন সমস্ত রাত্রি সুধা নিদ্রিতা। এ কি আরোগ্যের লক্ষণ, না দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন?

অতি প্রত্যুষে শরৎ আবার তাপযন্ত্র বসাইলেন। তাপযন্ত্র উঠাইয়া গবাক্ষের নিকট যাইলেন। কি দেখিলেন জানি না, ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন!

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই যন্ত্র শরতের হস্ত হইতে লইলেন, বিপদ্‌কালে ধীরতাই চিকিৎসকের বীরত্ব। তাপযন্ত্র দেখিলেন,—আস্তে আস্তে শরৎকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

শরৎ হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে বালিকার পরমায়ু শেষ হইয়াছে?"

নবীন। "পরমেশ্বর বালিকাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এযাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।"

তাপযন্ত্র দেখিতে শরৎ ভুল করিয়াছিলেন. নবীন দেখাইলেন তাপযন্ত্রে ৯৮ ডিগ্রি লক্ষিত হইতেছে। সুধার শরীরে হাত দিয়া দেখাইলেন জ্বর নাই, জ্বর উপশম হওয়ায় ক্ষীণ বালিকা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে।

ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া প্রাতঃকালে শরং বাড়ী আসিলেন। এক সপ্তাহ তিনি প্রায় রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়ন দুটী কালিমা-বেষ্টিত, —কিন্তু তাঁহার হৃদয় আজি নিরুদ্বেগ।

সীতারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম কখন সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখন দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে ইনি একজন

রাণী হইবেন। রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল, যে ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল,

"মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন ?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন্—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল, যে প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ার মুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্‌ব ? তা, দাদা মহাশয় ! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল,

"কি হইয়াছে ? কি করিতে হইবে ?"

রমা। কি হইয়াছে ? কেন তুমি কি জান না, যে মুসলমান, মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে ?"

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে ? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা আছি কি জন্যে ? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন ?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে ?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত করবে—কিন্তু যদি না পারিলে ?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাহাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কান দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া, যে আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর।” যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।”

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, “মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখন কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও একাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।”

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?” গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল,

“চুপকর! যদি তোমার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুইজনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?”

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা, বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?”

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন

প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। "আমি কি প্রকারে সম্বাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সম্বাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান দিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?"—রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে!" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর একজন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত সব্যপাদম্।

* * * চক্রীকৃত চারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এদিকে বাদীর মনেও যা, বিবির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন, যে "আমরা এ রাজ্য মায় কিল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল,

"কি, এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার মুখের উপর পড়িয়াছিল! সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল! তা হ'লে মানুষ রাত্রি দিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনি পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবী-দুর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া, যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে, মূর্খ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সে কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল—"আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্র দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না!" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গেরেফতার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, মহিষী-সমীপে সম্বাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে, রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম, মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম, রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কান ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এইটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল, যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণা স্বরূপ আপনার চিত্ত রমারে দিয়া, চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে?"

গঙ্গা। কেন আসিব?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ্ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এদিগে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে, মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, কত টাকা চাও। চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন, তোরাব খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালামুখী মুরলা যা বলিল তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সম্বাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা, আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেম সম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত সে পথ বন্ধ! তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না, কেন না রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এখন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না কেন, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তা যে হইল না এমত নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কানে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন,

"তোমারা ভাই হামেশা রাতকো ভিতরমে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে, বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জানকাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান আছে না কি? আমিই ত তোর জান!

পাঁড়ে। তোম ছোড়্‌নে সে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন জান ছোড়্‌নে সে সব আঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ওর ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। আ—না ছোড়িস আমি তোকে ছোড়েঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোগা, বক্স হিঁয়া কিয়া কাম, হামকো কুছু মালুম নেহি, মালুম হোনাভী কুছ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ।

তৌ ভী, যব পুখিদা হোকে আতা যাতা, তব হম লোগোঁকে কুছ মিল না চাহিয়ে। তোমকো কুছ মিলা হোগা—আধা হমকো দে দেও, হম নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎ পরামর্শ। রাণীর কাছে গহনা খানা, কাপড় খানা, মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল,

"আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়ি ও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রে গঙ্গারাম পুর প্রবেশার্থ আসিল, পাঁড়েজী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে গল্প করিলে, যা দোষ আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত, একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তিনি কি আজ আসিলেন না?"

মু। তিনি আসিয়া ছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কায কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে

আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

রমার গা দিয়া, ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া, শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া, অজ্ঞান হইল। এমন কথা রমার এক দিনও মনে আসে নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল, যে সে দিকটা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের, একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে, এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া আসে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া, ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা, রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সর্চরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গরামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। বালি।

গঙ্গা। সে আবার কি?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল!

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই? বাতিকের ব্যামো।

গঙ্গা। সে কি?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দরমহলে ঢুকিতে পাও?

গঙ্গা। কেন আমি কি?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয়, ত আমাকে লইয়া চল। আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিল, এ দিগে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি তখন মন বুঝে? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে—সে কথাটা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভা মধ্যে বস্ত্র হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্ল্লভ। কিন্তু কাব্য এখন আমাদের সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তদনন্তর দুঃশাসন সভা মধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর! হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর।' সেই দুঃখিনী ভাবিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। * এ দিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ

---

* আসেন নাই।

করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্ম প্রভাবে নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলেরব আরম্ভ হইল।"

ইহার মধ্যে দুইটী পদ প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক—"গোপীজন বল্লভ!" এবং "ব্রজনাথ।" এই স্থানটিকে যদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা যায় এবং উহা যদি ব্যাসদেব বা অন্য কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা মৌলিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

এ রকম কাপড় বাড়াটা বড় অনৈসর্গিক ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অলীক এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার আমাদের অধিকার আছে। যাঁহারা বলিবেন, যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন তাহা স্বপ্রণীত নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারাই সম্পন্ন করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈসর্গিক উপায়ের দ্বারা করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টি গোচর হয় না। যাঁহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগান্তরে হইত, তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে জগৎ চিরকাল এক নিয়মেই চলিতেছে। যদি তাহার অন্যথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

এক্ষণে, মহাভারতের মৌলিক অংশ যদি কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে স্পষ্টই এই বস্ত্রবৃদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না কোন সমকালবর্ত্তী লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার করিতে সাহস পাইতেন না। তখনকার আর্য্যবংশীয়গণ এখনকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ হইতেন, তাহা হইলেই এ সাহস সম্ভব।

আর যদি মৌলিক মহাভারত সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত না হয়,

যদি তৎপ্রণেতা অনেক পরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিতে পারে, কেন না তাঁহাকে কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং কিম্বদন্তীর সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথা জড়াইয়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু মৌলিক মহাভারত যদি পরবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তাহা হইলে যে অংশ অনৈসর্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য।

আমরা মহাভারতে যেখানে যেখানে ব্রজলীলা প্রাসঙ্গিক এইরূপ কোন কথা পাই, সেই খানেই দেখি যে তাহা কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুভদ্রা হরণ, বা দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের ন্যায় প্রকৃত এবং নৈসর্গিক ঘটনার সঙ্গে এমন কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না; চক্রাস্ত্র দ্বারা শিশুপাল বধ, বা দ্রৌপদীর বস্ত্র বৃদ্ধি প্রভৃতি অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা দেখি। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় পাঠক তাহা করিবেন।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে দুইবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এমন রাগ যে যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন, যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।" তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা

উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়: শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদা কাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র ও নহে কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। ভরসা করি কোন পাঠক এসকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিগে মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে: ছোট ঠাকুরাণীটী সঙ্গে। মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সসম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কিনা তাহা আমাদের বিচারে কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

যদিও কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি এই মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় হইতে দুই একটা কথা চুনিয়া পাঠককে উপহার দিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হইবে না।

যথার্থ ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে। "যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন, এবং কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু বর্গকে বশীভূত করেন। যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন

ও সর্ব্ব ধর্ম্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।" তা হইলে পাঠকদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, যে এই লক্ষণচ্যুত কোনব্যক্তি বামনাই ফলাইলে, তাহার সঙ্গে শূদ্রবৎ ব্যবহার করিতে পারেন।

পরোপকারের নিয়ম—"অযাচিত হইয়া অন্যের প্রিয়কার্য্য করিবে।"

খ্রীষ্টানদিগের Doctrine of Repentance—"কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়।"*

তিন কথায় ধর্ম্ম শাস্ত্র সংগ্রহ—"কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে।"

Doctrine of Utility—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহা সত্য।"

যথার্থ তপস্যা কি? "ইন্দ্রিয় সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোঽনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই।"

যথার্থ যোগবিধি কি? "ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি।"

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কিছু সম্বন্ধ নাই। বড় মনোহর কথা, কিন্তু সকল গুলি কথা উদ্ধৃত করা যায় না।

তাহার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরভিন্ন দেবতা নাই।

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে

পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। একজন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বর-জ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্য বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বর-জ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মেনু লোকা লোকপালানু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষমূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন. সুতরাং যাঁহারা এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই. তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ. যে যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর দাঁড়ান হয়। স্থূল কথা যে উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দু ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু বরুণাদি নাম গুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষ মূলবের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণ গুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদি পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যে হেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগন মণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব।" এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদি পর্ব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

"হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতিপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন: তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ

উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার, তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ—"ওঁ সূর্য্য; অর্য্যমা ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ম্ভু ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীর বৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপঃ—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ণ ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্র বাহু; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরু-শক্তিধারী।"

তার পর আদি পর্ব্বে ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎ-পতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্রস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমান-কান্তি, গগণবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে, যে তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং। গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

পরকাল।

পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক—সকলেই এ বিষয়ে একটা না একটা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা শাকওয়ালী মাছওয়ালী যাহাকেই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সে অভ্রান্ত ভাবে উত্তর দিবে যে মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হইয়া যমের বাটী যাইতে হয়, তথায় বিচার হইয়া গেলে দণ্ড লইতে হয়—অথবা স্বর্গে যাইতে হয়। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। দার্শনিক মত স্বতন্ত্র। তাহা সত্য কি মিথ্যা দার্শনিকেরাই জানিতেন। পরলোকের কথা যিনি যাহাই বলুন, সমুদয় অনুভবমূলক। তবে যে আমরা এ বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি' তাহা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বাল্য সংস্কার ছাড়িয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া পরকালসম্বন্ধে একটা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে চাহেন—তাঁহাদের বলি আমাদের কথা সম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করুন। প্রমাণ আমাদের নিকট লইতে হইবে না, তাঁহারা নিজের প্রমাণ নিজে অনুসন্ধান করুন—তার পর বুঝিবেন আমরা যাহা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তখন আমাদের মন বুদ্ধি এ সকল কিছুই হয় না, কেবল মাত্র দেহটী হয়। মাতৃগর্ভের কার্য্য দেহ গঠন, তাহা সমাধা হইলে, দেহ বহিষ্কৃত বা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পর দেহের মধ্যে মনুষ্যত্ব সঞ্চার হইতে থাকে। দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। তথায় সেই মনুষ্যত্ব যে দেহেবা যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব তাহা প্রাপ্ত হইয়া বহিষ্কৃত হয়—সেই দ্বিতীয় জন্মকে লোকে বলে মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিই দ্বিজ। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম দেহ হইতে।

যাঁহারা বলেন মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—সকলই ফুরায়—তাঁহারা এ দ্বিজত্ব স্বীকার করিবেন না—তাঁহারা মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদের এ ভ্রান্তি। মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়া যাক—তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এই জন্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনেক ঘটনা তাঁহারা দৈবাৎ ঘটিয়াছে

বলিয়া নিশ্চিন্ত হন—কিন্তু ঘটনাগুলি বাছিয়া, বুঝিয়া দেখিতে পারিলে— তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে দেহমুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটিয়াছে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কেবল গঠিত হইতে থাকে মাত্র। আমরা বলিয়াছি মাতৃগর্ভে দেহ মাত্র হয়—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেহের ভিতর মনুষ্য গঠিত হইতে থাকে। তখন একটী দুইটী করিয়া ক্রমে বৃত্তি গুলির উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। প্রথমের অধিকাংশ বৃত্তি গুলি দেহরক্ষার্থ, দেহ গেলে সে গুলি আর থাকে না—যথা রাগাদি। কতকগুলি সদ্বৃত্তি দেহসম্বন্ধে নহে, সে গুলি মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়। সেই গুলি লইয়াই মানুষ মানুষ। তাহা না জন্মিলে মনুষ্য অসম্পূর্ণ হয়—নষ্ট হইয়া যায়—মৃত্যুর পর আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন মাতৃগর্ভে দেহ গঠন হইতে হইতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত গর্ভস্রাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়—এ সংসারে সে দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ, ভূমিষ্ঠ দেহে নানা বৃত্তির স্থানে যদি কেবল দৈহিক বৃত্তিই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সে বৃত্তিগুলি যায়, পরকালে আর সে মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য শিশু ও বালক প্রভৃতির পরকাল নাই। তাহাদের দৈহিক বৃত্তি-মাত্র হইয়াছিল—দেহের সঙ্গে সেগুলি গেল—বাকি কিছুই থাকিল না; সেইরূপ আবার যে সকল বৃদ্ধের কেবল কাম ক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিমাত্র জন্মিয়াছে আর কোন সদ্বৃত্তি বিকাশিত বা অঙ্কুরিত হয় নাই তাহাদেরও সেই দশা, তাহাদেরও পরকাল নাই।

সকল দেশে ধর্ম্মবেত্তারা সদ্বৃত্তির আলোচনার যে অনুরোধ করিয়া থাকেন, সদ্বৃত্তি থাকিলেই পরকাল ভাল হয় যে বলেন, তাহার হেতু এই। ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে একটা কথা মনে হয় যে সদ্বৃত্তিই আমাদের দীর্ঘায়ুর মূল। সদ্বৃত্তি না থাকিলে দেহ নাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহনাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেহনাশের পরও জীবিত থাকি।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন পরে, আবার শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুইজনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী, ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া চন্দন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরে এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিল—"কি মিষ্ট পাখির শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তরতর গদ্‌গদ্ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠশব্দের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন, স্বামির কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল,

"এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রি? তোমায় আজি কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর, তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছু নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামির শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এতদিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাজ—আমার অন্য কাজ নাই; না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই পতিপ্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও? তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া না যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে; তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য, তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা তিনি যদি ঠিক করিয়া রাখিয়া থাকেন, যে আমারই হাতে তাঁহার সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী, মনে মনে বড় খুসী হইল। কথাগুলি শিষ্যার নিকট প্রাপ্ত গুরুদক্ষিণার ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এখনও জয়ন্তীর কথা ফুরায় নাই। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল,

"তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণী তীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার

শিষ্য। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? যোগ্যাযোগ্য কি? (পরে, সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন ভৈরবী বা বৈষ্ণবীর শিষ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কিছুই চিত্তে যেন স্থান না পায়—সকল দিকেই তাহা হইলে ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে, চল, তোমার স্বামির হউক কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

তখন উভয়ে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া, বিরূপা তীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনী শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন, নগর রক্ষার কাজ, এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগররক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত—শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল, "দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে—আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপ দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিষ্কর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ কর্ম্মই, অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই।

"ধর্ম্মে হৌক অধর্ম্মে হৌক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নহিলে মরিতে হইবে।

তা, মরি তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে।

ধর্ম্মপথে, পাইবার উপায় নাই। কাজেই অধর্ম্ম পথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে, সে করুক, যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে স্থূলভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম

করিতেছি। তাহা নহে; ধর্ম্ম যে চেষ্টা করে, সেই করিতে পারে। অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—

"অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে—কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি যদি আজ বলিয়া পাঠাই, যে কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তার পর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেইখানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়? সীতারামের এলেকায় ত একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মেনাহাতী আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই সীতারামের এলাকার বাহির, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আশামী—যেখানে যাইব, সম্বাদ পাইলে আমাকে সেইখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবন ও পাইব, রমাও পাইব। ইহার উপায় আছে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দেআলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান একজন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। পতি গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; উপপতি বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্য মধ্যে শিপাহী হইল। গঙ্গারাম, তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া

পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন, যে টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনা বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আশামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

বন্দেআলি সেখকে এই সকল কথা বলিতে বলিয়া দিয়া, গঙ্গারাম বলিলেন, "লিখিত উত্তর লইয়া আইস।"

বন্দেআলি বলিল, "আমার কথায় ফৌজদার সাহেব বিশ্বাস করিয়া খত দিবেন কেন?"

গঙ্গারাম বলিল, পত্র লিখিতে আমার সাহস হয় না। আমার এই মোহর লইয়া যাও। আমার মোহর তোমার হাতে দেখিলে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

বন্দেআলি মোহর লইয়া ভূষণায় গেল। ফৌজদারিতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী সরকারে, কারকুন দপ্তরের বখশী চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দে আলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরূরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুনকে ধরিল, কারকুন পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

গঙ্গারাম যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্দেআলি অবিকল সেই রকম বলিল। লিখিত উত্তর চাহিল। তোরাব খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন, যে গঙ্গারাম ত হাতছাড়া হইয়াইছে—এখন তাহাকে মাফ করায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন,

"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণায় ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—যাহার সঙ্গে পাঠকের মন্দিরে পরিচয় হইয়াছিল,—সেও পার হইতেছিল। ফকির, বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিল?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দে আলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বকশী, মুনশী, কারকুন, পেস্কার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার, তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন,

"দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মেনাহাতীর তাঁবে অনেক শিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে, তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে দক্ষিণে পার হইতে হয়—উত্তর

পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি রাষ্ট করিবেন যে, আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মেনাহাতী তাহা বিশ্বাস করিবে, কেন না কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না, বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মেনাহাতী দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায়, যে আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মেনাহাতী ফৌজ লইয়া বাহির হইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মেনাহাতীর সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?

গঙ্গা। নলদী পরগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাহশালার করিতে পারি। আর টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিষ করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন—তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর মাঝে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে তুমি রাণীকে নেকা করিতে পারিতে।

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে মুসলমান করিয়া নেকা করিতে পারে, তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল,

"মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, এখন আমি স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে, যদি তোমার পরকালের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি, আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় অবিশ্বাস করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছুই বলিলেন না।

তখন সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না, যে চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। চাঁদশাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সম্বাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।"

চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদশাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন

পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্যাপার কি ?"

চাঁদশাহ। হিন্দুরাও ইসলামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি ?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম রায়।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। অঁা ? না, মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদশাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।

সংসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু।

পীড়া আরোগ্য হইলেও স্রধা কয়েকদিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া কয়েক দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না।

তাহার পর অল্প অল্প করিয়া ঘরে বারাণ্ডায় বেড়াইত, অথবা শরতের সাহায্যে ছাদে গিয়া একটু বসিত। পক্ষীর ন্যায় সেই লঘু ক্ষীণ শরীরটী শরৎ অনায়াসে আপনার দুই হস্তে উঠাইয়া ছাদে লইয়া যাইতেন, আবার ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন।

এক্ষণে শরৎ পুনরায় কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈকালে হেমের বাটীতে আসিতেন, সুধাকে অনেক কথা, অনেক গল্প বলিয়া প্রফুল্ল রাখিতেন, রাত্রি নয়টার সময় সুধা শয়ন করিলে বাটী আসিতেন। সুধাও প্রতিদিন শরৎকে প্রতীক্ষা করিত, শরতের আগমনের পদধ্বনি প্রথমে সুধার কর্ণে উঠিত, শরৎ সিঁড়ি হইতে উঠিতে না উঠিতে প্রথমেই সেই ক্ষীণ কিন্তু শান্ত, কমনীয়, হাস্যরঞ্জিত মুখ খানি দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতেন।

ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন। তালপুখুর গ্রামের গল্প, বাল্যকালের গল্প, সুধার দরিদ্রা মাতার গল্প, শরতের মাতার গল্প, শরতের ভগিনীর গল্প, অনেক বিষয়ের অনেক গল্প করিতেন। সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি। অন্য সময়ে গর্ব্ব করিয়া যে পরামর্শ শুনি না, সে সময়ে সেই পরামর্শ হৃদয়ে স্থান পায়, অন্য সময়ে যে স্নেহ আমরা তুচ্ছ করি, সে সময়ে সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেন না হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃত বচনে সেইরূপ শান্তিলাভ করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধা সেই অমৃতমাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত, সেই স্নেহময় মধুর প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অথবা ক্লান্ত হইয়া সেই মধুর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিত। যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বালিকার ক্ষীণ বাহুলতা স্বহস্তে ধারণ করিয়া বালিকার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

এক দিন উভয়ে এইরূপে ছাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হেমচন্দ্র ছাদে আসিলেন ও শরৎকে বলিলেন,

"শরৎ, আজ চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যাবে না?"

শরৎ। "হাঁ; সে কথা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কোথাও যাইতে রুচি নাই, না গেলে হয় না"?

হেম। না, সুধার পীড়ার সময় চন্দ্র বাবু ও নবীন বাবু আমাদের অনেক যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, নবীন বাবু ঘরের ছেলের মত আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদের বাড়ী না গেলেই নয়। আইস, এইক্ষণই যাইতে হইবে।

শরৎ ও সুধা উঠিলেন। হেম সুধাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি নামাইলেন, তাহাকে ঘরে শয়ন করাইয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হেম বলিলেন,

"শরৎ, এই পীড়ায় তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, সে ঋণ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এই কারণে তোমার পড়াশুনার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি কলেজে যাও নাই, এক্ষণও তোমার ভাল পড়া হইতেছে না। একটু মন দিয়া পড়, তোমার পরীক্ষার বড় বিলম্ব নাই।"

শরৎ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "হাঁ আর অল্পই সময় আছে, এখন একটু মন দিয়া লেখাপড়া আবশ্যক। সুধা এখন ভাল হইয়াছে, কিন্তু বিন্দুদিদিকে বলিবেন যখন অবকাশ হইবে, ছাদে লইয়া গিয়া প্রত্যহ গল্প করিয়া সুধার মনটী প্রফুল্ল রাখেন। নবীন বাবু বলিয়াছেন, সুধার মনপ্রফুল্ল থাকিলে শীঘ্র শরীরও পুষ্ট হইবে।" এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর বাসায় পঁহুছিলেন।

নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন সুযোগ্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক হয় নাই; তিনি কৃতবিদ্য, সৎকার্য্যে উৎসাহী, এবং এই বয়সেই একজন হাইকোর্টের গণ্য উকিল হইয়াছিলেন। তিনি সবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর একজন মাননীয় সভ্য ছিলেন এবং সবর্বের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

তাঁহার বাড়ী বৃহৎ নহে কিন্তু পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে নির্ম্মিত

ও রঞ্জিত। বাহিরে দুইটী একতালা বৈটকখানা ছিল, বড়টীতে চন্দ্রবাবু বসিতেন, ছোটটী নবীন বাবুর ঘর। বাড়ীর ভিতর দ্বিতল। চন্দ্রবাবুর বৈটকখানায় টেবিল, চৌকি, পুস্তক পরিপূর্ণ দুইটী বুকশেল্ফ, কয়েকখানি সুরুচি সম্মত ছবি। মেজে, "মেটিং" করা এবং সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় কোন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ কার্য্যপ্রিয় যুবকের কার্য্যস্থান, পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল।

টেবিলের উপর দুইটী শামাদানে বাতী জ্বলিতেছে; চন্দ্রবাবু, নবীন, হেম ও শরৎ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও অল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় ভদ্র, ক্ষুধার পীড়ার সময় তিনি যথা সাধ্য হেমের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত কথা দ্বারা হেমকে তুষ্ট করিতেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র বলিলেন, "কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমার চিরকালই পল্লিগ্রামে বাস, পল্লিগ্রামে কৃতবিদ্য লোক বড় অল্প, আপনাদিগের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ তাহাও অল্প দেখিতে পাই, আপনাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতাও অল্প দেখিতে পাই।"

চন্দ্র। "হেমবাবু দেশহিতৈষিতা কেবল মুখে। অথবা হৃদয়েও যদি সেরূপ বাঞ্ছা থাকে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা ক্ষুদ্র লোক, দেশের জন্য কি করিব? সে ক্ষমতা কৈ? তাহার উপযুক্ত স্থান, কালই বা কৈ?"

হেম। "যাহার যে টুকু ক্ষমতা সে সেইটুকু করিলেই অনেক হয়। শুনিয়াছি আপনি সবর্ব্বান কমিটীর সভ্য হইয়া অনেক কায কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার জন্য অনেক প্রশংসা পাইয়াছেন।"

চন্দ্র। "কাৰ্য্য কি? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা বলেন তাহাই হয়, আমরাও তাহাই নির্ব্বাহ করি। কলিকাতার অধিবাসিগণ সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, লর্ড রিপন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরীতে সেই ক্ষমতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন; আমরাও সেই ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতেছি, পাই কি না সন্দেহ।"

হেম। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষমতা আমরা অবশ্যই পাইব, এবং পাইলে আমাদের বিস্তর লাভ।'

চন্দ্রনাথ। পাইলে আমাদের যথেষ্ট লাভ তাহার সন্দেহ কি? আমরা দেশশাসন কার্য্য বহু শতাব্দী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি, গ্রামশাসন প্রথাও ভুলিয়াছি, এক্ষণে দলাদলি করা ও পরস্পরকে গালি দেওয়া ভিন্ন আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন নাই। ক্রমে আমরা উন্নত শিক্ষা পাইব, ক্রমে ক্ষমতা পাইব, আমার এরূপ স্থির বিশ্বাস। নিশার পর প্রভাত যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, শিক্ষার পর আমাদিগের ক্ষমতা বিস্তারও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

শরৎ। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম, আমারও হৃদয়ে ঐরূপ আশা উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের এই কঠোর চেষ্টাতে কে একটু সহানুভূতি করে? আমাদিগের উচ্চাভিলাষ অন্যের বিদ্রূপের বিষয়, আমাদিগের চেষ্টার বিফলতা তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়, আমাদিগের জাতীয় চেষ্টা, জাতীয় অভিলাষ, জাতীয় জীবন তাঁহাদিগের উপহাসের অনন্ত ভাণ্ডার। মৃতবৎ জাতি যখন পুনরায় জীবনলাভের জন্য একটু আশা করে, একটু চেষ্টা করে, তখন তাহারা কি অন্যের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শরৎ, তোমার বয়সে আমিও ঐরূপ চিন্তা করিতাম, সংবাদ পত্রে একটী বিদ্রূপ দেখিলে ব্যথিত হইতাম। কিন্তু দেখ, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি ফাঁপা মাল, দেখিতে বড় সুন্দর, তত মূল্যবান্ নহে। যদি সে গুলি দিতে অন্যের বড়ই কষ্ট হয়, তাঁহারা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখুন, আমাদের আবশ্যক নাই। যদি উপহাস করিতেই তাঁহাদিগের ভাল লাগে, তাঁহাদিগের উপহাসই আমাদিগের জাতীয় জীবনের বন্ধনীস্বরূপ হউক। শরৎ, আমাদিগের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা ও সত্তার উপর নির্ভর করে, অন্য লোকের হস্তে নহে। আইস, আমরা কার্য্যদক্ষতা শিক্ষা করি, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রতীক্ষা না করিয়া, উপহাস গ্রাহ্য না করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইব। আমাদিগের উন্নতির পথ অবারিত।"

নবীন। আমারও বিশ্বাস আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু

সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশৎ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।

চন্দ্র। নবীন, আমি এটী গুণ বলিয়া মনে করি, দোষ বলিয়া মনে করি না। যে সমাজ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হয়, সে সমাজ শীঘ্র বিপ্লবগ্রস্ত হয়। তুমি ফরাসীদের ইতিহাস বেশ জান, একশত বৎসর হইল ফরাসীরা একেবারে সমস্ত কুরীতি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; তাহার ফল, ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব! শীঘ্র শীঘ্র সমাজের রীতি পরিবর্ত্তন করায় সমাজের লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি আছে।

নবীন। কিন্তু যে প্রথাগুলি এক্ষণে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে, সে গুলি কি ত্যাগ করা বিধেয় নহে?

চন্দ্র। অনেক আলোচনা করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়াই সে গুলির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। আলোচনায়ও বিশেষ উপকার হয় বোধ হয় না; সমাজে জীবন থাকিলে লোকে আপনা আপনিই সুবিধা বুঝিয়া অনিষ্টকর নিয়মগুলি ত্যাগ করে। জীবিত সমাজের এই নিয়ম;—তাহার ক্রমশঃ সংস্কার আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

নবীন। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজেও সংস্কার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জীবন অতিশয় ক্ষীণ, সেই জন্য গতি অতিশয় অল্প। দেখুন বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের কত অল্প উন্নতি হইতেছে। এ বিষয়ে উন্নতিতে নূতন আইনের আবশ্যক নাই, রাজার অনুজ্ঞার আবশ্যক নাই, সমাজের রীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, একটু চেষ্টা হইলেই হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কত বিরল। আপনাদিগের দেশের তুলা লইয়া আপনারা কাপড় নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না, ইউরোপ হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসিতেছে তাঁতিদের দিন দিন দুরবস্থা হইতেছে।

হেম। কলে নির্ম্মিত কাপড়ের সহিত, তাঁতিরা হাতে কায করিয়া

কখনও যে পারিয়া উঠিবে এরূপ আমার বোধ হয় না। আমি পল্লিগ্রামে অনেক হাটে গিয়াছি, অনেক গরিব লোকের বাড়ী গিয়াছি। আমার মনে আছে পূর্ব্বে সকল ঘরেই চরকা চলিত, এক্ষণে গ্রামে একখানা চরকা দেখা যায় না। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট বিলাতি সুতা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। হাটে যে দেশী কাপড় ১৷৷০ টাকায় বিক্রয় হয় সেইরূপ বিলাতী কাপড় ৸৴০ আনায় বিক্রয় হয়। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহারা অল্প মূল্যে ভাল কাপড় পরিতে পারে, কিন্তু তাঁতীরা হাতে কায করিয়া কখনও কলের কাযের সঙ্গে পারিবে তাহা বোধ হয় না।"

নবীন। "আমিও তাহাই বলিতেছি, সুসভ্য জগতে হাতের কায উটিয়া যাইতেছে, এক্ষণে কলে কায করা ভিন্ন উপায় নাই। তবে আমরা বঙ্গদেশ এইরূপ কলে আচ্ছন্ন করি না কেন? আমাদের কি সেটুকু উৎসাহ নাই, সেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি নাই?"

চন্দ্র। "নবীন, সে বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নহে, সে অর্থের অভাব, বহু অর্থ না হইলে একটী কল চলে না। আর একটী আমাদের শিক্ষার অভাব আছে, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া এখনও কায করিতে শিখি নাই, এই শিক্ষাই সভ্যতার প্রধান সহায়। দেখ বিদ্যায় আমাদের দেশে অনেকে উন্নত হইয়াছেন, ধনে অনেকে উন্নত, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনেকে উন্নত, রাজনীতিতে অনেকে উন্নত। বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কায করা একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা, সেটী আমরা এখনও শিখি নাই। পাঁচজন বিদ্বান একত্রে মিলিয়া একটী মহৎ চেষ্টা করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না, পাঁচজন রাজনীতিজ্ঞ ঐক্য সাধন করিতে পারে না, পাঁচজন ধনী মিলিয়া বাণিজ্য করে এরূপ বিরল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কিন্তু আমি ভরসা করি অন্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষাও আমরা লাভ করিব, এ শিক্ষা লাভ না করিলে সভ্যতার আশা নাই।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভৃত্য আসিয়া বলিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে পুনরায় সকলে বাহিরে আসিলেন। আর ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া হেম ও শরৎ বিদায় লইলেন।

শরৎ আপনার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, হেম চন্দ্রনাথ বাবুর কথাগুলি অনেক্ষণ চিন্তা করিতে কবিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। পথে সুন্দর চন্দ্রালোক পড়িয়াছে, নিশার বায়ু শীতল ও মোনোহর, হেমচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বালীগঞ্জের দিকে গিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটী শকটের শব্দ পাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন দুইটী উজ্জ্বল আলোকযুক্ত একটী বড় গাড়ী তীব্র বেগে আসিতেছে, বলবান্ শ্বেতবর্ণ অশ্বদয় যেন পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া উড়িয়া আসিতেছে," ফেটন ঘর্ঘর শব্দে দরিদ্র হেমের পাশ দিয়া যাইয়া একটী বাগানের ফাটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাব পর আবার আর একটী জুড়ী আসিল, দুইটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব এক বৃহৎ লেণ্ডলেট লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে সেই ফাটকে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় নারী কণ্ঠ সম্ভূত খল খল হাস্যধ্বনি হেমের শ্রুতি পথে পঁহুছিল।

হেম একটু উৎসুখ হইলেন, এবং সবিশেষ দেখিবার জন্য বাগানের ফাটকের কাছে আসিলেন। দেখিলেন ফাটকে রামসিং ফতেসিং বলবন্তসিং প্রভৃতি শস্ত্রধারী দ্বারবান্‌গণ সগর্ব্বে পদচারণ করিতেছে। বাগানের ভিতর অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, দুই একটী সুন্দর জলাশয়। তাহার পর একটী উন্নত অট্টালিকা। অট্টালিকা ইন্দ্রপুরীতুল্য, তাহার প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকরাশি বহির্ভূত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যধ্বনি ও নারীকণ্ঠ সম্ভূত গীতধ্বনি গগনপথে উত্থিত হইতেছে!

হেম ধীরে ধীরে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাগান কার বাপু?"

দ্বারবান্ দাড়ীতে একবার মোচড় দিয়া গোঁফে একবার তা দিয়া বলিল,

"এ বাগান তুমি জানে না, মুলুক কা সব বড়া বড়া লোক জানে, তুমি জানে না? তুমি কি নয়া আদমী আছে?"

হেম। "হাঁ বাপু, আমি নতুন মানুষ, এদিকে কখনও আসি নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

দ্বার। "সোই হোবে। এখানে সব কোই এ বাগান জানে। কল-

কত্তাকা যেত্তা বড়া বড়া বাঙ্গালি আছে, জমীদার, উকিল, কৌঁসিলি, সব এ বাগানে আসে, সব কোই এ বাগান জানে।”

হেম। “তা হবে বাপ, আমি গরিব লোক আমি সে সব কথা কেমন কোরে জানব?”

দ্বার। “হাঁ সো ঠিক, সো ঠিক, তোমারা লায়েক আদমি এ বাগান জানে না। আজ বড়া নাচ হোবে, বহুত বাবু লোক আয়েছে, বড়া তামাসা।”

হেম। “তা নাচ দিচ্চে কে? বাগানটা কার?”

দ্বার। “ধনপুরকা জমিদার ধনঞ্জয় বাবু।”

হেমের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

“হা হতভাগিনী উমাতারা! ধনে যদি সুখ থাকিত, মর্ম্মর শোভিত ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে যদি সুখ থাকিত, সাদা জুড়ি ও কাল জুড়িতে যদি সুখ থাকিত, তবে তুমি আজ হতভাগিনী কেন?”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধনঞ্জয় বাবু।

যে দিন রাত্রিতে হেমবাবু ধনঞ্জয় বাবুর বাগান দেখিয়া আসিলেন সেই দিন অবধি তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ রহিলেন। সহসা সে কথা বিন্দুকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, পাছে বিন্দু উমাতারার জন্য মনে ব্যথা পান; এবং বিন্দুর নিকট হইতে কথাটী গোপন রাখিতেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কি করিবেন? কি উপায় অবলম্বন করিবেন? হতভাগিনী উমতারার সংবাদ কি রূপে লইবেন? উমাতারার কোনও রূপ সহায়তা করা কি তাঁহার সাধ্য?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী যাবেন ঠিক করি-

লেন। ধনঞ্জয় বাবু বাল্যকালে যখন তালপুখুরে আসিতেন তখন হেমকে বড় মান্য করিতেন, সম্ভবতঃ এখনও হেমের দুই একটী পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পারেন। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি একবার স্বচক্ষে উমাতারার অবস্থা দেখিয়া আসা হবে, তাহার পর যথোচিত উপায় বিধান করা যাইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বাবুর সহিত সহসা দেখা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা মহানগরীতে ধনঞ্জয় বাবুর বড় মান, অনেক বন্ধু, অনেক কাযের ঝন্‌ঝট্‌ তাঁহার সহিত হেমের ন্যায় সামান্য লোকের দেখা হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। হেমের গাড়ী নাই, তিনি এক দিন সকালে হাঁটিয়া ধনঞ্জয় বাবুর কলিকাতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে গেলেন। দ্বারে দ্বারবানগণ একজন সামান্য পথশ্রান্ত বাবুর কথায় বড় গা করে না, কেহ কোনও উত্তর দেয় না, খাটিয়া রূপ সিংহাসন থেকে কেহ শীঘ্র উঠে না। কেহ গা ভাঙ্গিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ দাল বাছিতেছে, কেহ বা বাড়ীর দাসীর সহিত দুই একটী মধুর মিষ্টালাপ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজন অনুগ্রহ করিয়া হেমের দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,

"কেয়া হয় বাবু? তুমি সকাল থেকে বসে আছে, কি চাই কি?"

হেম। "বলি একবার ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারে? অনেক দূর থেকে এসেচি, একবার খবর দাও না, বল তালপুখুর গ্রাম থেকে হেমবাবু দেখা করিতে এসেছেন?"

দ্বার। "গ্রামের লোক ঢের আসে, বাবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, বাবুর অনেক কায।"

হেম। "তবু একবার খবর দাও না, বড় প্রয়োজনে আসিয়াছি, একবার দেখা হলে ভাল হয়।"

দ্বার। "প্রয়োজনে সকলে আসে, বাবুর কাছে এখন সকল গ্রামের লোকের প্রয়োজন আছে, সকলেই কিছু আশা করে। তোমার কি গ্রাম শালপুখুর, সে মুলুকে বড় শালবন আছে?"

হেম। "না হে দরওয়ানজী, শালপুখুর নয় তালপুখুর, তোমাদের বাবুর শশুর বাড়ী সেই গ্রামে।"

তখন একটী খাটিয়ায় অৰ্দ্ধ শয়ান দ্বিতীয় এক মহাপুরুষ একবার হাই তুলিয়া অৰ্দ্ধেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,

"হাঁ হাঁ আমি জানে, সে তালপুখুর গ্রামে বাবু সাদী করিয়াছেন। তুমি বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক আছে?"

হেম। "সেই গ্রামের লোক বটে, বাবুর সঙ্গে সম্পর্কও আছে।"

তখন দুই তিনজন বিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী ক্ষণেক পরামর্শ করিল। একজন কহিল, গ্রামে থেকে অনেক কাঙ্গালী আসে, তাড়াইয়া দাও। আর একজন কহিল না শ্বশুর বাড়ীর লোক, সহসা তাড়াইয়া দেওয়া হয় না, মা শুনিলে রাগ করিবেন। তৃতীয় একজন নিষ্পত্তি করিল, আচ্ছা একটু বসিতে বল। হেমবাবু আবার ক্ষনেক বসিলেন। তিনি একটু চিন্তাশীল সমালোচনাপ্রিয় লোক ছিলেন, বড় মানুষের দ্বারবানদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতা বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইলেন, এবং তাহা হইতে পরম প্রীতি ও উপদেশ লাভ করিলেন।

দ্বারবানগণ দেখিল এ কাঙ্গালী যায় না। তখন একজন অগত্যা বহু সুখের আধার খাটিয়া অনেক কষ্টে ত্যাগ করিয়া একবার হাই তুলিয়া, একবার অসুরতুল্য বাহুদ্বয় আকাশের দিকে বিস্তার করিয়া আর একবার শ্মশ্রুকণ্ডুয়ন করিয়া ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

হেম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় একদণ্ড পর দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া সুখবর দিলেন "যাও বাবু এখন দেখা না হোবে।"

হেম "আমার নাম বলিয়াছিলে?"

দ্বারবান "নাম কি বলিবে? এত সকালে কি বাবুর সঙ্গে দেখা হোয়? বাবু এখনও উঠেন নাই, দশটার সময় উঠেন, তাহার পর আসিও।" হেম অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

একদিন দশটার পর গেলেন, তখন বাবু বাড়ী নাই। এক দিন অপরাহ্নে গেলেন, বাবু বাগানে বাহির হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় গেলেন, সেদিন বাবু কোথা নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। চার পাঁচ দিন বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আবার গেলেন, ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় বাবু বাড়ী আছেন।

দ্বারবান বলিল "কি নাম তোমার? গোবর্দ্ধন না গৌরচন্দ্র?"

হেম। "নাম হেমচন্দ্র, তালপুকুর গ্রাম হইতে আসিয়াছি"।

দ্বারবান উপরে যাইয়া খবর দিল। আসিয়া বলিল "উপরে যান।" হেমচন্দ্র উপরে গেলেন।

ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের ধনবান্ উত্তরাধিকারী, গৌরবর্ণ, সুন্দর, যৌবনোন্মত্ত ধনঞ্জয় বাবু কয়েকজন পাত্র মিত্রের মধ্যে সেই সুন্দর সভাগৃহে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শিষ্টাচার করিয়া আপন শ্যালীপতি ভ্রাতাকে মকমল মণ্ডিত সোফায় বসিতে আজ্ঞা দিলেন। হেমচন্দ্র যাহার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন।

হেমবাবু সহসা কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না, সে সভাগৃহের শোভা দেখিয়া ক্ষণেক বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তিনি চৌরঙ্গিতে প্রাসাদ তুল্য বাটী সমূহের বারাণ্ডায় টানাপাখা চলিতেছে, পথ হইতে দেখিয়াছেন; লাট সাহেবের বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন; উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দুই একটী ইংরাজি দোকানের অভ্যন্তর একটু একটু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশোভিত সুন্দর সভাগৃহের ভিতর পদবিক্ষেপ করা তাঁহার কপালে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই! সভার মেজে সুন্দর কার্পেট মণ্ডিত, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, ডালে ডালে পাখী বসিয়াছে, সে কার্পেটের উপর হেমচন্দ্র ধূলিপূর্ণ তালি-দেওয়া জুতা স্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার উপর আবলুশ কাষ্ঠের সোফা, অটোমান্ চৌকি, ঈসিচেয়র, সাইডবোর্ড, ওয়াটনট; আবলুশ কাষ্ঠের উপর সুবর্ণের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বড় শোভা পাইতেছে। সোফা ও চৌকি হরিৎবর্ণ মকমলে মণ্ডিত, হেমের ছেলে দুটী সেরূপ মকমলের জামা কখন পরিধান করে নাই। মার্বেলের টেবিল, মার্বেলের সাইডবোর্ড, মার্বেলের প্রতিমূর্ত্তিগুলি! উপর হইতে বেলওয়ারীর ঝাড়ের ভিতর গেসের আলোক দীপ্ত রহিয়াছে, সে আলোকে ঘর দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, গবাক্ষ দিয়া সে আলোক বাহির হইয়া সে পাড়া সুদ্ধ আলোকিত করিয়াছে। একদিকে কোনে সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে, সাইডবোর্ডে, দুইটী ডিকেণ্টর ও কয়েকটী গেলাস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেয়ালে

অসংখ্য বড় বড় দর্পনে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে, হেমের দুরিদ্র চেহারাখানি চারিদিকের দর্পনে অঙ্কিত দেখিয়া সে দরিদ্র আরও লজ্জিত হইলেন। কয়েকখানি সুন্দর বহু মূল্য অয়েল পেণ্টিং; ইন্দ্রপুরী হইতে বিবস্ত্রা মেনকা রম্ভা যেন সেই অয়েল পেণ্টিং হইতে হাস্য করিতেছে!

সভাগৃহের বর্ণনা এক প্রকার হইল, সভ্য দিগের বর্ণনা করি কিরূপে? আজ অধিক লোক নাই তথাপি ধনঞ্জয় বাবুর অতি প্রিয় অতি গুণবান্ কয়েকজন বন্ধু সে সভাকে নবরত্ন সভা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যথেষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব, দুই একটী কথায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্তে সুমতি বাবু বসিয়াছিলেন, তিনি রূপবান্ যুবা পুরুষ, বয়স ঠিক জানি না, কিন্তু যৌবনের শোভা সে সুন্দর মুখে সে কালাপেড়ে কাপড়ে ও ফিন্‌ফিনে একলাইয়ে লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় জানি না, কিন্তু প্রায় বড় মানুষ দিগের দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্থান। তিনি গীতে অদ্বিতীয়, হাস্য রহস্যে অদ্বিতীয়, ধনী দিগের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়, প্রবাদ আছে যে বিষয় বুদ্ধিতে ও অদ্বিতীয়! মধু মক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিতে জানিতেন, অনেক মধুচক্র হইতে মধু আহরণে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়াছিল, সুন্দর গাড়ী ও জুড়িতে ছাপিয়া পড়িতেছিল। প্রবাদ আছে যে বণ্ড হেণ্ডনোট প্রভৃতি গূঢ় মন্ত্রে তিনি বিশেষরূপে দীক্ষিত, নাবালক বা তরুণ ধনী দিগের প্রতি সেই সুন্দর মন্ত্র চালনায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু এ সকল জনপ্রবাদ গ্রাহ্য নহে, সুমতি বাবুর মিষ্ট হাস্য ও আলাপ-ক্ষমতা সন্দেহ বিবর্জিত।

সুমতি বাবুর পার্শ্বে যদুনাথ বসিয়াছিলেন,—গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্যরহস্য ক্ষমতা বল,—যদুনাথের ন্যায় কলিকাতায় কে আছে? ব্যবসা ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চাল চোল, ইংরাজী খানায়, ইংরাজী ধরণে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? সেম্পেন বা সোটরণ্‌ বা সাব্‌লীস্‌ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? আবার বক্তৃতা ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ,—"ন্যাশনালিটী" রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথ বাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের

উচ্চাভিলাষ, যদুনাথ বাবুর সহিত বন্ধুতা করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথ বাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন!

তাঁহার পশ্চাতে চাপকান পরিয়া সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া হরিশঙ্কর বাবু একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি সেকেলে লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, কিন্তু বাহাদুরি কেমন? কোন ইংরাজীওয়ালা তাঁহার ন্যায় চাকুরি পাইয়াছে? তিনি মাথায় সাদা ফেট্টা বাঁধিয়া আপিসে যান, পুরাণধাঁচে ইংরাজি কহেন, বড় বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র। প্রাচীন হিন্দুসমাজের এই স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর বাবুকে সাহেবরা বড় স্নেহ করেন, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে হরিশঙ্কর বাবুকে মূর্ত্তিমান্ বেদ মনে করেন, হিঁদুয়ানি ও সাবেক রকম রীতি নীতি বজায় রাখিবার একটী প্রধান কারণ মনে করেন, নব্য উদ্ধত যুবকদিগকে হরিশঙ্কর বাবুর উদাহরণ দেখান। হরিশঙ্কর বাবু লোকটী বিচক্ষণ; দেখিলেন এই চালে চলিলেই লাভ, সুতরাং সেই চালই আরও অনুবর্ত্তন করিলেন। তাহার সুফল শীঘ্র ফলিল, ধর্ম্মপতি রাজপুরুষেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীকে অনেক শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপরে একটী বড় চাকুরি দিলেন। সাবেক রীতিনীতির স্তম্ভ মনে মনে একটু হাসিলেন, সন্ধ্যার সময় ইয়ারদিগের নিকট এই কথা গল্প করিয়া, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি সুধার উৎস বহিল।

হরিশঙ্কর বাবুর এক পার্শ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর" কর্ম্মকার বসিয়াছেন, তাঁহার কোট্ পেণ্টলুন অনিন্দনীয়, চখের চসমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরির গেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজি বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরণ বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয় বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন। সুমতি বাবু কখন কখন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনিন্দনীয় পরিচ্ছেদ দেখিয়া ইয়ারদিগের নিকট বলিতেন, "এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থ বুঝিলাম, মিষ্টর কর্ম্মকারের মুখের কান্তি অপেক্ষা পশ্চাতের শোভাটাই কিছু অধিক।"

হরিশঙ্কর বাবুর অপর পার্শ্বে বিশ্বম্ভর বাবু বসিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাড়ার মধ্যে বড় মানুষ, দলের মধ্যে দলপতি,—বড় হাউসের বড় বেনিয়ান!

তাঁহার অর্থের ন্যায় কাহার অর্থ, তাঁহার নূতন বাড়ীর ন্যায় কাহার বাড়ী, তাঁহার গাড়ী ঘোড়ার ন্যায় কাহার গাড়ী ঘোড়া? তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর বাবু গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদী বড়মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের গৌরব বর্ণনায় আমরা অক্ষম।

ধনস্বরূপ পদ্মবনের চারিদিকে মধুমক্ষিকাগণ গুণ গুণ করিতেছে; ধনস্বরূপ ময়ূরসিংহাসনে রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! হেমবাবু কয়েক মাস কলিকাতায় বাস করিয়া দেখিলেন, কেবল ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী নহে, চারিদিকেই সমাজ এ রত্নরাজিতে মণ্ডিত রহিয়াছে! এ মহা নগরী এই রত্নপ্রভায় ঝলসিত হইতেছে!

এ সভায় হেমচন্দ্র কি বলিবেন? হংস মধ্যে বকো যথা হইয়া তিনি ক্ষণেক সেইখানে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। একবার কষ্ট করিয়া ধনঞ্জয় বাবুর বাগানের কথা উত্থাপন করিলেন, তখনই সভাসদ্ সহস্রমুখে সেই বাগানের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় বাবু হেমবাবুকে একদিন বাগানে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনুগৃহীত করিলেন; হেম অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। একবার তালপুখুরের কথা উচ্চারণ করিলেন, ধনঞ্জয় বর্দ্ধমানের নাজীরের কথা উত্থাপনে একটু মুখ হেঁট করিলেন,—সে কথায় কেহ বড় গা করিলেন না। সভাসদ্গণ একটু অধীর হইতে লাগিলেন, কেহ সেতার লইয়া কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ সাইডবোর্ডে ডিকেণ্টরের দিকে চাহিলেন, কেহ ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। হেমচন্দ্র ভাব গতিক বুঝিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী-ভিতর একবার যাবেন কি? ধনঞ্জয় ত তাঁহাকে একবার বাড়ী-ভিতর যাইবার কথা বলিলেন না। তথাপি হতভাগিনী উমাতারাকে না দেখিয়া কি চলিয়া যাবেন?

প্রাঙ্গনে আসিয়া হেমচন্দ্র একটু ইতস্তত: করিলেন। এমন সময়— বাহিরে ঘর্ঘর শব্দে আর দুই একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! গাড়ী হইতে হাস্যরবে বাটী ধ্বনিত করিয়া কাহারা বাবুর বৈটকখানায় গেল। সভা জমিল, সেতারের বাদ্য শ্রুত হইল আবার মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল,—অচিরে কলকণ্ঠজাত গীতধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

হেম এক পা দু পা করিয়া একটী প্রাচীর পার হইয়া বাড়ী-ভিতরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছেন! তথায় শব্দ নাই, আলোক নাই, মনুষ্য চিহ্ন নাই, মনুষ্য রব নাই। অন্ধকারে ক্ষনেক প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিবেন কি?

একটী উন্নত প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী দীপ দেখা যাইতেছে, হেম অনেকক্ষণ সেই দীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সাড়া দিবার সাহস হইয়া উঠিল না।

ক্ষণেক পর একটী ক্ষীণ বাহু সেই গবাক্ষ লক্ষিত হইল। ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ বন্ধ হইল, আলোক আর দৃষ্ট হইল না, সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র নিঃস্বব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী।

হেমচন্দ্র বাটি আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কায করিয়াছি, নারীর যাতনার সময় নারীই শান্ত্বনা দিতে পারে। আমি সমস্ত কথা স্ত্রীর নিকট কহিব, তিনি যাহা পারেন করুন।"

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বিন্দু দেখিলেন হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল অতিশয় গম্ভীর অতিশয় ম্লান। ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন

"আজ কি হয়েছে গা? তোমার মুখখানি অমন হয়ে গিয়েছে কেন?"

হেম। "বলিতেছি, বস। সুধা শুইয়াছে?"

বিন্দু। "সুধা খাওয়া দাওয়া করিয়া শুয়েছে। কোনও মন্দ খবর পাও নাই?"

হেম। "শুন, বলিতেছি।" এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে, হেমচন্দ্র আদ্যোপান্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, বিন্দুর নিকট বলিলেন।

আঁচল দিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া বলিল, "এটা হবে তাহা আমি জানিতাম, অভাগিনী উমা তাহা জানিত।"

হেম "কেমন করিয়া ?"

বিন্দু। "তা জানি না, বোধ হয় কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিল, সে চাপা মেয়ে, কোনও কথা শীঘ্র বলে না, কিন্তু তালপুখুর থেকে আসিবার সময় সে অভাগিনীর কান্না কাঁদিয়াছিল।"

হেম। "এখন উপায় ? যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে ধনেশ্বরের কুলের ধন দুই বৎসরে লোপ হইবে, ধনঞ্জয় রোগগ্রস্থ হইবে, উমা দুই বৎসরে পথের কাঙ্গালিনী হইবে।"

বিন্দু। "সে ত দুই বৎসরের পরের কথা, এখন উমা কেমন আছে ? সে সভাবতঃ অভিমানিনী, স্বামীর আচরণ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে ? তালপুকুর হইতে আসিয়া সেই বড় বাড়ীতে ছেলে মানুষ একা কেমন করিয়া আছে ? তার ছেলে পুলে নেই, বন্ধু বান্ধব যে কেউ নেই, যার কাছে মনের কথা বলে। তুমি কেন একবার গিয়ে দুটো কথা কহিয়া আসিলে না ?"

হেম। "আমার ভরসা হইল না,—তুমি একবার যাও,—তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর, তার পর ভগবান আছেন।"

তাহার পর দিন খাওয়া দাওয়ার পর, ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু একটী পালকি করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন। সুধা ও উমাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া উৎসুক হইল, কিন্তু বিন্দু বলিলেন "আজ নয় বন, আর একদিন যদি পারি তোমাকে লইয়া যাইব।"

প্রশস্ত শয়ন কক্ষে গিয়া বিন্দু দেখিলেন উমা একা বসিয়া একটী চুলের দড়ি বিনাইতেছে, দাস দাসী সকলে নীচে আছে। উমাকে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই তালপুকুরের উমা যাহার সৌন্দর্য্য কথা দিক্ বিদিক্ প্রচার হইয়াছিল ? মুখের রং কালো হইয়া গিয়াছে, চক্ষে কালী পড়িয়াছে, কণ্ঠা দুটা বেরিয়ে পড়েছে, বাহু অতিশয় শীর্ণ, শরীর খানি দড়ীর মত হয়ে গিয়াছে। চারিমাস

পূর্ব্বে বিন্দু যাহাকে প্রথম যৌবনের লাবণ্যে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ত্রিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর দিয়া তারা হার লম্বমান রহিয়াছে, বহু মূল্য বালা হুগাছী সে শীর্ণ হস্তে ঢল ঢল করিতেছে।

উমা পদশব্দ শুনিয়া সেই ম্লান চক্ষুর সহিত পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন। বিন্দুকে দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন। ম্লান বদনে ধীরে ধীরে কহিলেন "আঃ বিন্দু দিদি, তুমি এসেছ, আমি কত দিন তোমার কথা মনে করেছি। তুমি ভাল আছ? ছেলেরা ভাল আছে?"

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাঁহার চারি মাসের ইতিহাস অনুভব করিলেন। যত্নে হৃদয়ের উদ্বেগ সঙ্গোপন করিয়া উমার হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,

"হেঁ বন্, আমরা সকলে ভাল আছি, সুধার বড জ্বর হয়েছিল, তা সে ও ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ উমা? তোমাকে একটু কাহিল দেখচি কেন বন?"

উমা। "ও কিছু নয় বিন্দুদিদি,—আমার ও কলিকাতায় আসিয়া আমাসা হয়েছিল তা ভাল হয়েছে, এখন একটু কাশি আছে, বোধ হয় কলকেতার জল আমাদের সয় না, আমরা তালপুখুরেই ভাল থাকি।" সেই নীরস ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাস্য লক্ষিত হইল।

বিন্দু। "তালপুখুরে আবার যেতে ইচ্ছা করে? আমরা এই পূজার পর যাব, তুমি যাবে কি?"

উমা। "তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দুদিদি, বাবু কি তাতে মত করবেন? বোধ হয় না"।

বিন্দু। "তবে তোমাকে এখানে দেখবে শুনবে কে? আমরা রইলুম অনেক দূরে, আর ছেলেদের ফেলেও ত সর্ব্বদা আসিতে পারিনি। তোমার ও কাশী করেছে, রোগা হয়ে গিয়েছ, তোমাকে দেখে কে?"

উমা। "কেন বিন্দুদিদি, রোজ ডাক্তর আসে, বাবু একজন ভাল ডাক্তর রাখিয়া দিয়েছেন সে ওষুধ দিচ্ছে, আমি এখন ওষুধ খাই।"

বিন্দু। "তা যেন হোল, কিন্তু তবু আপনার লোক না হলে কি কেউ

দেখতে শুনতে পারে? আর তোমার অসুখ হলে সংসারই দেখে কে?
তা জেঠাই মাকে কেন লেখ না, তিনি এসে কয়েক দিন থাকুন, আবার
তুমি একটু সারলে তিনি চলে যাবেন, তুমিও না হয় দিনকতক গিয়ে
তালপুখুরে থাকবে।”

উমা। “না মাকে আর কেন আনান, আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা
হইতেছে, আর সংসারে অনেক চাকর দাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্চে
না ত, মাকে কেন ডাকান?”

বিন্দু। “না তবু বোধ হয় তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে,
তেমন কি আর কেউ পারে, হাজার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয় বাবু
তোমাকে যত্নটত্ন করেন ত?”

অতি ক্ষীণস্বরে উমা উত্তর করিলেন, “হাঁ তা আমার যখন যা আবশ্যক,
তখনই পাই,—কিছুর অভাব নেই। যত্ন করেন বৈ কি।”

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত যাতনার
কথা কহিতে চাহে না;—উমার ইহ জগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ
হইয়াছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? ক্ষণেক চিন্তা
করিয়া কহিলেন,

“না উমা, আমার বোধ হয় জেঠাইমা এখানে আসিয়া কয়েক দিন
থাকিলে ভাল হয়। দেখ আমাদের সুখ দুঃখ, ব্যারাম সেরাম সকলেরই
আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক যতটা করে, পরে কি ততটা করে?
এই সুধার ব্যারাম হল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন কত সুশ্রূষা করিল,
তবে আরাম হল। তুমিও বন বড় কাহিল হয়ে গিয়েছ, সর্ব্বদা কাশ্‌ছ,
এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বন্‌, জেঠাই
মাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমায় বল আমিই লিখচি। আহা উমা
তুমি কি ছিলে বন আর কি হয়ে গিয়েছ।” এই বলিয়া বিন্দু সস্নেহে উমার
কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এই টুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পান নাই,—এই টুকুতে তাঁহার হৃদয়
উথলিল, চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা
ধীরে ধীরে বলিলেন “বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল

বাস''—আর কথা বাহির হইল না,—উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন; "উমা তুমি কি আমাকে ভাল বাস না?"

উমা। "বাসি, যতদিন বাঁচিব, তোমাকে ভাল বাসিব।"

বিন্দু। "তবে বন্ আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝি নাই? জগতের তোমার সুখের আশা শেষ হইয়াছে তাহা কি আমি বুঝি নাই? বিবাহের পর যে প্রণয়ে তুমি ভাসিতে, আমার সহিত দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলিতে, সে প্রণয় সুখ শেষ হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি নাই। উমা তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাইতেছ? আমি কি পর? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই তবে জগতে আপনার লোক কে আছে?"

এ স্নেহ বাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দু দিদির হৃদয়ে মুখ খানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরে কাঁদিল।

অশ্রুসিক্ত মুখ খানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণ স্বরে বরিলেন "বিন্দু দিদি তোমার কাছে আমি কখন কিছু লুকাই নাই, কখন ও লুকাইব না। কিন্তু আজ ক্ষমা কর, এ সব কথা আর একদিন বলিব।"

বিন্দু। "উমা, আমি আজই শুনিব। মনের দুঃখ মনে রাখিলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বলিলে একটু শান্তি বোধ হয়।"

উমা। "কি বলিব বল?"

বিন্দু। "আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনঞ্জয় বাবু কি এখন তেমন যত্ন টত্ন করেন?"

উমা। "বিন্দু দিদি, আমার যখন যা দরকার হয় সবই পাই, আমার রোগের চিকিৎসা করাইতেছেন, যত্ন নাই কেমন করে বলিব?"

বিন্দু। "উমা তুমি কি আমাকে পুরুষ মানুষ পাইয়াছ যে ঐ কথায় ভুলাইতেছ। ভাত কাপড় ও ঔষধে কি স্বামীর যত্ন? আমি সে যত্নের কথা বলি

নাই। ধনঞ্জয় বাবু কি পূর্ব্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্ব্বের মত কি খুলিয়া তোমাকে ভাল বাসেন, পূর্ব্বের মত কি তোমার ভাল বাসায় সুখী হয়েন। উমা মেয়েমানুষের কাছে মেয়ে মানুষের কি ঐ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমানুষের জীবন, সে স্নেহটী কি তোমার আছে?"

হতভাগিনী উমা "না" কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটী আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "উমা, সে ধনটী হারাইলে ত চলিবে না, সে ধনটী রাখিবার জন্য কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে?"

উমা। "ভগবান জানেন আমার ভালবাসা কমে নাই, তাঁহাকে এখন ও চক্ষে দেখিলে আমার শরীর জুড়ায়।"

বিন্দু। "উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা, এ জীবনে তোমার ভালবাসার হ্রাস হইবে না। কিন্তু দেখ বন, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসার ও চলে না। মেয়েমানুষের আর ও কিছু কর্ত্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখিতে হয়।"

উমা। "বিন্দুদিদি, যিনি আমাদিগকে খেতে পরিতে দেন, যিনি আমাদিগের প্রথম গুরু, তাঁহাকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি দেয় আছে।"

বিন্দু। "উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম্ম, কিছু তাহা ভিন্ন ও আমাদের কিছু শিখিতে হয়। তা না হইলে সংসার চলে না। যিনি আমাদের জন্য এত করেন তাঁহার মনটী সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাঁহার গৃহটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য আমরা যেন একটু যত্ন করিতে শিখি। অনেক সময় একটী মিষ্ট কথায় ক্ষোভ নিবারণ হয়, একটী মিষ্ট কথায় ক্রোধ শান্তি হয়, আমাদের একটু যত্ন ও প্রফুল্লতায় সংসারটী প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জ্বালা যদি একটু সহ্য করিতে শিখি, ক্রোধ একটু সম্বরণ করিতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করিয়া ক্ষমা গুণ শিখি, তাহা হইলে সংসারটী বজায় থাকে, না হইলে জীবন তিক্ত হয়। উমা আমি অনেক নির্দ্দোষ

চরিত্র পুরুষ ও নির্দ্দোষ চরিত্রা নারী দেখিয়াছি, তাহাদিগের ভালবাসার ও অভাব নাই, তথাপি তাহাদিগের সংসার শ্মশান ভূমি, জিবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণ গুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসার ও কণ্টকময় হয়। অনেক বিলম্বে লোকে ভ্রম বুঝিতে পারে, তখন মনে আক্ষেপ উদয় হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে এ জীবনে কত সুখ হইতে পারিত। কিন্তু তখন অবসর চলিয়া গিয়াছে, প্রণয় একবার ধ্বংশ হইলে আর আসে না. জীবনের খেলা একবার সঙ্গ হইলে আর সে খেলা আরম্ভ করিতে আমাদের অধিকার নাই।"

উমা। "বিন্দুদিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম, তালপুকুরে তোমার দরিদ্র সংসার দেখিয়া এ শিক্ষাটী আমি শিখিয়াছি, ভগবান জানেন ইহাতে আমারত্রুটী হয় নাই। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলিত, কিন্তু যিনি আমার গুরু তিনিই আমাকে সর্ব্বদা মুক্তাহার ও হিরকাভরণ পরিতে দেখিতে ভাল বাসিতেন, সেই জন্য আমি পরিতাম, এই মাত্র আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বলিত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সেরূপে স্বামী একদিন তুষ্ট ছিলেন সেই জন্য আমার অভিমান;—তাঁহাকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন আমি এই যত্ন দ্বিগুণ করিলাম কেন না আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমানুষ নাই, আমি যদি একটু যত্ন না করি কে করিবে বল?"

বিন্দু। "উমা, তুমি যে এটুকু করিবে তাহা আমি জানিতাম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানিতাম, অন্যে তোমাকে দোষ দিয়াছে, আমি দোষ দি নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা, একটু যত্ন স্নেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্ত্তব্য, এ গুলি তুমি শিখিয়াছ, সকলে শিখে না। পূর্ব্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ মানুষ হইয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর ভয়ে, ননদের ভয়ে, জায়ের ভয়ে আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেকটা চাপা পড়িত, আমরা মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর আদেশে সংসার চলিত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকিতে শিখিয়াছে, ছেলেরা ও যাহা ইচ্ছা করে,

বৌয়েরাও আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, সংসার সুখ অনায়াসে বিনষ্ট হয়।"

উমা। বিন্দু দিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলেই একত্রে থাকিবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যাইতে পারিত না, মেয়েরাও নম্রতা শিখিত।"

বিন্দু। "উমা সুখ দুঃখ সকল প্রথাতেই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করিবার কি এই সুখ?"

উমা। "কালীদিদির দুঃখের অন্য কারণ। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে চিরজীবনের প্রণয়সুখে বঞ্চিত।"

বিন্দু। "আমি প্রণয়সুখের কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রত্যহ পথের মুটের চেয়েও যে সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া যে, সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে নির্দ্দোষে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও গঞ্জনা ও গালী খায় তাহার কারণ কি?"

উমা। "বিন্দু দিদি, সে কালীদিদির খুড়শাশুড়ীরা মন্দ লোক এই জন্য।"

বিন্দু। "তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হইবে, তাহারই সম্ভাবনা কি? একজন মন্দ হইলেই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন খিটিনাটি ও কোন্দল; যে কালীতারার মত ভাল মানুষ তাহারই অধিক যাতনা। এই সব দেখিয়াই যাদের একটু টাকা হয় তারা ভিন্ন থাকিতে চায় না হইলে আপনার লোক কে ইচ্ছা করে ত্যাগ করে বসে। তা ভিন্ন থাকিয়াও যদি আমাদের যার যেটুকু করা আবশ্যক তাহাই করি, শাশুড়ীর ভয়ে যেটুকু শিখিতাম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি, তাহা হইলেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে। এখনকার মেয়েরা এটা বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তায় জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফাটকে দাঁড়াইল। উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাক্ষের নিকট যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে আসিল। ধনঞ্জয় বাবু বাগান হইতে আসিলেন। তাঁহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল,

তিনি নিজে অচেতন, দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

ঝর ঝর করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,

"উমা, ভগবান্ জানেন নারীর যতদূর কষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ্য করিতেছ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নাই. বোধ হয় রাত জাগিয়া, না খাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার এই দশা হইয়াছে, রোগও হইয়াছে। কি করিবে বন, যেটি সইতে হয় সহিয়া থাক। যত্নের ক্রুটী করিও না, অভিমান দেখাইও না, একটী উচ্চ কথা কহিও না, তাহা হইলে আরও মন্দ হইবে, এ রোগের সে ঔষধি নহে। নীরবে এ যাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ পাইবে মিষ্ট কথায় ধনঞ্জয় বাবুকে তুষ্ট করিও, কথায় বা ইঙ্গিতে তিরস্কার করিও না, কাঁদিতে হয় গোপনে কাঁদিও। যাহাদের লইয়া ধনঞ্জয় বাবু এখন এত সুখ অনুভব করেন, হয়ত কাল তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন। পরম অসদাচারী ও অসদাচার পরিত্যাগ করিয়া আবার পবিত্র স্নিগ্ধ সংসার সুখ খুঁজিয়াছে এমনও আমি দেখিয়াছি। তোমার মাকে আমি অদ্যই চিঠি লিখিব, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, আশায় ভর করিয়া থাক,—প্রাণের উমা, ভগবান্ এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে পারেন, তোমাকে সুখ দিতে পারেন।"

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। উমা বিন্দুর কথার কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, ভগবান একটী সুখ আমাকে দিতে পারেন,—মৃত্যু।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আর একজন হতভাগিনী।

বিন্দু বাটী আসিয়া পালকী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল,

"ও দিদি, দিদি, কে এসেছে দেখবে এস।"

বিন্দু। "কে লো।"

সুধা। "এই দেখবে এস না, এই শোবার ঘরে বসে আছে।"

বিন্দু। "কে শরৎ বাবু"

সুধা। "না শরৎ বাবু নয়। দিদি, শরৎ বাবু এখন আর আসেন না কেন?"

বিন্দু। "শরৎ বাবুর কি পড়া শুনা নেই, তার একজামিন কাছে, সে কি রোজ আসতে পারে?"

সুধা। "একজামিন কবে দিদি?"

বিন্দু। "এই শীতকালে।"

সুধা। "তার পর আসবেন?"

বিন্দু। "আসবে বৈকি বন, এখন ও আসবে, তা রোজ রোজ কি আসতে পারে, যে দিন অবকাশ পাইবে আসবে। উপরে কে বসিয়া আছে?"

সুধা। "কে বল না?"

বিন্দু। "চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন নাকি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর কে আসবে?"

সুধা। "না তিনি নয়।"

বিন্দু। "তবে বুঝি দেবী বাবুর স্ত্রী, এত দিন পর বুঝি একবার অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলেন"

সুধা। "না তিনিও নয়,—কালীদিদি আসিয়াছে।"

বিন্দু। "কালীতারা! তারা কলকেতায় এসেছে কৈ কিছুই ত জানিনি।"

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন; অনেক দিন পর তাহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন,

"এ কি, কালীতারা! কলকেতায় কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল আছ?"

কালী। "এই পাঁচ সাত দিন হোল এসেছি, এতদিন কাযের ঝন্‌ঝটে আসতে পারিনি, আজ একবার মেজখুড়ীকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া আসিলাম। ভাল নেই।"

বিন্দু। "কেন কাহার ব্যারাম সেয়রাম হয়েছে নাকি?"

কালী। "বাবুর বড় বেরাম' তাঁরই চিকিৎসার জন্য আমরা কলকেতায় এসেছি। বর্দ্ধমানে এত চিকিৎসা করাইলেন কিছুই হোল না, এখন কলকেতায় ইংরেজ ডাক্তার দেখ্‌চেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা।" এই বলিয়া কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। "সে কি? কি ব্যারাম?"

কালী। "জ্বর আর আমাসা। সে জ্বর ও ছাড়ে না. সে আমাসা ও বন্ধ হয় না, আহা তাঁর শরীরখানি যে কাঠিপানা হয়ে গিয়েছে" আবার চক্ষে বস্ত্র দিয়া কালীতারা ফোঁপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। "তা কাঁদ কেন বন, কাঁদলে আর কি হবে বল। এখন ভাল করে চিকিৎসা করাও ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। তা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন? পুরাণ জ্বর আর আমাশায় কবিরাজ যেমন চিকিৎসা করে, ইংরাজ ডাক্তারে তেমন কি পারে?"

কালী। "কবরেজ দেখাতে কি বাকি রেখেছে বিন্দু দিদি, কবরেজে হার মেনেছে তবে ইংরেজ ডাক্তার ডেকেছে। বর্দ্ধমানে তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবরেজ দেখিয়াছে, কলকেতা থেকে ভাল ভাল কবরেজ গিয়াছিল. কিছু করতে পারিল না।"

বিন্দু। "তবে দেখ বন, ইংরাজী চিকিৎসায় কি হয়। তোমরা আছ কোথায়?"

কালী। "কালীঘাটে একটী বাড়ী নিয়েছি, ঠিক আদিগঙ্গার কিনারায়।"

বিন্দু। "কালীঘাটে কেন? এই বর্ষাকালে কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম সেয়ারাম হচ্চে, সেখানে না থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় রইলে না কেন?"

কালী। "তাও কি হয় দিদি? ওঁরা কলকেতায় আসতে চান না, বলেন এখানে বাচ বিচার নেই, এখানে জাত থাকে না। শেষে কত করে কালীঘাটের একজন পাণ্ডাকে দিয়ে একটী বাড়ি ঠিক করিয়া তবে আমরা আসিলাম। রোজ আমাদের আদিগঙ্গায় স্নান হয়, রোজ পূজা দেওয়া হয়। কত ক্রিয়া কর্ম্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে, আমার

শাশুড়ীরা জোড়া মোষ মেনেছেন,—আমার কি আছে বিন্দু দিদি, আমার রূপার গোটটী বেচিয়া জোড়া পাঁঠা দিব মেনেছি। আহা ঠাকুর যদি রক্ষা করেন, বাবুকে যদি এ যাত্রা বাঁচান তবেই আমরা বাঁচলুম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল, ধন বল, বিষয় বল, খ্যাতি বল, কুলের গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব; তিনিই সকলের মাথা, তিনি একাই সব কচ্চেন কর্ম্মাচ্চেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্চেন। তিনি না থাকিলে আমাদের কে আছে বল, ভগবান! এ কাঙ্গালিকে চির-হতভাগিনী করিও না।"

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে জানিত না,—আজি সে স্বামী বিয়োগ চিন্তার যাতনায় ধুলায় লুণ্ঠিত হইল।

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন "ভয় কি বন, চিকিৎসা হইতেছে তবে আর ভয় কি? আমাদের বাবু আছেন, তোমার ভাই শরৎ বাবু আছেন, সকলে দেখিবে শুনিবে, পীড়া শীঘ্র আরাম হইবে। এই সুধার এমন ব্যারাম হয়েছিল, শরৎ বাবু কত যত্ন করলেন, দিন রাত্রি খাওয়া ঘুম ছেড়ে সেবা করলেন, তাই বাঁচন, না হলে কি সুধা বাঁচত।"

কালী। বিন্দু দিদি, শরৎ রোজ এখানে আসে?"

বিন্দু। আগে আসত বন, এখন তার একজামিন কাছে, তাই আসতে পারে না; বাবুই বুঝি তাঁকে একটু ভাল করে লেখাপড়া করতে বলেছেন; প্রায় এক মাস অবধি আসেন নাই।"

কালী। "বিন্দুদিদি মধ্যে মধ্যে তাকে আসতে বলিও, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প সল্প করেলে থাকবে ভাল, আহা দিন রাত পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে গেছে, চক্ষু বসে গিয়েছে। কাল সে এসে ছিল, হঠাৎ চেনা যায় না।"

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ তা ত আমরা কিছু জানি নি। এখানে যখন আসত তখন বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে গেছে? এমন করেও পড়ে? না হয় একজামিন নাই হোল, তা বলে কি পোড়ে পোড়ে

ব্যারাম করবে? আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎ বাবুকে একদিন ডেকে আনবেন, মধ্যে মধ্যে শনিবার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকলেন”

তাহার পর উমাতারার কথা হইল; বিন্দু যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও খানিক কাঁদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,

“আমি আজই জেঠাইমাকে চিঠি লিখিব, জেঠাইমা আসুন যাহা করিবার করুন, আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পারি না। কলিকাতা ছাড়িতে পারিলে বাঁচি, আবার তালপুখুরে যাইতে পারিলে বাঁচি।”

কালী। “তোমাদের এই ভাদ্র মাসে যাবার কথা ছিল না? ভাদ্র মাস ত প্রায় শেষ হোল।”

বিন্দু। “কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠলো কই? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারি নি। পূজার পর না হলে আমাদের যাওয়া হচ্চে না, পূজারও বড় দেরি নাই, মাস খানেক ও নাই।”

কালী। “তবে তোমাদের ধান টান দেখবে কে?”

বিন্দু। “বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিয়ে এসেছেন। সোনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ করিয়া রাখবে, তার কোনও ভাবনা নেই।”

আর কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কালীতারা চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। উমাতারা কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন, এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। “এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দ্দশা, ওদিকে কালীতারার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার তুমি বলচ শরৎও নাকি ছেলে মানুষের মত শরীরের যত্ন না নিয়া পড়াশুনা করিতেছে। এখন কোন দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে তুমিই মন্ত্রী, ইহার উপায় কি ঠিক করিয়াছ?”

বিন্দু। “ললাটের লিখন রাজার সৈন্যেও ফিরায় না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায়ও ফিরায় না। তবে আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিব।”

হেম। “তবু কি ঠিক করিলে? উমাকে কি বলিয়া আসিলে?”

বিন্দু। "কি আর বলিব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাই দিয়া আসিলাম, এখনকার চঞ্চলমতি স্বামীকে বশ করিবার যে মন্ত্রটী জানি, তাহাই শিখাইয়া আসিলাম।"

হেম। "সে ভীষণ মন্ত্রটী কি, আমি জানিতে পারি কি?

বিন্দু। "জানবে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটী আঁবগাছ আছে; তাহারই ডাল লইয়া প্রকাণ্ড একটী মুগুর প্রস্তত করিয়া বিপথগামী স্বামীকে তদ্দারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহা মন্ত্র!"

হেম। "না বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নহে।"

বিন্দু। "তবে কিরূপ?"

হেম। "কচি আঁবের অম্বল রাঁধিয়া দেওয়া, পাকা আঁবের সুমিষ্ট রস করিয়া দেওয়াই বৃহস্পতির মন্ত্রের কয়েকটী সাধন দেখিয়াছি, আর বেশি বড় জানি না।"

বিন্দু। "তবে তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছি। আর জেঠাইমাকে পত্র লিখিব, তিনি আসিলে বোধ হয়, উমার মনও একটু ভাল হইবে, ধনঞ্জয় বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাকিবেন।"

হেম। "জেঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসিবেন কেন?"

বিন্দু। "আমি সব কথা লিখিলে আসিবেন। হাজার হোক মার মন।"

হেম। "আর কালীতারার কি উপায় করিলে?"

বিন্দু। "সেটী তোমাকে দেখিতে হবে। তোমার চাকুরি টাকুরি ত বিলক্ষণ হল, এখন প্রত্যহ একবার করে কালীঘাটে গিয়া রোগীর যত্ন করিতে হবে। সে বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ একজনও নেই, হয়ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদগুলা খাওয়াইয়া রোগীর রোগ আরও উৎকট করিবে। চিকিৎসাটি যাতে ভাল করিয়া হয়, তুমি দেখিও।"

হেম। "তা আমার যাহা সাধ্য করিব। কাল প্রত্যূষেই সেখানে যাইব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করিলে? তুমি রইলে একদিকে আমি রইলাম আর একদিকে, শরৎ বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?"

বিন্দু। "তাই ত, সে পাগলা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। ওলো

সুধা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন টত্ন কর্‌তে পারবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হোলো।”

সুধা দূরে খেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল “দিদি ডাকছিলে?”

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “হেঁ ব’ন ডাক্‌ছিলুম। বলি তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন করিতে পারবি?”

বালিকার কণ্ঠ হইতে ললাট প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয় পূজা।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের বড় আমোদ। নূতন কাপড় হবে, নূতন জুতা হবে, নূতন পোষাক বা টুপি হবে, ইস্কুলের ছুটি হবে, পূজার সময় যাত্রা হবে, ভাসানের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যাবে। বালকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেয়ানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাসকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন খারাব হইয়াছিল, বলিয়া তাহা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ি আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্নে ছাদে পা মেলাইয়া বসিয়া বুদ্ধিমতী পড়্‌শী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন “এবার দেখিব, বেয়ান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাথি মেরে ফেলে দিব। বের সময় বড় ফাকি দিয়েছে, এবার দেখব কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কলকেতায় কটা

আছে? মিন্‌সের যেমন বাওস্তুরে ধরেছে এমন ছেলেরও এমন্ ধরে বে দেয়! তা দেখ্‌বো, দেখ্‌বো, তত্ত্বের সময় কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইব, নৈলে আমি কায়েতের মেয়ে নই।” রোরুদ্যমানা বালবধূ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য তিন মাস হইতে বৃথা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটী না দেখিয়া মেয়ে পাঠাবেন না।

সামান্য ঘরের যুবতীগণও দিন গুনিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকুরি করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটী পাইয়া একবার ভার্য্যার মুখ দর্শন করেন। “এবার কি তিনি আসিবেন? সাহেবে কি এবার ছুটী দিবেন? হেগা সাহেবদের কি একটু দয়া মমতা নেই, তাঁদেরও কি স্ত্রী পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না?

বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হই-তেছে, নাচ গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়ো-জন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কায কি?

পল্লিগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অনুগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাদ্র মাসে শস্য কাটিয়া জমীদারের খাজনা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষক বধূগণ লুকিয়া চুরিয়া সেই ধান একটু সরাইয়া হাতের দুগাছি সাঁকা করিতেছে, বা হাটে একখানি নূতন কাপড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বঙ্গদেশ যেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিৎবর্ণ বেশ ধারণ করিলেন; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরতের আহ্লাদকর জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে লাগিলেন. বায়ু নির্ম্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মনুষ্য শরীরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘর ও ধন ধান্যে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পূর্ণ হইল, চালে নূতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয় পূজার যে এত ধূমধাম, তাহার এই কারণ,—অন্য কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময়ী শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নয়। দরিদ্রের দুঃখ অপনীত হয় কিন্তু শোকার্ত্তের শোক অপনীত হয় না। উমাতারার

মাতা কলিকাতায় আসিলেন, বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয় বাবু দিন কতক একটু অপ্রতিভের ন্যায় বোধ করিলেন, কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপনীত হইল না, তিনি বাড়ী-ভিতর আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পল্লিগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিতে দেখিতে সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। হতভাগিনী উমা আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল, বর্ষাশেষে তাহার কাশি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখ খানি অতিশয় রুক্ষ, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট। কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা না কহিয়া দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকার্য্য করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা সুশ্রুষা করিত, স্বামীর জন্য নানারূপ ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালীতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না, সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে যে টুকু ভাল হয় একদিন অনিয়মে সে টুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবেন কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না কেবল প্রত্যহ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা যত্ন সহকারে মিশ্রির পাণা প্রস্তুত করিত, আক পেঁপে ছাড়াইয়া দিত, মুগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজ হস্তে রেকাবি সাজাইয়া ঝিয়ের দ্বারা শরতের বাটীতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক মানা করিয়া পাঠাইত, কিন্তু ছেলেটী কিছু পেটুক, সেই মুগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ হইলে সে মিশ্রির পানা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইত। ঝিকে বলিতেন "ঝি, কাল থেকে আর

এনো না, তাঁরা কেন রোজ রোজ কষ্ট করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি সত্য বলিতেছি, আমার এসব দরকার নেই।” ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া “তা দেখিতেই পাইতেছি” বলিয়া প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে পেটুক বালকের কথায় মানা করা না শুনিয়া সুধা প্রত্যহ মিস্রির পানা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী বাবুর বাড়ীতে বড় ধুম ধাম, দেবীর বৃহৎ মূর্ত্তি, অনেক গাওনা বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা। দেবী বাবুর গৃহিণীর বুকের বেদনা টা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারাণ্ডায় চিক ফেলিয়া ঠায় বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিরাজ গৃহিনীর মৎলব বুঝিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, “হেঁ তাহাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি সেটা যেন ভাল করিয়া মালিস করা হয়।”

দেবী বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীও আসিয়া যাত্রা শুনিল। নিতান্ত অনভিলাষও নাই। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা, রাধিকার মান ভঞ্জন, গান গুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থই কত প্রকার; গৃহিনীগণ রোরুদ্যমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে থাবড়া মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদগদ চিত্তে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া গিয়া যাত্রা শুনে এলেন। সকালে এসে হেমকে বলিলেন,

“মান ভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।

হেম “না মান ভঞ্জন প্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, আর যাত্রায় কি দেখিব?

বিন্দুও স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,

“মিথ্যা কথাগুলো আর বোলো না, পাপ হবে।”

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমী।

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাদ্য ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল বৃদ্ধ বনিতা; কি ইতর কি ভদ্র, কি শিশু কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের ন্যায় গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্রও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অদ্য এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিল। বোধ হইল যেন জগতে আজি বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মনুষ্য হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অদ্য বাঙ্গালির হৃদয়ে উথলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌজন্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রবঞ্চনার বিষয়, দেখিয়াছি,—নিষ্ঠুর লেখনীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য এই পুণ্য রজনীতে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এই সুখ লহরী দেখিলাম, হৃদয় তুষ্ট হইল, শরীর পুলকিত হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা থাকে, কোনও পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার উপর যবনিকা পাতিত কর,—সেগুলি আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রান্নাঘরে ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুটী ঘুমাইয়াছে, সুধা ঘুমাইয়াছে, হেমবাবুও শুইয়াছেন, ঝিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর দরজায় খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন, ও উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময় কবাটে একটী শব্দ শুনিলেন, কে যেন আস্তে আস্তে ঘা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ হইল।

"কে গা? দরজায় কে দাঁড়িয়ে গা?" কোনও উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন? হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লোকটীকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, পর মুহূর্ত্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট, কিন্তু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও অতিশয় গম্ভীর, শরীরখানি শীর্ণ হইয়াছে, একখানি ময়লা একলাই মাত্র উত্তরীয়!

উভয়ে ভিতরে আসিলেন,—শরৎ বলিলেন,

বিন্দুদিদি অনেক দিন আসিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না, আজ বিজয়ার দিন প্রণাম করিতে আসিলাম।

বিন্দু। শরৎ বাবু বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও, তোমার বে থা হউক, সুখে সংসার কর, এইটী যেন চক্ষে দেখিয়া যাই। ভাইকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব।

বিন্দুর স্নেহ-গর্ভ বচনে শরতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পরে বলিলেন,

শরৎবাবু, তুমি অনেক দিন এখানে আইস নাই, তাহাতে এসে যায় না, প্রত্যহ তোমার খবর পাইতাম, জানিতাম আমাদের কোনও বিপদ আপদ হইলে তুমি আসিবে। কিন্তু এমন করে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া আগে না শরীর আগে? আহা তোমার চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, মুখখানি সুখাইয়া গিয়াছে, শরীর জীর্ণ হইয়াছে, এমন করে কি দিন রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে কি বুঝাইতে হয়, তোমার

বিন্দুদিদির কথাটী রাখিও, রাত্রিতে ভাল করে ঘুমিও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার মত ছেলে পরীক্ষায় অবশ্য উত্তীর্ণ হইবে।”

শরতের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “বিন্দুদিদি, পরীক্ষা দিতে পারিলে কি জীবনের সুখবৃদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড় দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে কয়জন আছে?”

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্য এত চিন্তা কেন? শরীর মাটি করিতেছ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্য এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুইহাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এ কি শরৎ বাবু! কাঁদচ কেন? ছি তোমার কোনও কষ্ট হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বলচো না কেন? শরৎ বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন্ কথাটি আমাকে বল নাই, আমি কোন কথাটী তোমার কাছে লুকাইয়াছি। এত দিনের স্নেহ কি আজ ভুলিলে, তোমার বিন্দুদিদিকে কি পর মনে করিলে?

শরৎ। বিন্দুদিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করিব সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেহ থাকিবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকটে লুকাইব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, বিন্দু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সংকোচ করিও না।”

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, বিন্দুদিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ চিন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। বন্ধুর গৃহে আসিয়া আমি অসদাচরণ করিয়াছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করিয়াছি। বিন্দুদিদি আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার হৃদয় ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত!

শরৎ বিন্দুর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে বিন্দুর সেই দুর্ব্বল কোমল বাহু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অগ্নি কণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শ চরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোনও পাপ চিন্তা ধারণ করে? তাহা বিন্দুর স্বপ্নেরও আগোচর। কিন্তু অদ্য এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর মনে একটু ভয় হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,

শরৎ বাবু, তোমাকে বাল্যকাল হইতে আমি ভাই বলিয়া জানি, তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে; দিদির কাছে ভ্রাতা যাহা বলিতে পারে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা বল।

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করিয়াছি, যে পাপ চিন্তা মনে ধারণ করিয়াছি, তাহা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোষে বলিলেন, তবে আমার কাছে সে কথা বলিবার আবশ্যক নাই, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ভগিনীকে সম্মান করিও।

শরৎ বিন্দুর বাহুদ্বয় ছাড়িয়াদিলেন, আপন মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর ন্যায় যাহার নির্ম্মল আচরণ, শিশুর ন্যায় যে পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপ চিন্তা ধারণ করিতে পারে? ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছিয়া দিলেন, পর আস্তে আস্তে বলিলেন,

শরৎ; তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠিতে পারে না, যাহা আমার শুনিবার অযোগ্য। তোমার যাহা বলিবার বল, আমি শুনিতেছি।"

শরৎ, জগদীশ্বর তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে সুখী করুন। বিন্দু দিদি, আর একটী অভয়দান কর, যদি আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর তুমি এ কথাটীকাহাকেও বলিবে না। আমার পাপ চিন্তা, আমার

জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হইবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।"

বিন্দু। তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।

শরৎ তখন মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ যেন স্থগিদ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া, অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "পুণ্য-হৃদয়া, সরলা বিধবা সুধার সহিত আমার বিবাহ দাও।" বিন্দু তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছয় মাসের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরৎ তখন ক্লিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল, "বিন্দু দিদি, আমি মহাপাপী। ছয়মাস হইল, যে দিন সুধাকে তালপুখুরে দেখিলাম সেই দিন আমার মন বিচলিত হইল। পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানিতাম না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানিতাম না, সে দিন সেই সরলহৃদয়া স্বর্গের লাবণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখিয়া আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করিলাম। কালে সেটী তিরোহিত হইবে আশা করিয়াছিলাম কিন্তু দিন দিন কলিকাতায় অধিক বিষ পান করিতে লাগিলাম, আমার শরীর, মন, আত্মা, জর্জ্জরিত হইল। বিন্দুদিদি তুমি সরল হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটীতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আমাকে আসিতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করিয়া, পাপ চিন্তা ধারণ করিয়া, দিনে দিনে এই পবিত্র সংসারে আসিতাম। জগদীশ্বর এ মহা পাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করিবেন? বিন্দুদিদি তুমি কি ক্ষমা করিবে? সুধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতাম, অনেকক্ষণ বসিয়া দুই জনে গল্প করিতাম, অথবা আকাশের তারা গণিতাম, তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কি পাপ চিন্তা করিতাম বিন্দুদিদি তোমাকে কি বলিব। আমার বিবাহ হইবে, একটী সংসার হইবে লাবণ্যময়ী সুধা সে সংসারে রাজ্ঞী হইবে, আমার জীবন সুধাময় করিবে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করিত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করিতাম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ করিতাম। প্রত্যহ আসিতে আসিতে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য

হইলাম, তখন হেম বাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া একদিন কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান আসিল, পাঠ, পুস্তক, পরীক্ষা চিন্তার আগুনে দগ্ধ হউক,—কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়িয়াছি, পাছে সরলচিত্তা সুধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হইল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ করিলাম। সুধাকে না দেখিয়া আমিও তাহার চিন্তা ভুলিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু সে বৃথা আশা! বিন্দুদিদি সে পাপচিন্তা ভুলিবার জন্য আমি দুই মাস অবধি প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা, নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টার ন্যায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, নাট্যশালায় যাইয়া সে চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার সহপাঠীদিগের সহিত মিশিয়াছি, গীত বাদ্য শুনিতে গিয়াছি, কিন্তু সে কাল চিন্তা ভুলিতে পারি নাই। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার নাট্যাভিনয়ে সেই আনন্দনীয় মুখমণ্ডল দেখিতাম,—রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতাম। বিন্দুদিদি এ দুই মাসের কথা আর বলিব না, পথের কাঙ্গালীও আমা অপেক্ষা সুখী।

"বিন্দুদিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বলিলাম, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমাকে মহাপাপী বলিয়া দূর করিয়া দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘৃণা করিলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করিবে, কে আমাকে স্থান দিবে?" আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়নবারি বহিতে লাগিল।

বিন্দু স্থির হইয়া এই কথা গুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,

ছি শরৎ বাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে ধিক্কার করিও না। তোমাকে ছেলে বেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করিতে পারি? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নাই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলিয়া ধিক্কার করিতেছ। তবে বিধবার বিবাহ

আমাদের সমাজে চলন নেই, তা এখন বিবাহ হয় কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, যাহা হয় তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তা তুমি আপনাকে এরূপে ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথায় বাবুর যাহাই মত হউক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হইবে না।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করিলে, আমাকে যে আজ ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না।

বিন্দু। "শরৎ বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই, কিছু খাবে? একটু মুখটুক ধোও না, বাবুর জন্য আজ লুচি করেছিলুম। তার খানকত আছে। একটী সন্দেশ দিয়ে খাবে"?

শরৎ। "না দিদি আজ কিছু খাইব না, খাদ্যে আমার রুচি নাই।"

বিন্দু। "তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিও।"

শরৎ। "ক্ষমাকর, এ বিষয়ে হেম বাবু যাহা বলেন, আমাকে বলিও, তাহার পূর্ব্বে আমি হেম বাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না"।

বিন্দু। "তা কাল না আসিলে নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অসুখ করিবে যে।"

শরৎ। "দিদি ক্ষমা কর, এ বিষয় নিষ্পত্তি না হইলে আমি সুধার কাছে মুখ দেখাইব না। দেখিও বিন্দু দিদি, এ কথা যেন সুধার কাণে না উঠে, তাহার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে এক জন হতভাগা থাকিবে, আর একজনকে হতভাগিনী করিবার আবশ্যক নাই।"

বিন্দু। "তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয় তাহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।"

শরৎ। "না দিদি, পত্রে এ কথা লিখিও না, আমি আপনি আসিয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কবে আসিব বল, আমার জীবনে বিধাতা সুখ লিখিয়াছেন কি দুঃখ লিখিয়াছেন কবে জানিব বল।"

বিন্দু। "শরৎ বাবু, এ কথা ত দুই একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, অনেক দিক

দেখিতে হবে, অনেক পরামর্শ করিতে হবে। তা তুমি দিন ১৫।২০ পরে এস।”

শরৎ। “তাহাই হউক। আমি কালীপূজার রাত্রিতে আবার আসিব, এ কয়েক দিন জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।”

কৃষ্ণচরিত্র

এক্ষণে উদ্যোগ পর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক—

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজের একটী মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মত এই:—যে দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটী মত এই যে অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটী পরস্পর বিরোধী—কাজেই, দুইটী মতই যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটীর মধ্যে একটী যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটী অতিকঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম বলে সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগ পর্ব্ব মধ্যে প্রধান তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগ পর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে রূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন ; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক সময় ঘটে যেখানে ঠিক্ এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযুজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে, যে আইন আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই, যে যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায় ; যে দুর্ব্বল সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান অথচ ক্ষমাবান, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি পাঠকেরা সকলেই জানেন, যে পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন ; তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন ; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের

নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয় তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিরাট রাজের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইয়া তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না, যে যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেননা হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত একটী গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না— বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ বিধ্বংশের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে

রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, যে সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও "parliamentary procedure" ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহা বলবান বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যে টুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদ ও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে, এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন, যে দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন, যে যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, "তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম, যে তিনি কৌরবপাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাত শূন্য উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুইজনে একদিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক সমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবা-

মাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমর পরাঙমুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙমুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগ পর্ব্বে এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টী কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিবার সময়ে—একটা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা চাই—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিয়াই কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল

কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাঁহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে॥

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে।) যেখানে মহাভারত একাই ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই; তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথা গুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই, যে তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক, সত্যে ও মিথ্যায় মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

এখনও ইহা স্বীকার করা যাউক, যে ঐ সকল ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যে টুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাস গ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই

সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্ত্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্ব প্রথানুসারে গুরু শিষ্য পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই, যে রোম গ্রীশ বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাস গ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ, বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনাপ্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখন ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহাদিগের রচনা লোক মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোক হিত

স্মরণ করে, তাঁহারা সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তবে, অবশ্য এমন কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যে গ্রন্থে কিছু সত্য আর অনেক মিথ্যা আছে, তাহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্যা তাহা কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে। সে বিচার পশ্চাৎ করা যাইতেছে।

ইউরোপিয়েরা মহাভারতকে "Epic Poem" বলিয়া থাকেন, দেখাদেখি এখনকার নব্য দেশীয়েরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সব উড়িয়া গেল। মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ; উহাতে আর কোন ঐতিহাসিকতা থাকিল না। এ কথারও বিচার করা যাউক।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমন হইতে পারে না, কেন না সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয় যে প্রকার সৌন্দর্য্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে এপিক বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও থুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্ত্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই;

মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। তাহা স্থানান্তরে বুঝান গিয়াছে।

স্থূলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস মূলতঃ যে ঐতিহাসিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই; এবং নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এমনও বিবেচনা হয় না।

যদি মহাভারতের কোন অংশের ঐতিহাসিকতা থাকে তবে কৃষ্ণেরও ঐতিহাসিকতা আছে।

মহাভারতের কোন অংশ অনৈতিহাসিক, বা প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে? তাহা আমরা সময়ে সময়ে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে পাঠকের বিচার সাহায্যের জন্য একত্রিত করিয়া দিতেছি।

(১) যাহা অনৈতিহাসিক, স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া ত্যাগ করাই উচিত।

(২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণই পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৩। সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না তাহার অভাবে মহাভারতের মহাভারতত্ব থাকে না। দেখা যায়, যে সে গুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায়, যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৪) মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্র গুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি

কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। যদি মনে কর কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে স্থান বিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

(৫) যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত চারিটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচন বিচার প্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

কো তুঁহু!

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহিঁ আসন,
অরুণ-নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়,
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল,
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল
চরণ কমলযুগ ছোঁয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখ পর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই,
পদতলে আপনা থোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছই,
অনুখণ সঘন নয়ন জল মুছই,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ পর গোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

আর আধখাঁনা কোথায় ?

এই পৃথিবীতে আসিয়া যেন কি হারাইয়াছি, সদাই যেন সেই ধনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সদাই যেন কাহাকে খুঁজি কিন্তু কি যে হারাইয়াছি আর কাহাকেই বা খুঁজিতেছি তাহা স্থির করি পারিতেছি না। মনের এই ব্যকুলতা ঘুচাইবার জন্য—অন্তরের শান্তি লাভের জন্য সংসার সাগরে কতই ডুব দিতেছি কিন্তু অন্তরের সেই জ্বালা কিছুতেই থামে না। এক একবার কাতরভাবে রোদন করি, কিন্তু যাহাকে ডাকিতেছি আমার কান্না তাহার কাছে পৌঁছে না। আমি কাহার জন্য বা কিসের জন্য এত ব্যাকুল তোমরা কেহ বুঝাইয়া দিতে পার ?

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী একদিন বলিয়াছেন যে এ জগতে তিনি একা, জগতের কোন পদার্থে তিনি তাঁহার মন বাঁধেন নাই—তাই তাঁহার মন সদাই উড়িয়া যায়, তাই তিনি কখন সুখী হন নাই; তাঁর কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এক জায়গায় মন বাঁধিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যাহা খুঁজি পাইব, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না; আমিও জোর করে মনের স্বাধীনতা হরণ করতে বড় রাজি নহি। মন যখন পার্থিব কোন পদার্থেই বাঁধা থাকিতে চায় না, তবে আমার মন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় এই একটি আমার প্রধান ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে তিনি একা, আমি ভাবি আমি একা নই। আমি আধখানা। আমার একটা আদৎ দেহ আছে বটে, কিন্তু মনটা আমার আধখানা। এই জগতে আমার মনের অপরার্দ্ধ কোথাও না কোথাও আছে; আমার এই আধখানা মন অপর আধখানা মনের সহিত মিশিতে চায়, যত দিন না এই দুই আধখানায় মিশিয়া পূরা হইবে ততদিন অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুচিবে না। আমার অসম্পূর্ণ মন পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি উহাকে রূপরসাদি পার্থিব বিষয়ে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তবে সে বাঁধনে মন ত কখনই সন্তুষ্ট হইবে না; আমি

আর আমার মনকে কোথাও বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। যাও মন তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যেখানে তোমার অভিমত পদার্থ আছে তুমি সেইখানে চলিয়া যাও, একবার খুঁজিয়া বলিয়া দাও দেখি, সেই অপরার্দ্ধ কোথায় এবং কি ভাবে থাকে—একবার তাহাকে চিনাইয়া দাও ; আর আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই চাহিব না। আমার মন, মন চায় ; অন্য পদার্থে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও বাঁধা থাকিতে চায় না। মনের স্রোত মনের সমুদ্রে মিশিতে চায়, আমার ভিতরকার মন, বাহিরের মনের সহিত মিশিতে চায়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে তাহাদের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাই আমার ভিতরে এত গোলমাল, এত কলকল নাদ। আমি এত দিন না বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম এইবার হইতে মনের পক্ষ অবলম্বন করিব মনস্থ করিলাম।

আমার ভিতরকার মন আধখানা, বাহিরে উহার অপরার্দ্ধ রহিয়াছে, তাই তাহার সহিত মিশিবার জন্য সদাই বাহিরে আসিতে চায়। কিন্তু একটি বড় গোল উপস্থিত হইয়াছে। যাহা অসম্পূর্ণ তাহাই কুৎসিৎ ; যাহা কুৎসিৎ তাহাকে আমার বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে বড়ই সংকোচ হয়। সেই জন্য যদি বা কখন মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মনকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাই, তখন উহাতে এমনি একটি আবরণ দিয়া বাহির করিতে যাই যে লোকে উহাকে কুৎসিৎ বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করে। এই লোকলজ্জার খাতিরে পড়িয়া, পরনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া, আমার আধখানা মনকে যথাবৎ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার বাহিরের মন, ভিতরকার মনের ঐ আবরণে ঠেকিয়া ভিতরকার মনের সহিত মিশিতে পারিল না, আমিও অন্তরের শান্তি কখন পাইলাম না।

তোমাদের পৃথিবীতে সত্যের আদর নাই, তাই তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমার বড় বনে না। আমি যদি আমার ভিতরকার মনকে উলঙ্গ অবস্থায় বাহিরে প্রকাশ করিতে যাই তবেই আমি তোমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব ; তোমরা আমাকে হয়ত মনুষ্যসমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে— তোমরা সত্যের আদর জান না, তাই আমি সত্যাচারী হইতে পারি নাই। তোমরা সকলেই কপটাচারী হইয়া আমাকেও কপটাচারী করিয়াছ। সেই

জন্যই আমার ভিতরকার মন আমার বাহিরের মনের সহিত মিশিতে পারিতেছে না—তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইতেছে না। হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মোচন করিয়া অন্তরের ভাব যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া সত্যের সহায় লইয়া পূর্ণ হইবে, এই অভিলাষটি বড়ই প্রবল হইয়াছে—কিন্তু আমার এ অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? সত্যের আদর জানে এমন লোক কি তোমাদের পৃথিবীতে কেহই নাই? অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ, এর মধ্যে যতদিন আবরণ থাকিবে ততদিন শান্তি মিলিবে না। যাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে এই আবরণটি ঘুচিয়া যায় তাঁহাকেই আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝি। যিনি সত্যের উপাসক তাঁহাকেই আমি কৃষ্ণোপাসক বলিয়া বুঝি। গোপীগণের বস্ত্র হরণে যিনি মন্দরুচি দেখেন দেখুন, কিন্তু আমি উহার ভিতর একটি বড় সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। অন্তরকে আবরণ শূন্য না করিলে কৃষ্ণের সহিত মিশা যায় না।

যতদিন আমার ভিতরের এই আধখানা মন বাহিরের অপরার্দ্ধের সহিত না মিশিবে তত দিন আমি অসম্পূর্ণ, তত দিন আমি কুৎসিৎ, তত দিন আমি সকাম; আমার এই সকাম মনকে যিনি নিষ্কাম করিতে সক্ষম তিনিই আমার হৃদয়ের সখা—তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথায় তোমরা কি অর্থ বুঝ আমি জানি না, কিন্তু আমি এই মাত্র বুঝি যে যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের গুরু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ; যিনি সত্যের পক্ষপাতী, সত্যব্রতাবলম্বী ঘোর পাপীও যাঁহার ভালবাসার পাত্র, যাঁহার কাছে সত্যই ধর্ম্ম, লোকনিন্দা লোক লজ্জায় যিনি কখন ব্যথিত নহেন, আমার মন হাজার কুৎসিৎ হইলেও যিনি আমার উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহাকে আমি অকাতরে আমার উলঙ্গ মন সমর্পণ করিতে পারি এবং যিনি আমার সেই মন লইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারেন তিনিই আমার হৃদয়-বন্ধু। কোথায়—আমার সেই হৃদয়-বন্ধু কোথায়!

দেশীয়

নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি।

আজিকার দিনে, এ দেশে যত কথার আন্দোলন হইতে পারে, তন্মধ্যে সামাজিক স্থিতি ও গতিই সকলের অপেক্ষা গুরুতর। আর সকল তত্ত্বই ইহার অন্তর্গত। বড় আহ্লাদের বিষয়, যে এই সম্বন্ধে দুই জন মহাত্মা প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ, এই সময়ে কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বপর্য্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালায়, আর একটি ইংরেজিতে। একটির প্রণেতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন অধিনায়ক, দ্বিতীয় লেখক এদেশে পজিটিবিজ্‌মের নেতা। উভয়েই উদার, মহদাশয়, পণ্ডিত, চিন্তাশীল, এবং ভারতবৎসল। আমরা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি" বিষয়ক প্রবন্ধ, * ও কটন সাহেব প্রণীত "New India," নামক নব প্রচারিত পুস্তকের কথা বলিতেছি।

নব্য বঙ্গ সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কেন না প্রয়োজন নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। স্থিতি ও গতিটা † সকলেরই বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

স্থিতি ও গতির পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা দ্বিজেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত কয়টি কথায় অতি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"গতি কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই; প্রত্যহই লোকেরা তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়-ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবসান করে, কাহারো শরীরে অধিক বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখন সমস্তই উল্‌টিয়া যায়; পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে; পূর্ব্বে জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে; এককালে আর এককালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীতকাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস-গুণে শীত-বস্ত্র

---

* তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র।

† Order and Progress.

পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এত কাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সমাজের ও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একরত্তি নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্ম কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ও গ্রীষ্ম কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীত কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোন কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না—সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে এ কথা শীতকালে খাটে না; কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালে তেমনি খাটে, কোন কালে এ কথা উল্‌টাইতে পারে না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম। শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটী যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ব্বকালিক নিয়ম,—স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে—এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজে যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্ব সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্তি-মূল।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝাইয়াছেন, যে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ব্যতীত মঙ্গল নাই। স্থিতির দৃঢ়ভিত্তি ভিন্ন সমাজের ধ্বংস হইবে; পক্ষান্তরে গতি ভিন্ন সমাজ নির্জীব হইয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেব উভয়েই বুঝাইয়াছেন যে আমাদের হিন্দু-সমাজের স্থিতির মূল বড় দৃঢ়, চারি হাজার বৎসরের ঝড় বাতাসে ইহার

একটি ডাল পালাও ভাঙ্গে নাই। তবে এ সমাজের গতি ছিল না। অবরুদ্ধ-স্রোতঃ জলাশয়ের মত, ইহা পঙ্কিল, শৈবালসঙ্কুল, মলিন এবং অপুণ্য হইয়া উঠিয়াছিল ময়লা মাটি জমিয়া ভরাট হইবার মত হইয়াছিল। তার পর উপরোক্ত দুই জন লেখকই বলিতেছেন, যে এখন সমাজে আবার গতি সঞ্চার হইয়াছে। আর উভয় লেখকের মত, যে সমাজের সেই গতি ইংরেজি শিক্ষা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয় লেখকের মতভেদ নাই। এবং এ সকল মতের যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তার পর একটা বড় গুরুতর কথা আছে।

গতি যেমন সমাজের মঙ্গলকর, ইহার অবিহিত বেগ তেমনি অনিষ্টকর। গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়; বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে। সমাজের ঐ রূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোন নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছু কাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে; প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়; প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভুত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতন পুরাতনের অঙ্গের শামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের সহিত নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই দিনের পুরাতন নাবালক স্থিতিকে

বৎসর কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

"নব্য বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবেন, উভয়ের মধ্য পথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতি মঞ্চে লইয়া যাইতে হইবে।"

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন "Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder."

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি? গতির বিষয়ে, কি দ্বিজেন্দ্র বাবু, কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই। আমাদেরও কাহারও কোন সন্দেহ নাই—হইবারও কোন সন্দেহ নাই। তবে কটন সাহেব এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয়, যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী। অতএব স্থিতির দিগে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপায়ে সেই স্থিতির বল অবিচলিত থাকে উভয় লেখকই তাহার এক একটা উত্তর দিয়াছেন। এইখানে দুইজন লেখকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আদি ব্রহ্মসমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর। তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। কিন্তু এই মত ভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয়, বস্তুতঃ তত গুরুতর নহে। কেন না আদি ব্রহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম-মূলক; তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ততঃ "Historical continuity," রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The old Hindoo polytheism is a present basis of moral order and rests upon foundations so plastic that it can be moulded into the most diverse forms adapting itself equally to the intellect of the subtle metaphysicican and to the emotions of the unlettered peasant. It combines in itself all the elements

of intensity, regularity and permanence. Its chief attribute is stability. The system of caste, far from being the source of all the troubles which can be traced in Hindoo society, has rendered the most important services in the past and still continues to sustain order and solidarity. The admirable order of Hinduism is too valuable to be rashly sacrificed before any Moloch of progress. Better is order without progress, if that were possible, than progress with disorder. Hindooism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life. In the future its distinctive conceptions will be preserved and incorporated into a higher faith, but at present we are utterly incapable of replacing it by a religion which shall at once reflect the national life and be competent to form a nucleus round which the love and reverence of its votaries may cluster."

কটন সাহেবের বিশেষ ভরসা "নব্য হিন্দু" সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহার বাক্য পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The vast majority of Hindoo thinkers have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism which seeks only to decry the social monuments raised in ancient times by Brahmin theocrats and legislators, to vilify the past inorder to glorify the present, and to sing the shallow glories of an immature civilisation with praises never accorded to the greatest triumphs of Humanity in the past. The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilisation to shatter. The stability of the Hindoo character could have shown itself in no way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis."

নব্য হিন্দু ধর্ম্মের তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য নহে। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে তাহার ভিতর সত্য আছে। সে বর্ণনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The Hindu mind naturally runs in a religious groove of thought and recoils from any solution of its present difficulties which does not arise from the past religious history of the nation. And, therefore the vast majority of Hindoo thinkers do not venture to reject the supernatural from their belief. They adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence, and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these rights are embedded in the traditions and customs of the people, that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is thus animated by a spirit of large-hearted tolerance."

দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেবের এই সকল কথা সমালোচনা করিয়া যে কয়টি কথা পাওয়া গেল, তাহা পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এজন্য তাহা পুনরুক্ত করিতেছি।

স্থিতি এবং গতি এই দুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে। স্থিতি গতি-রোধকারিণী হইতে পারে; গতি স্থিতি-ধ্বংসিনী হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হইয়া, পরস্পরের সামঞ্জস্য হয়, সমাজের নায়কদিগের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ চাই। উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়া স্থিতি দুর্জ্জেয়া হইয়া গতি রোধ করিয়াছিল, এক্ষণে ইংরেজি শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তাহা না হইয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে। ভরসা ধর্ম্মের উপর। এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে, ব্রাহ্মবাদী এবং পজিটিবিষ্টে, এক মত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দু ধর্ম্মে।

বলা বাহুল্য, প্রচার-লেখকেরা এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি বিবেচনা করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। এখনকার নব্য ভারত-সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার বল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। বৃত্তি গুলির অনুশীলনের নামই শিক্ষা। আর নবজীবনে দেখাইয়াছি যে সেই অনুশীলন হইতেই ধর্ম্ম। যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি। হিন্দু ধর্ম্মেরও তাৎপর্য্য এই যে, শিক্ষা ধর্ম্মের অংশ। আদিম কালে যাহা অধ্যয়নীয় শাস্ত্র ছিল, তাৎকালিক হিন্দু ধর্ম্মে সেই সকলের অধ্যয়নই আদিষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে শাস্ত্রান্তর যদি লোক-শিক্ষার অধিকতর উপযোগী দেখা যায়, তাহারই অধ্যয়নই প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ঋষিগণ উপস্থিত থাকিলে অবশ্য স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের আদিষ্ট ধর্ম্মের এই স্থূল মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, ইংরেজি শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনু-সারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতিতে গতিতে বিরোধ থাকিবে না। তখন "Order" ও "Progress" এক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজের স্থিতি ও গতির মধ্যে বিরোধের ধ্বংস করিয়া, স্থিতির বল, ও গতির বল, উভয়কেই এক বলে বর্দ্ধিত করিয়া, সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই নব্য হিন্দু ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

পাখীটি কোথায় গেল ?

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন ? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন ?' মানুষটি বলিল—'পাখী পুষিবেন কি ?' আমি কখনও পাখী পুষি নাই। পাখী পুষিতে কখনও সাধও হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড়ই ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখনও পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—'পাখী পুষিবেন কি ?'—কি জানি কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল, মনে হইল বুঝি আমি পাখীটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কতই কষ্ট দিবে—পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—আবার অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে তাহাকে কতই কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তায় আবার দেখিলাম যে পাখীটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে 'জড়সড়' হইয়াছে, বুঝিবা কতই আকুল হইয়াছে, বুঝিবা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে! বড়ই দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—পুষিব। মানুষটি বলিল, আটটি পয়সা পাইলেই পাখীটি দি। পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং এক প্রতিবাসীর নিকট হইতে একটা খাঁচা লইয়া পাখীটিকে তাহাতে রাখিয়া তাহাকে দুধ, ছাতু ও জল খাইতে দিলাম। দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তবু পাখীটি খাইল না। অর্দ্ধ

মুদিত নেত্রে আস্তে আস্তে খুঁকিতে লাগিল। মনে হইল বুঝি আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়া ভয়ে খাইতেছে না। একটু সরিয়া গেলাম। পাখীটি আমাকে আর দেখিতে পাইল না। খানিক পরেই একটু ছাতু ও জল খাইল। আমি বুঝিলাম—আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়াই এতক্ষণ খায় নাই। কিন্তু দুষ্‌মুনের ঘরে দুষ্‌মুনের সামগ্রী খাইল ত। আমি যাহার এত সুখ এত সামগ্রী হরণ করিয়াছি—কিন্তু আমার ঘরে আমার জিনিস খাইল ত। পেটের দায় এমনি দায়। পেটের মতন যন্ত্রণা জগতে আর নাই—পেটই ত জগতে এত কলঙ্কের মূল। আমার পাখী পেটের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারিল না—পেটের জন্য দুষ্‌মুনের জিনিস খাইয়া কলঙ্কে ডুবিল। বুঝিলাম আমাদের ন্যায় পাখীও ক্ষুদ্র, পাখীও দুর্ব্বল। পাখীর উপর মায়া হইল। সে দিন আর পাখীর কাছে গেলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি পাখী দিব্য খাওয়া দাওয়া করিয়াছে। ছাতুর বাটিতে ছাতু প্রায় নাই, জলের বাটিতে জলও কিছু কম এবং খাঁচার নীচে মেজের উপর কিছু ছাতুর গুঁড়া এবং দুই চারি ফোঁটা জল পড়িয়া আছে। বড় আহ্লাদ হইল। পাখীর কাছে গেলাম। পাখী সরিয়া খাঁচার এক কোনে গিয়া বসিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাখীও সেই এক ঘণ্টা কাল সেই কোনে বসিয়া রহিল কিছু খাইল না। আমি সরিয়া আসিলাম—পাখীও খাইতে লাগিল। তখন আবার ভাবিলাম—পাখী আমাকে এখনও দুষ্‌মুন ভাবিয়া খাইতেছে না। ভাল, এমন করিয়া খাওয়াইতেছি তবুও পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিতেছে? ভাবিবে না ত কি? সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল পেটে খাইতে দিতেছি বলিয়া কি সে আমাকে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিবে? পেটটা কি এতই বড়? তবে কেন পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিবে না? কিন্তু দুষ্‌মন হই আর যাই হই, আমি পাখীকে পয়সা দিয়া কিনিয়াছি ত বটে; তবে কেন পাখী আমার হয় না? মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের হয়; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের মন যোগায়, গোলামি করে, গুণগান করে, সবই করে; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষকে গতর দেয়, মানমর্য্যাদা দেয়, পুণ্যধর্ম্ম দেয়, সব দেয়। পাখীকে পয়সা

দিয়া কিনিলাম তবে কেন পাখী আমার হয় না, আমাকে কিছু দেয় না? কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। বোধ হইল বুঝি পাখী নীচ জন্তু, পয়সার মাহাত্ম্য জানে না, পয়সার জন্য সব করা যায় সব দেওয়া যায়; এ উচ্চ মানব-নীতি বুঝিতে পারে না। আরো দুই চারি দিন গেল। আবার একবার পাখীর কাছে গেলাম। দেখি সেখানে আমার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে। পাখী আমাকে দেখিয়া আর তেমন করিয়া সরিয়া গেল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি তাহার সহিত পাখীর কথা কহিতে লাগিলাম। পাখী খাইতে লাগিল। বুঝিলাম পাখী খাঁচা চিনিয়াছে। মনে দুঃখ উথলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া উঠিয়া নামিয়া নামিয়া যার আশ্ মিটে না, কেন তাহাকে, হায়! হায়! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলাম! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচা চিনাইলাম! কেন তাহাকে অনন্ত ভুলাইলাম! এ মহাপাতক কেন করিলাম! দুই এক দিন বড়ই কষ্টে গেল। এক একবার মনে হইতে লাগিল পাখীকে উড়াইয়া দি। একবার খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়া একটা জানালার উপর বসিল। আবার মনটা কেমন কবিতে লাগিল—পাখী পালায় ভাবিয়া প্রাণটা কেমন হইয়া গেল—অমনি পাখীকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলাম। আপনার কাছে আপনি হারিলাম। কেন হারিলাম বুঝিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই কি মহাপাতক করিলাম?

এক দিন ছেলেগুলিকে লইয়া পাখীর কাছে বসিলাম। পাখী যেন কতই আহ্লাদিত হইয়া খাঁচার ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল এবং একবার এ ছেলেটির দিকে একবার ও ছেলেটির দিকে যাইতে লাগিল। আমরা সকলে আহ্লাদে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং করতালি দিতে লাগিলাম। পাখী ভয় পাইল না—তেমনি লাফালাফি করিতে লাগিল। আমি একটু ছাতু লইয়া পাখীকে খাইতে দিলাম—পাখী খাইল না। আমার একটি ছেলে একটু ছাতু লইয়া খাইতে দিল, পাখী টুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মনে হইল আমার ছেলেগুলির সহিত পাখীর ভ্রাতৃভাব হইয়াছে—ছেলেগুলিকে বলিলাম, উটি তোমাদের ভাই। সেই দিন হইতে পাখীটিও আমার ছেলে হইল। পাখীটিকে আমার হৃদয়ের

খাঁচায় পুরিলাম। সে খাঁচার সীমা নাই; অর্গলযুক্ত দ্বার নাই, আশে পাশে মাথায় পায় ঠেকে এমন কাটির কাঠাম নাই। পাখীকে সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ খাঁচায় পুরিলাম। মৃগাপাতকের ভয় কোথায় চলিয়া গেল। মন আনন্দে মজিয়া উঠিল। পাখীও আর তাহার বাঁশের খাঁচায় এখানে ওখানে ঠোঁট গলাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে না। এখন বাঁশের খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখি, পাখী উড়িয়া যায় না। খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখিলে পাখী এক আধবার আমার কাছে আসে, এক আধবার আমার ছেলেদের কাছে আসে, আবার নাচিতে নাচিতে খাঁচার ভিতর গিয়া বসে। খাঁচা এখন পাখীকে বড় মিষ্ট লাগে। খাঁচার এখন আর সীমা নাই, খাঁচা এখন অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ। খাঁচার এখন আর কাটির কাঠাম নাই—আশে পাশে মাথায় পায় লাগে এমন কাটির বেড়া নাই। খাঁচা এখন পাখীর বড়ই সখের, বড়ই সাধের ঘর। পাখী এখন খাঁচার নেশায় ভোর। আমি এখন পাখীর সহিত কত কথা কই, পাখীও কত কথা কয়—যেন কত আদরের, কত আব্দারের কথা কয়, কত চেনা দেশের কথা কয়, কত অচেনা দেশের কথা কয়, কত হাসে, কত কাঁদে, কত গান গায়, কত বকে, কত ঝকড়া করে, কত অভিমান করে, কত ভাব করে, কত ভ্রূকুটি করে, কত ভণ্ডামি করে। পাখীকে আমি কত রকম করিয়া দেখি, পাখীও আমাকে কত রকম করিয়া দেখে। পাখীর খাঁচা খুলিয়া দি। পাখী আসিয়া আমার কাঁধের উপর বসে, আমার হাতের উপর বসিয়া ছাতু খায়। আমি এখন আর পাখীর সে ঢুষ্‌মুন নই। আমি এখন পাখীতে মজিয়াছি, পাখীও এখন আমাতে মজিয়াছে। এখন অনন্ত আকাশ হৃদয়ের অনন্তত্বে ডুবিয়া গিয়াছে—পাখী এখন আর অনন্ত আকাশ খোঁজে না, তাহার অনন্ত আকাশের তৃষ্ণা আর নাই। সে এখন আকাশের অনন্তত্ব ভুলিয়া হৃদয়ের অনন্তত্বে মিলাইয়া গিয়াছে। অনন্ত বিশ্ব হৃদয়ের ভিতর বিন্দু অপেক্ষাও বিন্দু। বিশ্ববিন্দু হৃদয়ের কাছে কোন্ ছার? কিন্তু হৃদয়ের ভিতর অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত হৃদয়। হৃদয় বিশ্বদ্রাবক, বিশ্বের বিশ্ব। আমার পাখী সেই বিশ্বের বিশ্বে পশিয়াছে। তাহার কি আর সেই তুচ্ছ অনন্ত-আকাশের কথা মনে থাকে?

আহা! আমার সে পাখী আর নাই! আজ চারি দিন হইল আমার সে

পাখী মরিয়া গিয়াছে! মরিয়া কোথায় গিয়াছে? কে বলিবে কোথায় গিয়াছে?' কিন্তু আমি দিবাচক্ষে দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি যে সে মরিয়া অনন্ত হইয়াছে। আজ আমি যেখানে যে রঙ দেখি সেখানে সেই রঙে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে চোক্ দেখি সেখানে সেই চোকে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে ঠোঁট দেখি সেখানে সেই ঠোঁটে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। আজ আমি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল হীম তাপ পাহাড় পর্ব্বত ধুলা বালি বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ নরনারী সকলেতেই আমার সেই পাখী দেখিতেছি, হাড় হাড়ে আমার সেই পাখী অনুভব করিতেছি। আজ অনন্ত বিশ্বে আমার সেই পাখী ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ আমিও আমার সেই পাখী-ময়, এই অনন্ত বিশ্বও পাখী-ময়। তাই আমিও আজি কি মধুময়, আমার অনন্ত বিশ্ব ও কি মধুময়। আমার ক্ষুদ্র পাখী আজ অনন্ত কায়া ধারণ করিয়া অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক ফোঁটা পাখী আজ অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছে। তাইতে অনন্ত বিশ্ব ও অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে সেই এক ফোঁটা পাখীতে মজিয়াছিলাম, তাইত আজ অনন্ত বিশ্ব দেখিলাম, অনন্ত বিশ্বে মজিলাম এবং অনন্ত বিশ্ব আমাতে মজিল। তাইত আজ অনন্ত হইলাম। তাইত আজ বুঝিলাম যে ফোঁটার ভিতরেই বিশ্ব ফোটে, ফোঁটা অনন্তেরও অনন্ত।

আমার পাখী আছে বৈ কি। কিন্তু আমার ছোট ছেলেগুলি আমাকে এক একবার জিজ্ঞাসা করে—পাখীটি কোথায় গেল?

৫ই চৈত্র ১২৯২। শ্রীচঃ—

সান্ত্বনা।

কে তোমরা কাঁদ মোর তরে—
কে তোমরা সংসারের জীব,
আমি ত গো তোমাদের নই ;
এক দিন ছিনু তোমাদের,
কেঁদেছিনু তোমাদের মত
সংসারের দুঃখ বুকে সই !

মায়ার স্বপনে আত্ম ভুলে,
যত দিন ছিনু আমি হোথা,
দেখে শুনে তোমাদের মুখ ;
তোমাদের আনন্দ উল্লাসে,
তোমাদের রোগ শোক দুঃখে,
পেয়েছি গো বহু দুঃখ সুখ।

হোথা যে রবনা চিরদিন
জানিতাম এ কথা তখনো,
এক দিনও কিন্তু ভাবি নাই ;
প্রবাসে হইয়ে আত্মহারা
ভুলিলাম নিজের সম্বল,
আজও তাই কত ব্যথা পাই।

আপনার কাজ ভুলে গিয়ে
অসার ভাবনা ভেবে ভেবে
তোমরাও কেঁদোনা গো আর ;
মোর মত বড় ব্যথা পাবে,
কাতর হইবে বড় প্রাণে,
এই বেলা কর প্রতীকার।

তোমাদের স্নেহের পুতলী
তোমাদের স্নেহ-হারা হয়ে
এসেছি বলে কি পাও ব্যথা ?—
হেথা কি গো স্নেহের অভাব—
অবারিত অনন্ত স্নেহের
কোলে আমি শুয়ে আছি হেথা।

মায়ার শিকল কেটে দিয়ে,
অসার বাসনা ছুড়ে ফেলে,
এসেছি গো আপনার দেশ;
তোমাদের অনিত্য ভাবনা
এখানে আমার কিছু নাই,
নাই কিছু সাংসারিক ক্লেশ।

খুলে ফেল মায়ার শৃঙ্খল,
ছেড়ে দাও অসার ভাবনা,
তোমরাও মোরে ভুলে যাও;
জগতের গতি এইরূপ
চিরদিন এইরূপ হবে,
তবে কেন কেঁদে কষ্ট পাও!

সীতারাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রচূড় ভাবিতে লাগিলেন, "ইহার বিহিত কি কর্ত্তব্য? এখন গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করিব কি প্রকারে? সে যদি না মানে? নগর শিপাহী সবইত তার হাতে। সে আমাকে উলটিয়া কারাবদ্ধ করিতে পারে। মৃণ্ময়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিব না—কিন্তু যদি গঙ্গারাম অবিশ্বাসী, তবে মৃণ্ময়কেই বা বিশ্বাস কি? তবে সাবধানের মার নাই—সতর্ক থাকাই ভাল। বিপদ ঘটে, তখন নারায়ণ সহায় হইবেন। এখন প্রথমতঃ গঙ্গারামের মন বুঝিয়া দেখিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রচূড় তখন আর কাহারও সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পরে সন্ধ্যার পর তাঁহার গুপ্তচর আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিল, যে ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল, যে মৃণ্ময় সৈন্য লইয়া, সেই রাত্রে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবন সেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, গঙ্গারামও দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া মৃণ্ময়ের সাহায্যার্থ যাওয়া ভাল।"

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল—দেখিতেছে মৃণ্ময় কি বলে।

মৃণ্ময়ের একটু রাগ হইয়াছে—আমি কি একা লড়াই পারি না যে আমার সঙ্গে আবার গঙ্গারাম? অতএব মৃণ্ময় রুষ্টভাবে বলিল,

"তা চলুন না—বেশ ত!"

গঙ্গারাম তখন বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?"

চন্দ্র। মৃণ্ময় না হয় সেজন্য একজন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।

গঙ্গা। নগর রক্ষার জন্য রাজার কাছে জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। অতএব আমি নগর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

চন্দ্র। আমি নগর রক্ষা করিব।

গঙ্গা। করিবেন। কিন্তু আমার উপর যে কাজের ভার আছে তাহা আমি করিব।

তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে বড় সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,

"যাহা তোমরা ভাল বুঝ—তাই করিও।"

এদিকে রণসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। মৃণ্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র শিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমন বার্ত্তা যেমন পৌঁছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌঁছিল। মুরলা বলিল,

"মহারাণী—এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানে মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য, নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরী মধ্যে কেহই সে রাত্রে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত—সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও একথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সে

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না—যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত সে জানে যে জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ—জগৎপিতা তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সম্বাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল,

"বলেন ত এখন গিয়া ছেলে লইয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না। আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল—ভয়ে মুখ কালো হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে, রাজপথে, প্রভাত শুক্রতারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবী মূর্ত্তি! মুরলা, তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

একজন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল,

"আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এতরাত্রে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুইজনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি কোন কৌশলে গঙ্গারামকে আবদ্ধ না করিয়া এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন, নিশ্চয় বুঝিয়া, অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন, যে জনকত শিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন। কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে শিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃণ্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, শিপাহীরা মৃণ্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃণ্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল শ্রী। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল,

"মা! তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথায় উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছুই নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। নগর রক্ষকের সম্বাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতার কথা কি শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবী বেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি ভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুরলা চলিয়া গেলে, গঙ্গারাম চারিদিগে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহার জন্য তিনি এই বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিনী নয়। তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্র মধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না ডুবিয়া মরাই সার হইবে। আঁধার! চারিদিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাতনক্ষত্রোজ্জলরূপিনী ত্রিশূলধারিনী ভৈরবী মূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, শ্রী। গঙ্গারামের কাছে আসিয়াছে, জয়ন্তী একা। কি জানি যদি গঙ্গারাম চিনিতে পারে, এজন্য শ্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই।

ভৈরবীর কথা শুনিয়া, গঙ্গারাম বলিল,

"মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ি গোলা বারুদ দাও। আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কে এ? জিজ্ঞাসা করিল,

"মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কার্য্য।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহাঁর প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে

গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল—

"মা! তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সম্বাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া, তোমার ভূষণাগমন সম্বাদ, ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সম্বাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।"

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে একজন্ গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট সেইখানে উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে, একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ি ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি কে?"

সে বলিল, "যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল কি না জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল,

"তাতেই বা কি?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

পুরুষ। কোথা পাইব? তোমাকে ত কোন দেবীর মত বোধ হইতেছে। হাতে ত্রিশূল—তুমি কি ভৈরবী? বলিলে কি বলিতে পার, কোথায় তা পাইব? এই পুরী মধ্যে কি পাইব?

জয়ন্তী। হাঁ। তাই পাইবেন?

পু। কবে পাইব?

জয়ন্তী। তাহার কিছু বিলম্ব আছে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড়ঠাকুরের সে রাত্রে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চচূড়ে উঠিয়া চারিদিগ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্রিত হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফরসা হয় নাই, বোঝা গেল না, যে তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকা শিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওপারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি?"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন,

"গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে?

গঙ্গা। কেন, আমি আছি কি করিতে?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে? আর তুমিও দুর্গরক্ষায় কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল বলিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ওপারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন শিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া গিয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্তদ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার ত আর কিছু বিকাশ প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন,

"তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল শিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে প্রায় পঞ্চাশ খানা নৌকায়, পাঁচ ছয় শত মুসলমান শিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া, দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম শিপাহী লইয়া বাহির হয়। শিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়!

হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কেন ফকিরের কথায় সতর্ক হইলাম না। এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মী বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন।” চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায় সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন এমত সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না; তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধোঁওয়া দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী শিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

“তবে কি এ আমাদের তোপ!”

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি শিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গ প্রাকারে, যে সকল তোপ সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ দাগিল—কে?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারিদিগে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট; সেই খান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া; ধূমরাশি, আকাশমার্গে উঠিয়া, পবন পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে ঘাটের উপরে, গাছের তলায়, একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? গঙ্গারামের একটি শিপাহীও বাহির হয় নাই—এখনও ফটক বন্ধ। মৃণ্ময়ের শিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় যে কোন শিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া যাইবেন, ইহা অসম্ভব, কেন না দুর্গ রক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া

কামান ছাড়িল—ইহাও অসম্ভব, কেন না বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান—বাজে লোকের হইতে পারে না—শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিল—আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগণ বিচরণ করিতে লাগিল—আবার মুসলমান শিপাহী পরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণ জী। জয় কালী! জয় যুবরাজ্ঞী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন, যে যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—অর্থাৎ যেসকল নৌকার শিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল—শব্দে কান পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে, আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহা-বৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।"

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশদিক কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল—আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন একদিকে—এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায়, তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি, গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রহস্ত পরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ, এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধধূম সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন—যে এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্র দৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল—দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধুয়া উড়াইয়া লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় সেই জলমগ্ন রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদী স্রোতঃ ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুম সমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই—সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহত আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজল নয়নে বলিলেন "জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্ততারণ ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুর-রাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে, তোমার দাসানুদাস, সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কামানের বন্দুকের হুড়মুড় হুড়মুড় শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল—এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম একজন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই, প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল,

"মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল "তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদ্দার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিল; "তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?"

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, "তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস না?"

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল।

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন?

জমা। তোপ দেখিয়াছি—ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্? গাছের ডালে তোপ করে?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুড়িয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল নোঙাইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ করিতে পারিবে না কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে?

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক

কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃন্ময় বাছা বাছা জন কত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গ রক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারিজনকে আদেশ করিল,

"যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারিজন শিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া যাইতেছে। তাহারা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে, একজন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর একজন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে শালচালা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল,

"তোম কোন্ হো রে!"

সে বলিল, "কেন বাপু!"

"তোম কিয়া ওয়াস্তে হিয়া বৈঠ বৈঠকে তোপ ছোড়তে হো?"

"কেন বাপু তাতে কি দোষ হয়েছে? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হমলোক আভি হাঁকায় দেতে—তোম কাহেকো দিক্ কিয়ে হো। চল হুজুরমে যানে হোগা?"

"কার কাছে যাব?"

"কোতোয়াল সাহেব কি হুকুম. তোমাকো উন্‌কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে একজনকে ওপারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস কি না?"

শিপাহীরা, দেখিয়া বলিল "হাঁ, হমলোকত ইস্কো পাচানতে হেঁ। যে ত হমারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈ—যে কাঁহা সে আয়া?"

"তবে ওকে আগে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

শিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "যে আদমি ত আচ্ছা

বোল্‌তা হৈ। যো তোপ্‌কা পাশ রহেগা, ওসিকো লে যানেকা হুকুম্‌ হৈ॥ এই মুরদার তোপকা পাশ হৈ—ওসকো আলবৎ লে যানে হোগা।”

কিন্তু মড়া—হিন্দু শিপাহীরা তাঁহাকে ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া একজন শিপাহী ডোম ডাকিতে গেল—আর তিনজন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিগে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন, যে মুসলমান শিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি শিপাহীদিগকে বলিলেন,

“চল বাবা তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।”

শিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্য মণ্ডলী মধ্যে যেখানে ভীত নাগরিকগণ পীপিলিকা-শ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেই খানে শিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনি আকাশ পূরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিক মণ্ডলী, একেবারে সহস্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিল,

“জয় মহারাজ কি জয়।”

“জয় মহারাজাধিরাজ কি জয়।”

“জয় শ্রীসীতারাম রায় বাজা বাহাদুর কি জয়।”

“জয় লক্ষ্মী নারায়ণ জী কি জয়।”

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষ ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন,

“সমর দেখিয়াই আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্য লোকে, তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দেও।”

সীতারাম সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতরামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

সংসার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেয়ে মহলের মতামত।

শরৎ বাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি দেবী বাবুর বাড়ীর একটী ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক থাল ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। ঝি থাল নামাইয়া বলিল "মাঠাকরুণ তোমাদের জন্য এই ঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গো! অনেক বাড়ীতে যেতে হয়েছিল তাই আসতে একটু রাত হোল।"

বিন্দু। "থাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ, কাল আমাদের ঝিকে দিয়া থালা পাঠাইয়া দিব।"

ঝি রকের উপর থাল রাখিল। গার কাপড় খানা একটু টানিয়া গায়ে দিয়া একটু মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, গালে একটী আঙ্গুল দিয়া একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল।

বিন্দু। "কি লো কি হয়েছে? তোদের বাড়ীতে পূজার কোন তামাসা টামাসা হয়েছে নাকি, তাই বলতে এসেছিস?"

ঝি। হেঁ তামাসাই বটে, ভদ্দর নোকের ঘরে হলেই তামাসা, আমাদের ঘরে হলেই নোকে পাঁচ কথা কয়?"

বিন্দু। "কি লো, কি তামাসা, কোথায় হয়েছে?"

ঝি। "না বাপু, আমরা গরিবগুরবো নোক, আমাদের সে কথায় কায কি বাপু। তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ কথা কয়।"

বিন্দু। "কি দেখলি রে, ভেঙ্গেই বল্ না।"

ঝি আর একবার কাপড়টা সেরে করে নিয়া আর একটু মুচকে হাসিয়া বলিল—"বলি ঐ ছোঁড়াটা এত রাত্তিরে বেরিয়ে গেল, ও কে গা?"

বিন্দু একটু ভীত হইলেন। সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরতের কথাগুলি শুনিয়াছে? একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

"তুই কি চখের মাথা খেয়েছিস? শরৎ বাবু এসেছিলেন চিন্‌তে পারিস নি? তুই কি আজ নেক্‌রা কর্‌তে এসেছিস?"

ঝি। "না চক্ষের মাথা খাই নি গো, শরৎ বাবু তা চিনেছি। তা ভদ্দর নোকের ছেলে কি ভদ্দর নোকের মেয়ের সঙ্গে অমনি করে হাত কাড়াকাড়ি করে? জানি নি বাবু তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম, আমি এই উনত্রিশ বছর কলকেতায় চাকরি কর্‌ছি, কৈ এমন ধারাটী দেখি নি। তা ভদ্দর নোকের কথায় আমাদের কায কি বাবু? আমরা দুবেলা দুপেট খেতে পাই তাই ভাল, আমাদের ও সব কথায় কায কি?"

দেবীবাবুর বাড়ীর ঝি গুলা বড় বেযাড়া তাহা বিন্দু পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য এই ঝির এই বিদ্রূপপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী ও কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধে আরও অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহা সম্বরণ করিয়া কহিলেন,

"ও কি জানিস ঝি, শরৎ বাবুর মা ত বে দেয় না তাই বাসায় একলা থেকে বই পড়ে পড়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কয়, তার ঠিক নেই।"

ঝি। "হেঁ গা তা শরৎ বাবু পাগলই হউক আর ছাগলই হউক পরের বাড়ী এসে উৎপাৎ করে কেন? বে-পাগলা হয়ে থাকে একটা বে করুক গে, তোমাকে এসে টানাটানি করে কেন তোমাকে বে করতে চায় নাকি?"

বিন্দু। "দুর মাগী পোড়ারমুখী! তোর মুখে কি কথা আটকায় না লা? যা মুখে আসে তাই বলিস? শরৎ বাবু একটী মেয়েকে দেখেছেন তার সঙ্গে বে করতে চায়। তা শরৎ বাবু সে কথা বাড়ীর কাউকে বলতে পারে না, লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বলতে এসেছিল।"

ঝি। সে কে গা? কোন্ মেয়েটী?

বিন্দু। "তা জান্‌বি এখন, সম্বন্ধ যদি ঠিক হয় তোরা সব্বাই জান্‌বি।"

ঝি। "হেঁ গা, আর লুকালে চলবে কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা? আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হই নি, চোক্ষের মাথাও খাই নি, কানের মাথাও খাই নি। ঐ যে সুধা সুধা করে চেঁচিয়ে শরৎ বাবু কাঁদ-ছিলেন, যেন সুধার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা তোমরা বলবে কেন? এ কথা কি ভদ্দর নোকে বলে, না কেউ কখনও শুনেছে। বিধবার আবার বিয়ে? ও মা ছি! ছি! ছি! ভদ্দর নোককে দণ্ডবৎ, আমাদের ঘরে এমন কথাটী হোলে তাকে একঘরে করে। ও মা ছি! ছি! ছি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে; এ ভদ্দরের ঘর? মুচি মুচুনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনে নি। ও মা ছি! ছি! ছি! ও মা অবাক্ কল্লে মা, ও মা কোথা যাব মা"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্দু। এবার যথার্থই ভীত হইলেন। বড় মানুষের ঘরের গর্ব্বিণী মন্দভাষিণী ঝি যতক্ষণ তাঁহার উপর ব্যঙ্গ করিতেছিল ততক্ষণ বিন্দু সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে এ কলঙ্ক রটাইবে ভাবিয়া বিন্দু হতজ্ঞান হইলেন। শরতের পাগলামি প্রস্তাবে তিনি কখনই সম্মত হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না, কলঙ্ক চারি দিকে বিস্তৃত হয়, অপনীত হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিলেন। অন্য দিন দেবী বাবুর বাটী হইতে খাবার আসিলে ঝিদের দুই আনা পয়সা দিতেন, অদ্য সেই টাকাটী ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,

"ঝি, তুই দেবী বাবুর বাড়ীতে অনেক দিন আছিস, পূজার সময় তোকে আর কি দিব, এই একটী টাকা নিয়ে যা, একখানা নূতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ যে পাগলের মত কতগুলা বলে চেঁচাইয়াছে সে কথা আর কাউকে বলিস নি। আজ দশমীর দিন, বোধ হয় কোথাও সিদ্ধি খেয়ে এসে ছিল, তাই পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা কি ধরিতে আছে, ভদ্র

ঘরে এমনও কি হয়, আমাদের একটু মান সম্ভ্রমও আছে, শরৎ বাবুর ও মা আছেন, বোন আছেন, এমন কাযও কি হয়ে থাকে? তা পাগলের কথা যা শুনেছিস্ শুনেছিস্, কাউকে বলিস নি বাছা, এ পাগলামি কথা যেন কেউ টের পায় না।”

চক্‌চকে টাকাটী দেখিয়া ঝির মত একটু ফিরিল, (অনেকেরই ফেরে) সে বলিল,

“তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধর্‌তে আছে না বল্‌তে আছে? শরৎ বাবু একটু সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের বাড়ীর ছেলেরা যে বোথল বোথল কি আনাচ্চে, আর খাচ্চে। আর কি বা আচরণ, রাত্রিতে কি বাড়ী থাকে না, বাপ মাকে একটু ভয় করে না, লজ্জা করে না। এখনকার সব অমনি হয়েছে গো, তা এখনকার ছেলেদের কথা কি ধর্‌তে আছে? শরৎ বাবু যা বলেছে বলেছে, তা সে কথা কি আমি মুখে আনতে পারি, না কাউকে বলতে পারি? কাউকে বল্‌ব না মা, তুমি কিছু ভেবো না।”

ঝি তুষ্ট হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারের সংবাদ যেমন জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই রাত্রিতেই সেইরূপ ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

দেবী বাবুর মহিষী পরদিন পা ছড়াইয়া তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ক কথা শুনিয়া একেবারে ভেক দর্শনে সর্পের ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন।

“হেঁ গা, তা হবে না কেন গা, তা হবে না কেন? এখন ত আর ভদ্দর ইতরে বাচ বিচার নেই, যত ছোট লোক পাড়া গাঁ থেকে এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়, অমনি কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কায়েতের সঙ্গে ক্রিয়া কর্ম্ম করেছে, না কায়েতের মান রাখতে জানে? ওদের সঙ্গে আবার খাওয়া দাওয়া,—মিন্সের ঘটে ত বুদ্ধি নেই তাই ওদের সঙ্গে চলা ফেরা করে। দেব এখন আজ মিন্সেকে দু কথা শুনিয়ে, আপনার মান মর্য্যাদা জানে না, ভারি হোসে কর্ম্ম হয়েছে, তা যার তার সঙ্গে চলা

ফেরা করে। ওগো আমি তখনই বুঝেছি গো তখনই বুঝেছি, যখন ভবানী-পুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা কত্তে বার হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই বুঝেছি কেমন কায়েত। আর সেই অবধি আর আসা হয় নি, জাঁক কত, ঐ বিধবা ছুড়ীটাকে আবার পাড়ওলা কাপড় পরাণ হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি আচরণ, হাড়ী মুচিদের ঘরে আর কি হবে? ঐ যে মুচনমানদের 'বিধবার নিকে হয় না? এ তাই লো তাই।"

শ্যামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল মার্জ্জন করিতে করিতে) "তা না ত কি বন্ ওরা আবার কায়েত! কায়েত হলে বিধবাটাকে অমনি করে রাখে। ও মা ঐ ছুড়ীটা আবার একাদশীর দিন জল টল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হলে ভাত খাওয়া হয় না, ছি! ছি! ছি! এই আজ একাদশী, কেউ বলুক দিকি যে সকাল থেকে একটু জল গ্রহণ করেছি।"

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে,) "আবার স্থদ্ধু তাই, আবার গাড়ী করে ঐ ছুড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, শরৎ বাবু আবার ওটাকে নাকি রোজ রোজ দেখ্‌তে আসে! ছি! ছি! লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।"

গৃহিণী। "অমন মেয়েকেও ধিক্! মেয়ের মাকেও ধিক্! অমন মেয়ে কি গর্ভে ধারণ করে, অমন মেয়ে জন্মালে মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেল্‌তে হয়। বিধবা হয়েছে তবু নজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের সঙ্গে ছাতে বেড়ান হয়, শরতের জন্য মিস্রিরপানা করে পাঠান হয়, তা শরৎ বাবুর কি দোষ বল, পুরুষের মন বৈ ত নয়, তাতে আবার বে থা হয় নি, ছুটো বোনে অমন করে ছেলেমানুষকে ভোলালে সে আর ভুল্‌বে না? অমন মেয়ের মুখ দেখতে আছে? ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার।"

এইরূপে গৃহিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল, বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দ্দশ পুরুষ অবধি যাবতীয় পুরুষ স্ত্রীর বিশেষ স্তুতিবাদ করা হইল, রোষে গৃহিণীর বুকের ব্যাথাটা বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস থেকে

আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া যেরূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, পাপিষ্ঠ মনুষ্য ভাগ্যে সেরূপ কদাচ ঘটে।

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া ঝি বৌগুলা পাতকো তলায় জড় সড় হইয়া কানা কানি করিতে লাগিল।

প্রথমা। "কি লো কি হয়েছে, অত চেঁচাচেঁচি কেন?

দ্বিতীয়া। "ওলো তা শুনিস নি, তবে শুনিছিস কি?"

প্রথমা। "ওলো কি লো কি?"

দ্বিতীয়া। "ওলো ঐ যে হেম বাবু বলে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর শালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তা সেই শালী নাকি বিধবা, তার আবার শরৎ বাবুর সঙ্গে বে হবে।"

তৃতীয়া। "দূর পোড়া কপালী! তাও কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?"

দ্বিতীয়া। "তা হবে না কেন, ঐ যে বিদ্যাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ যার সীতার বনবাস তুই সেদিন পড়্‌ছিলি, ঐ সেই নাকি বলেছে বিধবার বিয়ে হয়। সে নাকি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে।"

চতুর্থী। "সে ত বড় রসের সাগর লো, বিধবার আবার বিয়ে দেয়! তা বিধবা যদি বুড়ী হয় তবুও বিয়ে হয়?"

দ্বিতীয়া। "তা হবে না কেন, ইচ্ছে করলেই হয়।"

চতুর্থী। "তবে শামীর মা আর বামীর মা, কি দোষ করেছেন, চুরি করে করে দুদ টুকু খান, মাচ টুকু খান;—তা বিদ্যাসাগরকে বলে বিয়ে করলেই হয়, আর কিছু লুকোতে চুরোতে হয় না।"

প্রথমা। "চুপ কর লো চুপ কর, এখনই শুন্‌তে পেলে বোকে কাটিয়ে দেবে। তা শরৎ বাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন করেন কেন?"

দ্বিতীয়া। "আর ভাল ছেলে, বলে যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম! ভাল ছেলে হলে কি হয়, ফুট্‌ফুটে মেয়েটী দেখেছে মন ভুলে গেছে।"

তৃতীয়া। "হে দিদি সে হেমবাবুর শালীর বয়স কত গা।"

দ্বিতীয়া। "বয়সও ১৩। ১৪ বৎসর হয়েছে, দেখতেও সুন্দর, হেসে

হেসে শরৎ বাবুর সঙ্গে কথা কয়, মিস্রির পানা খাওয়ায়, তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ায়, তাতে আর শরৎ বাবু ভুলবে না, হাজার হোক পুরুষের মন তো।”

চতুর্থী। “তবে শরৎ বাবুর সঙ্গে সে মেয়েটীর অনেক দিনের আলাপ?”

দ্বিতীয়া। “তবে আর শুনছিস কি, এ রসের কথা বুঝলি কি? আলাপ সেই পাড়া গাঁ থেকে। কি জানি বাবু সে খানে কি হয়েছে, না জেনে শুনে পরের নিন্দে করা ভাল নয়, কিন্তু কলকেতায় এসে যে চলানটা চলিয়েছে তা আর ভবানীপুরে কে না জানে। শুলো শরৎ বাবু সেই মেয়েটীকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কতদিন রাখে, তার বন আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন। হেমবাবু নাকি গতিক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করলে, তা সেখানে অমনি রাধিকা বিরহ বেদনায় অচেতন হয়ে পড়লেন—নতা করলেন, যে ভারি জ্বর হয়েছে, আবার আমাদের কৃষ্ণঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত! শুনো এ ঢের কথা লো, বলি বিদ্যাসুন্দর পড়িছিস, এ তাই লো তাই। এখনকার ছেলেরা সব সুড়ঙ্গ কাটতে শিখেছে, দেখিস্ লো সাবধান।”

চতুর্থী। “দুর পোড়ারমুখী।”

দাসী মহলেও বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বুড়ি ঝির কাছে শুনে নবীনা ঝিরা সকাল থেকে বারাণ্ডায়, উঠানে, রান্নাঘরে কানাকানি করিতেছে আর ফিস্ ফিস্ করিতেছে। একজন তন্বঙ্গী নবীনা বলিল,

“হেলা এ কি সত্তি লা, সত্তি কি বিধবার বিয়ে হবে নাকি?”

স্থূলাঙ্গী নবীনা উত্তর করিল “তবে শুনিচিস্ কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াইতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কি না, জিজ্ঞেস করচিস?”

তন্বঙ্গী। “তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে? ভদ্দর ঘরে হলে তো ছোট লোকের ঘরেও হবে?”

স্থু। “কেন লো তোর আবার সক গেছে নাকি? ঐ, ঐ কৈবর্ত্ত ছোড়াটাকে বে করবি নাকি, ঐ তোদের কে হয় না? ঐ যে ফিস্ ফিস্ করে তোর সঙ্গে সদাই কথা কয়।”

ত। “দূর পোড়ারমুখী! অমন কথা আমাকে বলিস নি তোর আপনার

মনের কথা বলছিস বুঝি? ঐ যে তোদের জেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিন বৌ মরে গেছে, তার এখন ভাত বেঁদে দেয় এমন নোকটি নেই। তা ধনে মশলা কেনবার নতা করে যে ঘন ঘন তার দোকানে যাওয়া হয়, বলি তার ঘর করতে ইচ্ছে টিচ্ছে হয় নাকি?"

স্থ। "তোর মুখে আগুণ।"

এইরূপে দুই জন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে এমন সময় এক জন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল "কি লো তোরা গালাগালি করচিস কেন লো?"

স্থ। "না গো কিছু নয়, এই শরৎ বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে তাই বলছিনু। ভদ্দর যাই করে তাই সাজে গা, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক!"

বৃদ্ধা। "তা এটা কি ভদ্দরের কায, এত মুচুনমামের কায।"

স্থ। "তবে হেমবাবু এমন কায করেন কেন।"

বৃদ্ধা। "করেন তার কারণ আছে তোরা কি জানবি বল, তোরা কাণে তুলো দিয়ে থাকিস এ কথার কি জানবি বল।"

উভয় নবীনা। "কি, কি, বল্ না দিদি, এর কথাটা কি?"

বৃদ্ধা। বলি শুনিস নি বুঝি, হেম বাবু যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারে না, সে কথা শুনিস নি বুঝি?"

উভয়ে। "না, না, কি, কি?"

বৃদ্ধা। "এই শুনবি আয় কাণে কাণে বলি।" উভয় নবীনা কায কর্ম্ম ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। বৃদ্ধা তাদের কাণে কাণে বলিল,—সে শব্দটী তেতালা পর্য্যন্ত ও বার বাড়ী পর্য্যন্ত শুনা গেল,—"বলি শুনিস নি, হেম বাবুর শ্যালী যে পোয়াতী!"

সত্যের আবিষ্কার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল!

ভবানীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত খবর গেল। কালীতারার তিন খুড় শাশুড়ী সে দিন একাদশী করিয়া রুক্ষস্বভাব হইয়া আছেন, তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলেবেগুণে জ্বলে গেলেন। বড়টী একটু ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন,

"এখনকার কালে আর ধর্ম্ম নেই, বাচ বিচার নেই, যার যা ইচ্ছা সে তাই করে। করুক গে বাবু, যে পাপ করবে সেই নরক ভুগবে, আমাদের সে কথায় কায কি?"

ছোটটী বলিলেন "কি হয়েছে কি হয়েছে আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা বে করবে? ও মা কি ঘেন্নার কথা গা, ছি! ছি! ছি! নোকেরা কি এখন মান সম্ভ্রম নেই, একটু নজ্জা নেই যা ইচ্ছে তাই করে? এ যে হাড়ী ডোমেও এমন কায করে না, এ যে আমাদের কুলে কালী পড়লো, এ যে ছোট লোকের মেয়ে বিয়ে করে আপনার কুলটা মজালেন। ও ম ছি! ছি! ছি!"

মেজটী একেবারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও পোড়ারমুখী, ও হারামজাদী, বলি হেঁলা, এই তোদের মনে ছিল না? ওলো গলায় দড়ী দিবার জন্য কি একটা পয়সা মেলেনি লা? বলি কলসী গলায় বেঁধে আদি গঙ্গায় ডুবে মরিস নি কেন? মর, মর, মর। আমাদের কুলে এই লাঞ্ছনা! ওলো বাগ্দীর মেয়ে! বলি শ্বশুর কুল টা একেবারে ডোবালি রে? তাঁ রোস না, বে হোক না, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। মোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোঁতা করে দিব না, তোর পিটে মুড়ো খেংরা ভাঙ্গবো না? মাথায় ঘোল ঢেলে তোকো ঝেঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।"

কালীতারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল,—সন্ধ্যার সময় বিন্দুকে চিঠি লিখিলেন।

"বিন্দুদিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনিনি, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে?

"বিন্দুদিদি ঐ কাযটী করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে তাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কায হলে আমি শ্বশুর বাড়ী মুখ দেখাতে পারব না, শাশুড়ীরা আমাকে আস্ত রাখবে না,—তোমার কালীতারাকে আর দেখিতে পাবে না।"

কলিকাতায় এ সংবাদ রটিল। বিন্দুর জেঠাই মা লোক দিয়া বলিয়া

পাঠাইলেন "বিন্দু তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মানুষ করেছি। বুড়ি জেঠাই মাকে এই বয়সে খুন করিস নি, মল্লিক বংশ একেবারে কলঙ্কে ডুবাসনি। বাছা বিন্দু তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপ মার কূল নরকে ডুবাসনি। বাপ মা থাকিলে কি এমন কাযটা করতিস বাছা ?

বিন্দুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, ঝিকে যে একটী টাকা দিয়াছিলেন তাহাতে কোনও ফল হয় নাই; কলঙ্ক জগৎ সুদ্ধ রটিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষ মহলের মতামত।

হেমচন্দ্র বিন্দুর নিকট সমস্ত কথা অবগত হইয়া অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইলেন। শরতের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার কিছু মাত্র লাঘব হইল না, শরতের প্রস্তাবটী তিনি পাপ প্রস্তাব মনে করিলেন না; তথাপি তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সকল বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশীয় দিগকে মনে ক্লেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া যাহা হউক নিষ্পত্তি করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব রহিল না। পরামর্শ-দাতাগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন, 'হিতৈষী বন্ধুগণ" হিত কথা বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-সংস্কারক-গণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে বুঝাইতে আসিলেন; সমাজ সংরক্ষকগণ

সংরক্ষা কার্য্য বুঝাইতে আসিলেন।' ভবানীপুরে তাঁহার এত বন্ধু ছিল হেমচন্দ্র পূর্ব্বে তাহা অনুভব করেন নাই।

প্রথমে জনার্দ্দন বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, হরিহর বাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতি গণ আসিয়া হেম বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ এ দিক্ ও দিক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেম বাবু অতি ভদ্র কায়স্থ সন্তান, তাঁহার শিষ্টাচারে সকলেই তুষ্ট আছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই হেম বাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন, ও হিত কামনা করেন, হেম বাবুর চাকুরির কি হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া ভাল করিয়া চেষ্টা করেন না কেন, তাঁহারা হেম বাবুকে কোন কোন সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক স্নেহগর্ভ কথায় আপনাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ (যাহার পরিচয় হেমবাবু ইতি পূর্ব্বে পান নাই) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শরৎ বাবুর কথা উঠিল, হেম বাবুর ঘরের কথাটী উঠিল। জনার্দ্দন বাবু বলিলেন

"এখনকার কলেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ, তাহারা রীতি নীতি বুঝে না, পৈত্রিক আচার অনুসারে চলে'না, সুতরাং দোষ ঘটে। তা তুমি বাবু বুদ্ধিমান্ ছেলে, তুমি কি আর নির্ব্বোধের মত কায করিবে, তা আমরা স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়াই বাহুল্য।"

গোবর্দ্ধন বাবু। "তবে কি জান বাবা আমরা কয়েকজন বুড়া আছি, যত দিন না মরি, তোমাদেরই হিত কামনা করি, দুটা কথা না বলিলেও নয়। শরৎটা লক্ষীছাড়া ছেলে, আমাদের কথা টথা শুনে না, যা ইচ্ছে তাই করে, তা ওটাকে আর বড় বাড়িতে আসিতে দিও না। তা হইলেই এ কথাটা আর কেউ বড় শুনিতে পাইবে না, কে আর কার কথা মনে করে রাখে বল?"

হরিহর বাবু। "হাঁ তা বৈ কি? ঐ যে মিত্রজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক উঠিল, তোমারা সে কথা অবশ্যই জান, (এই বলিয়া কলঙ্কটী আর একবার প্রকাশ করা হইল,) তা মিত্রজা বুদ্ধিমান্ লোক, চাপিয়া গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল?"

জনার্দ্দনবাবু। "হাঁ তা বৈকি? কে বা কার কথা মনে রাখে, আজ কাল সকলেই আপনার আপনার কায নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক রীতি

ছিল, গ্রামের বুড়াদের কথাটী না লইয়া পাড়ার কোন কাজ হইত না।
কেমন, বল না গোবর্দ্ধন বাবু, ঐ সেকালে আমাদের মতামত না নিয়ে কি
কেউ কোনও কায কত্তে পারত?"

গোবর্দ্ধন বাবু। "সাধ্য কি? আর এখনই যাঁরা একটু শিষ্ট শান্ত তাঁরা
কোন্ আমাদের না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করেন। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের
বিধবা ভাদ্রবধুকে লইয়া সে বছর এইরূপ একটা কলঙ্ক হইল, (সে কলঙ্কটী
সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল,) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে
আসিয়া বলিলেন "হরিহর বাবু করি কি? যাই যে?' তা আমি বলিলাম,
যখন আমার কাছে এসেছ তখন্ কিছু ভয় নেই আমি এর একটা কিনারা করে
দিবই।" কি বল জনার্দ্দন বাবু, আমরা অনেক দেখেছি শুনেছি বিপদ আপ-
দের সময় আমাদের জানাইলে কোন্ না একটা উপায় করিয়া দিতে পারি?"

জনার্দ্দন বাবু। "তা বৈ কি।"

হরিহর বাবু। "তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম তোমার
ভাদ্রবৌকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও তিনি সেই অনুসারে কার্য্য
করিলেন, এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে? তা বাবা, এখনকার
কি ছেলেরা কি মেয়েরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, যাহার যা ইচ্ছা করে,
তাতে তোমার দোষ কি বল? তা একটী কায কর, তোমার শ্যালীটীকেও
৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করিবে, কে দেখ্তে যাইতেছে
বল? তোমার কোন অপযশ হইবে না।"

হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"মহাশয় আপনাদিগের কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরৎ যে
সমাজরীতি বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মত নাই; সে
বিষয় পরে বিচার্য্য। কিন্তু আপনারা যদি শরৎ বাবুর অথবা আমার শ্যালীর
চরিত্রে কোনও দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে
একেবারে ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মল চরিত্রে দোষ স্পর্শে না,
তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্দ্দোষচরিত্র লোক আমি জানি না।"

জনার্দ্দন বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু ও হরিহর বাবু একস্বরে "না, না, না,
আমরা দোষের কথা বলি নাই, এমন কথাও কি লোকে বলে!"

হরিহর বাবু। "এমন কথাও কি লোকে বলে, ঘরে কিছু হলেও কি লোকে বলে? তা নয় তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলিয়াছিলেন তা নয়, অন্য একটু কারণ দেখাইয়া পাপ দূর করিলেন। তা আমরাও তাই বলিতেছি তোমার শ্যালীর চরিত্রে কোন দোষ থাকিলেও কি সে কথা মুখে আনিতে আছে? রামঃ, আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনিতে পারি, তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকিয়ে ফেলিলেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অবলম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম্ম।"

জনার্দ্দন বাবু। "তা বৈকি, তা বৈকি, "যতোধর্ম্ম-স্ততোজয়" শাস্ত্রেই একথা আছে। হরিহর বাবু যে কথাটা বলিলেন তাহাই সৎপথ তার কি আর সন্দেহ আছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে বাবা, এবারটা যেন চেপে গেলে, কিন্তু তুমি ছেলে মানুষ, ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা কি রাখতে আছে? কখন কি হয় তার কি ঠিক আছে?"

গোবর্দ্ধন বাবু। "তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও নারীর গুপ্ত আচরণ দেখিতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুপ্ত কথা জানিতে পারেন না। তুমি ত বাবা ছেলে মানুষ।"

হরিহর বাবু—"তা বৈ কি? এবার যেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে,—দৈবের কথা বলা যায় না, যদি যথাকালে তরুণ বয়স্কা বিধবা একটী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো আছে, লোকেত একেই কলঙ্কপ্রিয়, তখন কি আর রক্ষা আছে,—এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা ৺কাশীধামে পাঠানই শ্রেয়।"

ইত্যাদি নানা সারগর্ভ পরামর্শ দিয়া বৃদ্ধগণ বিদায় হইলেন। হেমচন্দ্র রোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না,—তাঁহার জ্বলন্ত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, শ্যামলাল, যদুলাল প্রভৃতি নব্যের দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শামৃত দান করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত, কেহ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেনল্ডস্ প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন; কেহ সচ্চরিত্র কেহ বা

"সভ্যতা"-সম্মত আমোদ গুলি পরক করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন; কিন্তু পরামর্শ দানে সকলেই সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের "হিতৈষী বন্ধু।"

তাঁহারা অদ্য প্রাতে একটী কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন, হেমবাবুর অযথা নিন্দা প্রতিবাদ করাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার অযথা অপবাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোনও কথা বলিতে কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন না, কেন না কাহারও গুপ্ত কথা অনুসন্ধান করা সুরুচি-সম্মত কার্য্য নহে। কিন্তু যদি হেমবাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি, নব্য ভাষায় গৌর চন্দ্রিকা অনেকক্ষণ চলিল।

হেম বাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, যেরূপ অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে—তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হওয়াই ভাল, এই অনাহূত বন্ধুদিগের আগমনে ও প্রশ্নে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাহা ঘটনা তাহা জানাইলেন।

রামলাল। "তা যাহা হউক অদ্য যে ঘোর অপবাদ শুনিলাম তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দেখুন সকলে সহজে এ অপবাদটী অবিশ্বাস করিবে না, আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরৎ কলেজেই কিছু অবাধ্য ও গর্ব্বী এবং স্বীয় মত গুলি লইয়া বড় স্পর্দ্ধা করে, এবং নারীর চরিত্র দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব, অপরাধ সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ, এবং মনুষ্য-চরিত্র পর্য্যালোচনার ফল মাত্র। তা যাহা হউক আপনি এই বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই এটী সুখের বিষয়।"

শ্যামলাল। "সে কথা যথার্থ। আরও দেখুন এ কার্য্য প্রকৃত সমাজ সংস্কার নহে। যে কার্য্যে আমাদের দিন দিন ঐক্য সাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পুরাতন লোকদিগের ন্যায় আমাদের কোনও "প্রেজুডিস" নাই, কিন্তু এ কার্য্যটী

আমাদিগের সমাজে বিপ্লব ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের ঐক্য সাধন হইবে না, অতএব এ কার্য্য গর্হিত।”

যদুলাল। “আরও দেখুন মেল্‌থস বলেন লোকসংখ্যা যত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, খাদ্য তত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় না। এই জন্যই সুসভ্য দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে। আমাদের দেশে সেটী হয় না, অতএব নিদেন বিধবা গুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্ত্তব্য।”

শ্যামলাল। “আর আপনার মত বুদ্ধিমান লোক এটীও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে স্বদেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য তাহাও বিধবাবিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা যতদূর দেশের উন্নতি হয় আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছি, দেশস্থ যাবদীয় গ্রন্থকার-দিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি, এবং প্রতি শনিবার সেই লাই-ব্রেরিতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হয়েন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনার যদি সবকাশ থাকে তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই তুষ্ট হইব।”

যদুলাল। “আরও দেখুন আমাদের সংসারে যে কবিত্ব যে মধুরত্ব টুকু আছে, আমাদিগের গৃহে গৃহে যে অমৃত টুকু লুক্কায়িত আছে, কি কাঙ্গাল কিপ্ধনী সকল গৃহে যে অনির্ব্বচনীয় মিষ্টত্ব টুকু আছে,—ইউরোপীয় জাতি-দিগের মধ্যে সে টুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অনুকরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদিগের গৃহধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, ভারতবাসীর শেষ সুখ টুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্য্য-গৌরব ও আর্য্য-ধর্ম্মের নিস্তেজ দীপটী একেবারে নির্ব্বাণ হইবে। ইউরোপীয়দিগের সদ্‌গুণ গুলি অনুকরণ করুন, আমাদিগের গৃহে সংসারের কবিত্ব, মিষ্টত্ব, ও পবিত্রতা ধ্বংস করিবেন না।”

রামলাল। “সে কথা সত্য। হেমবাবু যদুবাবুর কথা গুলি শুনিবেন, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ স্বদেশহিতৈষী লোক আজ কাল দেখা যায় না। তাঁহার কথা গুলি সারগর্ভ তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়,—যাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের মত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া ব্যক্ত

করিতে চাহি না,—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এই রূপ যুবক ও এরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক অধোগতি হইবে।"

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতাগণ ক্ষণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ সংরক্ষণের দুই একজন চাঁই দিগ্‌গজ ঠাকুরকে লইয়া হেম বাবুর বাটী আসিলেন। দিগ্‌গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের একটী আকটর্লনী মনুমেন্ট, ধর্ম্ম শাস্ত্রের একটী পেসিফিক সমুদ্র, বিদ্যায় একটী শুণ্ডধারী দিগ্‌গজ, তর্কে বন্য বরাহ অবতার। বেদ বেদান্ত শ্রুতি স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ ইতিহাস, ব্যাকরণ অভিধান সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণ রহিত বিদ্যা-পয়োধি হইতে অজস্র তর্কস্রোত বর্ষণ করিয়া হেম চন্দ্রকে একেবারে প্লাবিত করিলেন, হেমচন্দ্র একেবারে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্‌গজ ঠাকুরের গলা ভাঙ্গিয়া গেল, বাক্য ক্ষমতা শেষ হইল, (তর্ক ক্ষমতা শেষ হইবার নহে,) তখন তিনি কাশিতে কাশিতে আরক্ত নয়নে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "মহাশয় এ কার্য্য করিতে এখনও আমার মত নাই, সুতরাং আপনার এক্ষণে এরূপ পরিশ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই এটী শাস্ত্রসিদ্ধ কি না বিবেচনা করিব। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও পড়া শুনায় যতদূর উপলব্ধি হয় তাহাতে বোধ হয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রেও দুটী মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; পরাশর মনু প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল। পরে পৌরাণিককালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অন্য পণ্ডিতদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।" শুনিয়াছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রের অসম্মত নহে।"

যাঁহারা দ্বিপ্রহর রজনীতে সহসা একটী গ্রামে আগুন লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্জ্বলিত অভ্রলেহী জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাঁহারই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। সিংহ গর্জ্জন-বিনিন্দিত স্বরে তিনি কহিলেন,

সেই (কাশি,) সেই বিধবাবিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগর পণ্ডিত? সে আবার পণ্ডিত? সে বর্ণপরিচয়ের পণ্ডিত, বর্ণপরিচয় লিখে পণ্ডিত হয়েছে, (অধিক কাশি) একটা নূতন প্রথা চালিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, মনুষ্য চরিত্র অনপনেয় কলঙ্ক রাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্য্যনাম, আর্য্যগৌরব আর্য্যরীতি নীতি একেবারে সমুদ্রবক্ষে মগ্ন করিয়াছে, (ভয়ানক কাশি) উঃ (কাশি,) সে পণ্ডিত? সেই স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, ম্লেচ্ছদিগের অনুকরণকারী, বিদেশীয় রীতির পক্ষপাতী, হৃদয়শূন্য, আর্য্যঅভিমানশূন্য আর্য্যবংশের কুসন্তান,—(অনবরতঃ কাশিতে বাক্যস্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া,—)চল হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাটীতে আর থাকা নহে, এখানে পদবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। যাহা শুনিয়াছিলাম সমস্তই সত্য বটে,—সে গর্ভবতী যদি গর্ভ নষ্ট করে, তোমরা পুলিসে সংবাদ দিও।"

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না,—দিগ্‌গজ ঠাকুরের ক্রোধ ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সে দিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে তাহা পীড়ার সময় কষ্টের সময় দারিদ্রের সময় হেমচন্দ্র অনুভব করেন নাই। কলিকাতা সহরে গেল, তথা হইতে বালিগঞ্জের বাগানে ভ্রমণ করিল। মর্ম্মর বিনির্ম্মিত গানের উপর সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সুধা ও দিবার ন্যায় ঝাড়ের আলোক সেই সভাকে রঞ্জিত করিতেছে! তথায় দরিদ্রের এই কথাটী উঠিল।

ধনঞ্জয় বাবু শ্যালীর কলঙ্ক সম্বন্ধে আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন ;—কিন্তু অন্যান্য ধার্ম্মিকগণ এ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যের কথা

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্মের স্থূল স্তম্ভ স্বরূপ হরিশঙ্কর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুরা পাত্র পড়িয়া শত খণ্ড হইয়া গেল,—বলিলেন "হা ধর্ম্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্রলোকের ঘরে এ কি অধর্ম্ম আচরণ? হিঁদুয়ানি আর বুঝি থাকে না।" শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাস্বাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "আর বুঝি ন্যাশনালিটী থাকে না?"—বিশ্বম্ভর বাবু, সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদি ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম্ম কর্ম্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাক্ শক্তি রহিত হইলেন, এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেজের ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার মিষ্টর কর্ম্মকার ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন, যে এরূপ বিধবা বিবাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আইসুক, জগৎ পরিদর্শণ করুক সুসভ্য সুরুচি সম্পন্ন যুবক দিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন,) তৎপর দীর্ঘ কোর্টসিপের পর একজনকে নির্ব্বাচন করুক,—এইরূপ কার্য্যই পাশ্চাত্য সুসভ্য প্রথা; পিঞ্জর বদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র!

এই সারগর্ভ হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোত্রীবর্গ বলিয়া উঠিলেন, তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরুচি সম্পন্ন যুবকদিগের সহিত ও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটী করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন,—তাঁহাদের একটী করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন? সুবুদ্ধি সুমতি বাবু একটু হাসিয়া এ প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রথাটা প্রকৃতই মন্দ প্রথা, ঐ প্রথা চলিলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট। রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ তর্ক বুঝিলেন। সভ্য ও সভ্যাদিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমারা সে সমস্ত কথা লিপি বদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিশ্ব জগতের পরামর্শ, মতামত, বিদ্রুপ ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কাণে উঠিল। সন্ধ্যার সময় হেমবাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন,—"সমাজ একমত হইয়া এই বিধবাবিবাহ, নিবারণ করিতেছে, এ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের বিদ্যা আছে, যাহাদের বিদ্যা নাই, যাঁহারা সৎলোক, যাঁহারা সৎলোক নহেন, যাহাদের শ্রদ্ধা করি এবং যাহাদের শ্রদ্ধা করি না সকলে একমত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।"

বিন্দু। "আর তা ছাড়া এ কাযে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত; এ কায করিলে সমাজে কি আমাদের অতিশয় নিন্দা হইবে।"

হেম। "না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিশ্বাস করিতেছেন ও রটাইতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা বিবাহতে প্রকৃত অধর্ম্ম নাই,—আমাদিগের হিতৈষীগণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র সম্বন্ধে যার পর নাই অধর্ম্ম সূচক প্রবাদ প্রকটিত করিতেছেন এক্ষণে সেই অধর্ম্মাচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়।"

কৃষ্ণচরিত্র।

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমি ও প্রত্যর্পন করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণকে * ধৃতরাষ্ট্রের বড়

* বিপক্ষেরা ও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাঁহার অনেক প্রমান এই উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, বৃষ্ণি সিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?' (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডব

ভয় ; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্য ও আমরা অধর্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমারা যুদ্ধ ও করিওনা, সে কাজটা ভাল নহে ;" এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডব সভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই যে যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যে টুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণের ও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকল ও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহু সংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং চেদি অন্ধক বৃষ্ণি ভোজ কুকুর ও সৃঞ্জয় বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধি প্রভাবেই শত্রু দমন পূর্ব্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ

দিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে ? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি ; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।" আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন, "জিষ্ণু কেশব ও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা। যিনি সর্ব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য কোন মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে ?" এইরূপ অনেক কথা আছে।

যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম নিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।"

বাসুদেব কহিলেন "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে ও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর. সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়া ও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্ম সাধনোদ্যত উৎসাহ সম্পন্ন স্বজন পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমারা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি; ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এখন এমন বিচার উঠিতে পারে, যে গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতাপর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশে ও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার

মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি, যে মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম; তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতার যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্ব পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এই রূপ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্ম বশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্ম বলে সতত সঞ্চারন করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্ম বলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্ম বলে প্রজাগণের নক্ষত্রগণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী

কর্ম্ম বলে নিতান্ত দুর্ব্বহ ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতী সকল কর্ম্ম বলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলীলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্ম বলে দশ দিক ও নভোমণ্ডল বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, ক্ষমতা সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র আদিত্য যম কুবের গন্ধর্ব যক্ষ অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রাহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি কর্ম্ম শব্দের পূর্ব প্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।* আর এই খানে হইতেছে। আর ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতে তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের (অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম পালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানে ও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,—

---

* আমি স্বীকার, করিতেছি "ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ" ইত্যাদি দুই একটা গোলযোগের কথা গীতাতেও আছে। তাহার মীমাংসা গ্রন্থান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে।

"হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথ চালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণ হিংসা না করিয়া ভীমসেনকে শান্তনা করত রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহা ও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয় দিগের যুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষা হয় কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহাতেই অনুষ্ঠান করিব।"

শূন্য।

কি আছে তোমাতে শূন্য হে! না জানি,
হেরিলে, নয়ন ফেরে না আর।
সাধের জীবন সুখের সংসার
মনে নাহি থাকে কিছুই তার॥
ভুলি আপনারে ভুলি প্রিয় জনে
ভুলি স্বদেশীরে, ভুলি প্রাণকূল।
ভুলি এ ভারত ভুলি, সিন্ধু, গিরি,
ভুলে যাই এই ধরা বিপুল॥
খুলে যেন যায় বুকের কপাট
ধূ ধূ করে যেন হৃদয় খান।
মনে হয় যেন কেহ নাই ব্যক্ত
পড়ে আছে একা উদাস প্রাণ॥
কে যেন আছিল বড়ই আপন
বহুদিন যেন ভুলে গেছি তায়।

প্র[illegible]র ।

কে সে মনে নাই কিন্তু আছে মনে

নিরুপম তার প্রেমের সুধায় ॥

কি জানি কি আছে তোমাতে তাহার

হেরিলে তোমারে সে যেন ডাকে ।

হেন ভোলা কথা কেন তোল মনে

শূন্য হে যদি না দেখাবে তাকে ॥

২

হেরি মনে হয় হৃদয়ে তোমার

আছে কোথা স্থান বড় মধুময় !

সেইখানে গেলে নিরাশার জ্বালা

যেন প্রাণে আর কিছু না রয় ! !

সেই যেন দেশ প্রাণের আমার

এ যেন প্রবাসে পড়িয়ে রই ।

যেন কি বন্ধনে রেখেছে বাঁধিয়া

আমি ইহাদের কেহই নই ॥

আমার যা কিছু ফেলিয়ে এসেছি

কিছু কিছু তার যেন মনে পড়ে ।

বুক ভরা প্রেম যেন শূন্য মনে

বসে আছে সেথা আমারি তরে ॥

হেথাকার এই মায়া দয়া প্রেম

এ যেন সাজান করিয়ে যাব ।

সাঙ্গ হ'লে খেলা সাধের এ বেশ

খুলে ল'য়ে যাবে যেটি যাহার ॥

ফিরে যাব ঘরে শূন্য একবার

খুলে দাও তব হৃদয়-দ্বার ।

এমন করিতে বালকের খেলা

করিতে পারি না নিয়ত আর ॥